আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি
ও বাংলা সাহিত্য

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি
ও
বাংলা সাহিত্য

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

॥ জিজ্ঞাসা ॥

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

১৯৬০

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র—১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

ADHUNIK BANGALI SANSKRITI
-O-BANGLA SAHITYA.

প্রকাশক :
শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

উৎসর্গ

আমার সাহিত্যচর্চার প্রথম প্রেরণাদাতা
পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দের সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি অত্যন্ত সজাগ হয়ে পড়েছি। যে সব ব্যক্তি ও কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ও দৃঢ় ছিল সে সম্বন্ধেও আমরা কথা বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি, যদিও বিন্দুমাত্র নতুন কথা বলবার নেই। আসলে, উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের জীবনের ও চারিত্র্যের মান থেকে আমরা যতই নামছি আমাদের কল্পিত-অকল্পিত বীরপূজা ততই যেন বাড়ছে। নতুন করে মূল্যনিরূপণ হচ্ছেনা, কেননা তার উপযুক্ত নতুন মালমশলা আবিষ্কৃত হয়নি এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিও আমাদের নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ তাঁর এই 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য' বইটিতে প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তিনি যথাসম্ভব মধ্যস্থতা অবলম্বন করেছেন বলেই মনে করি। যদিও কোন কোন বিষয়ে আমি স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করি তবুও বলব যে দ্বিজেন্দ্রলালবাবুর বক্তব্য অবধানের যোগ্য। বইটি সুখপাঠ্য, সুতরাং সাধারণ পাঠক পড়তে বাধা পাবেন না। বিষয় সুনির্বাচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সহায়ক হবে।

দ্বিজেন্দ্রলালবাবুকে গ্রন্থকারসভায় স্বাগত করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা ২. ৮. ৬০

শ্রীসুকুমার সেন

নিবেদন

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির পটভূমিকায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখ্য ধারাগুলির অনুসরণে একখানি আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা আমার বহুকালের। কিন্তু কর্মোপলক্ষে বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ইতিপূর্বে আমার অভিপ্রায়কে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর পূর্বে কলকাতা আসার পর থেকে এ বিষয়ে সচেষ্ট হই, এবং উক্ত বিষয়ে আমার চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করি। কিছুকাল পরে কর্মসূত্রে কবি-সমালোচক ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে। আমার আলোচ্য বিষয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনাই এই গ্রন্থের পূর্বভাগ-সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কালবৃত্তের মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ। সময় ও সুযোগমত বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি এবং সাহিত্যালোচনা করবার ইচ্ছা রইল এই গ্রন্থের উত্তরভাগে।

সংস্কৃতির পটভূমিকায় আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ বা বিকাশধারা লক্ষ্য করবার দুরূহ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে খুব বেশি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই অবস্থায় এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত চিন্তার কোন মূল্য আছে কিনা তার বিচার করবেন বিদগ্ধ পাঠক। এই পুস্তকে প্রকাশিত আমার সকল চিন্তা যে সংশয়াতীত এবং মত ভ্রান্তিহীন এমন কথা ঘোষণা করবার দুঃসাহস আমার নেই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা এই গ্রন্থের যে কোন প্রকার ত্রুটি আমার গোচরীভূত করলে পরবর্তী সংস্করণে সানন্দে আমি তা সংশোধন করে নেব।

ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন প্রথিতযশা অধ্যাপকের নিকট আমার অধ্যয়নের সৌভাগ্য হয়েছিল। কলেজ-জীবনে শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদারের নিকট সাহিত্য-সম্পর্কীয় যে পাঠ নিয়ে-

ছিলাম এই গ্রন্থ তার অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা গুরুঋণ শোধ করা যায় না। সে প্রয়াসে বিরত থেকে ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। এই গ্রন্থ প্রণয়ণের সময় শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডক্টর ভবতোষ দত্ত, ডক্টর নন্দলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী এবং অনুজ-প্রতিম অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

দীর্ঘকাল ছাপাখানার কবলিত থাকাকালীন এই গ্রন্থ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকর্মীবৃন্দ আমার উৎসাহকে জাগ্রত রেখেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক তাতে তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর প্রশ্ন ওঠেনা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থ প্রণয়ণের সময় আমাকে শুধুমাত্র উৎসাহিত করেন নি, সানন্দে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

যে সব পূর্বসূরী এই গ্রন্থ রচনায় আমার চিন্তাকে জাগ্রত করেছেন—তাঁদের সকলের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। গ্রন্থমধ্যে তাঁদের সকলের নাম এবং গ্রন্থের নাম উল্লেখ করায় গ্রন্থশেষে স্বতন্ত্র প্রমাণ-পঞ্জী সঙ্কলিত হল না।

এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করবার নীরস কাজ প্রসন্নচিত্তে সম্পাদন করেছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং ছাত্রী মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমান পবিত্র মোহন সরকার প্রত্যক্ষভাবে আমার ছাত্র না হয়েও সহযোগিতা করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এঁদের সকলের সারস্বত-সাধনা জয়যুক্ত হোক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছি প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বই এবং পুরনো পত্র-পত্রিকা সরবরাহ

করেছেন বলে আমার ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীফণিভূষণ পালকে যিনি কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত চারু হোম কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনাগুলি ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'জিজ্ঞাসা'র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র কুণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ না করলে এই গ্রন্থ এত শীঘ্র পাঠক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেত কিনা সন্দেহের বিষয়। প্রুফ্ দেখতে গিয়ে অনেক সময় কোন কোন অংশ বর্জন বা পরিবর্ধন করে শ্রীগোপাল প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার মশাইকে আমি উত্ত্যক্ত করেছি। তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ তিনি আমার সকল অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও গ্রন্থ মধ্যে কতগুলি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়ায় লজ্জা অনুভব করছি। ভ্রম সংশোধনের দ্বারা যদিও এই ত্রুটির গুরুত্ব কমেনা তথাপি গ্রন্থশেষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভুলের একটি শুদ্ধিপত্র সংকলন করে দিলাম।

এই গ্রন্থ বিদগ্ধ পাঠকের মনে আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে যদি কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
বাংলা সাহিত্য বিভাগ,
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

বিষয়-সূচী

কথারম্ভ

আধুনিকতার সংজ্ঞাবিচার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনায় আধুনিক সংজ্ঞাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, বিশেষ করে সাহিত্য আলোচনায়। দশ বছর আগে যে সাহিত্যকে খুব আধুনিক বলে মনে করা হত, আজ তা একেবারে অনাধুনিক বিবেচিত হতে পারে। আবার যে সাহিত্য সাম্প্রতিক কালে আধুনিক মেজাজের জন্যে জনপ্রিয় হচ্ছে, দশ বৎসর পরে ভবিষ্যৎবংশীয়েরা সে সাহিত্যকে সেকেলে বলে নাক সিঁটকাতে পারে। এমনও দেখা যায়, প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন সব প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশ রয়েছে যা আধুনিক বলে দাবী করতে পারে; আবার বর্তমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যেও এমন সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা প্রাচীনতার লক্ষণাক্রান্ত। বৌদ্ধ যুগের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যে জীবনবোধের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, তা বর্তমান যুগের পক্ষেও আধুনিক; আবার সমকালীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন কতগুলি প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছে, যা আমাদের মধ্যযুগীয় অসংস্কৃত মনোভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায় নেহাৎ কালের বিচারে 'আধুনিক' সংজ্ঞাটি দেওয়া বোধ হয় সমীচীন নয়।

তা হলে এ প্রশ্নটি স্বভাবতঃই মনে জাগে, জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে কোন্ সময়ে; এবং সে অধুনিকতা বিচারের মাপকাঠি কি?

প্রথমে সাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। শুধুমাত্র আজ-কাল বা কিছুকাল আগে প্রকাশিত হলেই সে সাহিত্যকে আধুনিক বলা চলে না।

সাহিত্যকে 'আধুনিক' অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তখন, যখন কোন অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের (Values) প্রকাশে সে সাহিত্য পূর্বযুগের সাহিত্য হতে পৃথক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সাহিত্যের মেজাজ ও স্বাদ যেমন নতুন, তেম্নি সমসাময়িক যুগপ্রবৃত্তির পরিচয় ওঠে সেখানে প্রকট হয়ে। সাহিত্যে আধুনিকতা বিচারে চিন্তাশীল লেখক G. S. Fraser-এর মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন:

"......When we describe a work as 'modern' we are ascribing certain intrinsic qualities to it, though we may be vague in our minds what these qualities are. Thus the question of date need not arise at all......all through the literature of the past, there are certain works, which, in the attitudes they express and the problems they deal with, have a peculiar affinity with the spirit of our own time".[১]

এরূপ ব্যাপক মূল্যমান বিচারে আমাদের সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় কোন কোন কবিওয়ালার গানে, ময়মনসিংহ গীতিকায়, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের কাব্যে, এমনকি প্রাচীন যুগে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু আধুনিকতা বিচারে শুধুমাত্র কালনিরপেক্ষ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর নির্ভর করা সব সময়ে নিরাপদ নয়। কারণ, এ ধরণের মাপকাঠি নিয়ে বস্‌লে সাহিত্যে আধুনিকতার সীমাকে আরো প্রাচীন কাল পর্যন্ত টেনে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সেজন্যে ফ্রেজার নিজেও সাহিত্যে আধুনিক মেজাজ নির্ণয়ে একটা নির্দিষ্ট কাল ও একটা বিশিষ্ট যুগপ্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে ব্যাপক অর্থে ইংরাজী সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, তবে আলোচনার সুবিধার জন্যে তিনি সৃষ্টিধর্মী ইংরাজী সাহিত্যে আধুনিকতার প্রারম্ভসীমা ধরেছেন ১৮৯০

---

১ Fraser, G. S. **The Modern Writer and his world—Modernity in Literature,** p. 11.

খৃষ্টাব্দকে। বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপভাবে কোন একটা সময়কে আধুনিকতার সৃষ্টিকাল বলে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

আধুনিকতার লক্ষণ নির্ণয়

কোন খেয়ালের বশে ফ্রেজার একটা বিশেষ সময়কে আধুনিকতার প্রারম্ভসীমা বলে চিহ্নিত করেননি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ-কেন্দ্রিক ইংরাজী সাহিত্যে কতগুলি বিশেষ প্রবণতা দেখে তিনি সে সাহিত্যকে আধুনিক বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ নির্ণয়ে ফ্রেজার একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন ;—

"Paradoxically enough, one of the main marks of 'modernism' in literature is often a lively interest in the past for its own sake".[১]

যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও বিচারের সাহায্যে বর্তমানকে গড়ে তোলবার জন্যে অতীত কৌতূহলের ফলেই বাংলা সাহিত্যেও সুরু হল 'আধুনিকতা'র। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রচিত 'বেদান্ত-গ্রন্থ' সে হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যকীর্তি। সমকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয় মনকে ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে শুধু এ গ্রন্থে নয়, রামমোহনের সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সে যুগের মনীষীরাও মোহাচ্ছন্ন জাতীয় চিত্তের ভ্রান্তি নিরসনের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনা-গবেষণায়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের পরিণত মনীষা নিয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সত্য সংকলন করবার দুরূহ কাজে। উক্ত সকল মনীষীরই লক্ষ্য সমকালীন সমাজের পুনর্গঠন, কিন্তু উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দান করবার জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা অতীতে।

---

১ Fraser, G. S. **The Modern Writer and his world**—The Historical Sense in Modern Literature, p. 11.

পুরাণ ও ইতিহাসাশ্রয়ী অতীত কৌতূহলের ফলেই গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি প্রাণবন্ত নবীন সাহিত্য, যার সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যের ব্যবধান সুস্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্তের অতীত কৌতূহল-প্রবণতা একটা সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলেও, প্রাচীন কাব্য ও কবিজীবনী সংগ্রহ-ব্যাপারে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ আধুনিক। রঙ্গলালের আবেগমুখর স্বদেশপ্রেম অতীত রাজপুত ইতিহাস হতে প্রেরণা সঞ্চয় করে কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার আবাহন করেছে। নাটকে ও কাব্যে মাইকেলের মানসমুক্তির মূলে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণ। মধ্যযুগের বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মুসলমান ইতিহাসের প্রতি প্রবল মানস-কৌতূহলের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্কিমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রোমান্স, আর রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাসনিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। হেমচন্দ্র ও নবীচন্দ্রের মহাকাব্য রচনার লক্ষ্যও হল প্রাচীন হিন্দুপুরাণকে নতুন যুগের নব-ভাবধারায় অভিষিক্ত করে আধুনিক জাতিগঠন-কামনা। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের মন অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য-প্রভাবান্বিত হলেও সমকালীন জীবন গঠনের স্বপ্ন যে তাঁর ছিল না তা জোর করে বলা চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিষ্টিক কবি বিহারীলাল তাঁর আত্মমুখী ভাবকল্পনার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন সুপ্রাচীন বাল্মীকি-কাহিনীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রধর্মী অনেক কাব্যেরও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে প্রাচীন ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শ।

বর্তমানকে পুনর্গঠনের জন্যে অতীতের আদর্শ গ্রহণ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হলেও একমাত্র লক্ষণ নয়। অতীতপ্রীতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হয়ে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর সাহিত্যকে পূর্বযুগের সাহিত্য হতে পৃথক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গত শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল শাস্ত্রবিচারে ও সমাজসংস্কারে। যে তীক্ষ্ণ মানবতাবোধের প্রেরণায় গত শতাব্দীর সাহিত্য একটা নবশক্তি লাভ করল, তার মূলেও আছে একটা যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এরূপ আধুনিক দৃষ্টিস্নানে গত শতাব্দীতে প্রথম স্নাত হয়েছিলেন প্রতিভার বরপুত্র রামমোহন। শাস্ত্রবিচারে তাঁর

ক্ষুরধার নৈয়ায়িক বুদ্ধি জীবনের প্রতি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই ফল। এ দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকট প্রকাশ ডিরোজিয়ানদের মধ্যে; অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি মনীষীদের জীবনচর্চা ও সাহিত্য রচনার মূলেও এ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

জীবনের প্রতি রসদৃষ্টিও সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টির একটা প্রধান লক্ষণ। এ দৃষ্টিস্পর্শেই গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের নীতি ও সংস্কারধর্মী সাহিত্য বাস্তবিকপক্ষে জীবনধর্মী আধুনিক সাহিত্যে বিবর্তিত হল। মানুষের জীবন শুধু সংস্কার ও নীতি-দুর্নীতির আধার নয়;—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-প্রীতি ও প্রীতিহীনতা, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, প্রেয়লাভের মোহ ও শ্রেয়লাভের এষণা নিয়ে মানুষের জীবন পরম রহস্যময়। রসিকের দৃষ্টি দিয়ে সে রহস্যময় জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রয়াসেই সৃষ্টি হল আধুনিক সাহিত্য। জীবনের প্রতি রসদৃষ্টির আংশিক প্রকাশ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়নি একথা বলা চলে না; কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গীর চিত্তাকর্ষক সাহিত্যরূপ দেখা গেল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্যের অভিনব টেকনিকে রচিত উপন্যাসে। সে উপন্যাস গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের রসসংস্পর্শহীন সাহিত্যে যে শুধু আধুনিকতার রঙ্‌ মাখিয়েছে তা নয়, এতদিনকার অনাদৃত বাংলা সাহিত্যকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষকও করেছে। শুধু উপন্যাস রচনায় নয়, কাব্য-নাটক রচনায়ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের টেকনিক গত শতাব্দীর সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্বযুগের সাহিত্য হতে। সাহিত্য রচনার এ অভিনব কৌশল (form) আবিষ্কারই সৃষ্টি করেছে গত শতাব্দীতে একটি সজীব-সাহিত্য—যাকে আধুনিক আখ্যায় অভিহিত করতে কোন বাধা নেই।

মধ্যযুগীয় ধর্মশাসিত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহাহীন জীবনের ধ্যান-ধারণার প্রতি শুধুমাত্র একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টি নয়, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গত শতাব্দীর বহু মনীষীর গভীর জীবনদৃষ্টি সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টির ভিত্তিমূলে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণযোগ্য। মধ্যযুগের জীবন ও সাহিত্য হতে আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে একদিনেই সংঘটিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাপ্রবাহ এ বিচ্ছেদকে ক্রমশঃ

স্পষ্টতর করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংরাজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নব পরিচয় সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করেছে একটা নবতর সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনায়। এ সজীব প্রাণস্পন্দন সে যুগের বিভিন্ন বাঙালী চিত্তে অনুভূত হয়েছে বিচিত্ররূপে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির খর বিদ্যুতালোকে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী হয়ে উঠলেন দেশের সনাতন জীবনদৃষ্টির প্রতি সংশয়ী, আর-এক শ্রেণীর চিন্তাশীল বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেও দেশীয় সনাতন সংস্কৃতির স্থির মূল্যবোধ সম্পর্কে অনুসন্ধানতৎপর।

কিন্তু জীবনদৃষ্টি প্রাচ্যই হোক, পাশ্চাত্ত্যই হোক, কিম্বা সমন্বিতই হোক, জীবনের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগই সৃজ্যমান বাঙালী-সংস্কৃতি যুগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সানুরাগ জীবনপ্রীতি সে যুগের বাঙালীর চরিত্রে এনে দিয়েছিল ঋজুতা এবং দৃষ্টিতে এনে দিয়েছিল গভীরতা। এ গভীরতার সাধনাই গত শতাব্দীর সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ব যুগের সাহিত্য হতে এবং উত্তীর্ণ করেছে আধুনিকতার স্তরে। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বেদান্তের মত জটিল শাস্ত্রেরও আলোচনা-গবেষণা যে নবসৃষ্ট বাংলা গদ্যের মাধ্যমে করা যায় রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের পূর্বে তা কেউ ভাবতেও পারত না। সাহিত্যরচনায় একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল রামমোহনের এ সুচিন্তিত গ্রন্থখানি। স্বদেশের সনাতন ভাবধারার শাশ্বত মূল্যবোধকে দেশের দিগ্‌ভ্রান্ত শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে রামমোহনের সুযোগ্য শিষ্য দেবেন্দ্রনাথও অগ্রসর হলেন 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় উপনিষদ্ প্রচারে। সে সমস্ত রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক, বাংলা ভাষা যে সুপ্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে, এ সত্য উপলব্ধি করতে সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর দেরী হয়নি। ওদিকে বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করবার গভীর আগ্রহে প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাসাগর সুরু করলেন বাংলা ভাষায় প্রাচীন শাস্ত্রবিচার। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানালোচনা ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় খুলে দিল বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে নতুন জগতের প্রবেশদ্বার। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাবৃত্ত আলোচনা ও বঙ্কিম-বিবেকানন্দের হিন্দুশাস্ত্র, বিজ্ঞান-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব এবং

ধর্মতত্ত্বের আলোচনাও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘোষণা করে সে যুগের সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিল মধ্যযুগের ধর্মচেতনানির্ভর সাহিত্য হতে।

কাব্য সাহিত্যেও আধুনিকতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল ইউরোপীয় কাব্যাদর্শের সচেতন অনুসৃতির ফলে। দেশ বিদেশের কাব্যসাহিত্য হতে মধু আহরণ করে মধুসূদন যে মধুচক্র নির্মাণ করলেন, সে যুগের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বহু বাঙালী তার স্বাদ গ্রহণ করতে না পারলেও প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে কাব্যপ্রিয় বাঙালী আজ বুঝ্‌তে পেরেছে, কাব্যরচনা এ ভাবোন্মাদ কবির বিলাসচর্চা মাত্র ছিল না। Form এবং Content এর দিক দিয়ে বাংলা কাব্যে এত বড় পরিবর্তন সে যুগের পক্ষে ছিল কল্পনাতীত। পূর্বযুগের তরলধর্মী বাংলা কাব্যকে গভীর রসাশ্রয়ী কাব্যসীমায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হল বাংলা কাব্যে আধুনিকতার। সে আধুনিকতার সীমা আরো প্রসারিত হল হেম-নবীনের কাব্যে সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের স্পর্শে। গভীর জাতীয়তাবোধ ও মানবতাবোধের প্রকাশে মূল্যসমৃদ্ধ হল আধুনিক বাংলা কাব্য। মধ্যযুগের কাব্য হতে গত শতাব্দীর কাব্যসাহিত্যের ব্যবধান উঠল সুস্পষ্ট হয়ে। সে ব্যবধান আরো সুচিহ্নিত হল বিহারীলালের হৃদয়রহস্যকেন্দ্রিক সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসময় গীতিকবিতার নবতর রূপপ্রকাশে। কবি-অন্তরের আনন্দ-বেদনা মথিত অনুভূতির এমন অবিমিশ্র অথচ গভীর প্রকাশ মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য।

নাটক রচনায়ও গভীর জীবনাসক্তি গত শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে বহন করে আনল আধুনিকতার সজীব বাণী। প্রথম সমাজসচেতন নাট্যকার রামনারায়ণের নাটকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় নেই, একথা সত্য; কিন্তু সমকালীন নিপীড়িত জীবনের প্রতি তাঁর সহৃদয় অন্তরে যে বেদনার রং লেগেছিল তা অকৃত্রিম। মধুসূদনের দূরযানী কল্পনা নাটক সৃষ্টিতে মুখ্যতঃ রোমান্সের সরণি বেয়ে অগ্রসর হলেও জীবনের রহস্যময় রূপও তাঁর শিল্পী-মনকে আলোড়িত করেনি একথা জোর করে বলা যায় না। নাট্যজীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তির ফলে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেক্‌সপীয়রের দৃষ্টিলাভ অবশ্য তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; কিন্তু তাঁর কোন কোন নাটকে গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দীনবন্ধুর নাটকে কল্পনাবিস্তার না থাকলেও

যে বেদনালাঞ্ছিত জীবনকে তিনি দেখেছিলেন, সে জীবনের বাস্তব রূপ দানে তাঁর লেখনী ছিল অকম্পিত। তাঁর গভীর জীবনবেদনা কখনও রূপ পেয়েছে হাল্কা হাসির বুদ্বুদের মধ্য দিয়ে, কখনও বা বন্ধন-অসহিষ্ণু বিদ্রোহচেতনার ভিতর। সমকালীন জীবনসমস্যার গভীরে প্রবেশ করবার এমন অকৃত্রিম প্রয়াস সে যুগের খুব কম নাট্যকারের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াসেও এ গভীরতারই সাধনা। স্ব-ধর্মচ্যুত জাতিকে স্বদেশের সনাতন মহৎ জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর নাট্যপ্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য। পূর্বসূরী মনোমোহন বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রও যে তাঁর অন্তরে উত্তাপ সঞ্চার না করেছিল তা নয়, সমকালীন সামাজিক সমস্যার বাস্তব রূপ সম্পর্কেও তিনি যে অনবহিত ছিলেন তাও নয়; কিন্তু যে সামগ্রিক জীবনবোধের সুমহান আদর্শ যুগ যুগ ধরে জাতিকে শ্রেয় লাভের চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছে, সে ধর্মাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর পৌরাণিক ও অবতার নাটকে। আর্টের সূক্ষ্ম সীমা তিনি লঙ্ঘন করেছেন এ ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকগুলির বহু স্থানে সন্দেহ নেই; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নিকট আর্টের চাইতেও জীবন ছিল বড়। চারদিকের কেন্দ্রচ্যুত জীবন পরিবেশে সে আদর্শ জীবনের পূজা করেছিলেন ভাবধর্মী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, আর শাশ্বত ভারতীয় জীবনের মহিমা স্পর্শে জাগাতে চেয়েছিলেন তিনি সে যুগের বিভ্রান্ত বাঙালীকে।

শুধু আলোচনা-গবেষণা বা কাব্য-নাটকে নয়, উপন্যাসেও দেখি মানবজীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াস আধুনিক যুগ সম্ভাবনাকে আসন্ন করে তুলল। শিল্পী বঙ্কিমই মানবমনের সে রহস্যময় রূপকে সর্বপ্রথমে তুলে ধরলেন বাংলা উপন্যাসে কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টি-প্রেরণাই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে রইলনা। শিল্পসৃষ্টির পরিণামে তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। তীক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে নীতিধর্মের প্রেরণা প্রথম পর্যায়ের কোন কোন উপন্যাসে সক্রিয় হলেও, বঙ্কিমের শেষ স্তরের উপন্যাসগুলিতে সে প্রেরণা প্রবল প্রত্যয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। উপন্যাসে বঙ্কিমের এ গভীরতার সাধনা তাঁর শিল্পকৃতিকে উন্নীত করেছে মহৎ জীবনজিজ্ঞাসায়। শতাব্দীর শেষ কোটিতে রবীন্দ্রনাথও

জীবনের শাশ্বত আদর্শকে উপন্যাসে শিল্পরূপ দিতে সচেষ্ট। শিল্প রচনায় এ গভীরতর দৃষ্টিও আধুনিকতার চিহ্নাঙ্কিত।

এ গভীরতার সাধনাতেই গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে একটি সমৃদ্ধ মনন-সাহিত্য। গত শতাব্দীর যে রেনেসাঁস আন্দোলন আধুনিক জীবনবিকাশের মূলে, তার প্রেক্ষাপটেও রয়েছে একটা ভাবগম্ভীর মনন-সাহিত্য। শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের মুক্ত মনন নিয়োজিত হয়েছিল প্রধানতঃ ধর্মালোচনায়। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কেও তাঁর যে কৌতূহল ছিল না তা নয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা জাতির বুদ্ধিমুক্তির সাধনার উপর জোর দিতে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রালোচনায় তাঁর অমিত শক্তি তেমন নিযুক্ত হতে পারেনি।

বিদ্যাসাগরের মুক্তিস্বপ্ন প্রধানতঃ রূপ পেয়েছিল সমাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত মননশীল আলোচনায়। ভূদেবের যুক্তিনির্ভর স্থমিত আলোচনাও ছিল বিদ্যাসাগরের মত প্রধানতঃ সমাজ ও শিক্ষাকেন্দ্রিক। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল জাতির আত্মিক জাগরণ। এ ধরণের আলোচনায় মনীষী রাজনারায়ণ তাঁর ভাবশিষ্য হলেও ক্রান্তিকালের সমাজ-জীবনের রূপ অঙ্কনে তিনি যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত 'ঋষি' আখ্যা সার্থক হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী হয়েও ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষয়ক মননশীল আলোচনায় অক্ষয়কুমার যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিল সে যুগে একান্ত দুর্লভ। তাঁর মননধর্মী রচনার লক্ষ্য ছিল বাঙালীর মানসমুক্তি। গত শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর নাম রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ এবং সে ধর্ম প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেও রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত ইতিহাস ও ভূগোল আলোচনা বাঙালী মানসের দিগন্ত-সীমাকে বিস্তৃত করেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাবৃত্ত, ইতিহাস ও ভূগোল আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্যচিন্তা। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর বিভিন্নধর্মী আলোচনায় জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন জাগরণোন্মুখ জাতির সামনে।

ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু আলেচনা-গবেষণায়

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম বাঙালী মানসকে সবলে আকর্ষণ করলেন আধুনিক চিন্তাজগতে। বঙ্কিমের ভাবশিষ্য মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা ও অর্থনৈতিক চিন্তায় আছে মননশীল সাহিত্যের পরিচয়। কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মননশীল রচনার সুগভীর আবেদন সে যুগের বাঙালীর দোলাচল চিত্তে জাগ্রত করেছিল স্থির ও শুভবুদ্ধি। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। এক কথায়, গত শতাব্দীর মননশীল রচনাই সে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ব যুগের সাহিত্য হতে; এবং এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মুক্ত মননের বিচিত্র প্রকাশই এ যুগের সর্বপ্রকার সাহিত্য প্রয়াসের ভিত্তিমূলে।

সংস্কৃতি ও সাহিত্য : পারস্পরিক সম্পর্ক

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ কি, এবং এ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গত শতাব্দীতে যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল, তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে পূর্ব অধ্যায়ে। বিস্তৃত জগৎ, যৌথ ও ব্যক্তি জীবনের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হয়ে গত শতাব্দীর বিকাশোন্মুখ আধুনিক বাংলা সাহিত্য এ শতাব্দীতে কিরূপে একটা বিশেষ মূল্যে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করব আমরা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য, গত শতাব্দীর সাহিত্যে এই যে আধুনিক মনের বিচিত্র প্রকাশ, সে কি সমাজ ও সংস্কৃতি নিরপেক্ষ? না, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে মন ও প্রাণধর্মী এ নতুন সাহিত্য?

আধুনিক সমৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে জীবন সম্পর্কে জেগে উঠেছিল নতুন মূল্যবোধ, আর এ ক্রমবর্ধমান মানবমূল্যবোধের চেতনা সে দেশে সৃষ্টি করেছে মনুষ্যরসাশ্রয়ী বিচিত্র সাহিত্য। ভাব ও বস্তুজগতের বিবর্তনের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ নতুন রূপ নিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও জেগে উঠেছে নবতর প্রাণধর্ম নিয়ে। সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে ভাব ও বস্তুধর্মী সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বিভিন্ন সময়ে পৃথক রূপে দেখা দিয়েছে; ফলে সাহিত্যেও নবযুগ সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে রেনেসাঁস আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ ভাবাত্মক আন্দোলন; এ আন্দোলনের

অন্যতম ফলশ্রুতি ইংরাজী সাহিত্যে নবসৃষ্ট প্রাণৈশ্বর্যময় সৌন্দর্যসচেতন একটা বিচিত্র সাহিত্য। আবার Industrial Revolution ছিল একটা বস্তুধর্মী আন্দোলন, যে আন্দোলনের প্রভাবে পূর্বযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো গেল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে, আর বাস্তবধর্মী জীবনজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সচেতন একটা জাগ্রত সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করল ইংলণ্ডের মাটিতে।

আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আলোচনায়ও দেখা যাবে, সে সংস্কৃতির রূপ মিশ্র: ভাব ও বস্তুধর্মের সমন্বয়েই সে সংস্কৃতির সৃষ্টি। এ মিশ্র সংস্কৃতি সমাজ-মানসের জাগরণে অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে গত শতাব্দীতে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও পরিগ্রহ করেছে নিত্য নতুন রূপ।

আধুনিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিকাশের ক্রম

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি সমাজবিবর্তন-নির্ভর; এ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব, কতগুলি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা সে সমাজবিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে ইংরাজের অগ্নিবর্ষী কামান বজ্রধ্বনিতে শুধু যে একটা যুগসমাপ্তি ঘোষণা করল তা নয়, বাঙালীর সমাজজীবনে একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও বহন ক'রে আনল। এ ইঙ্গিতের গূঢ় অর্থ বহুকালের তমসাচ্ছন্ন বাঙালী অবশ্য সেদিন ভাল করে বুঝতে পারেনি। তারা শুধু সসম্ভ্রমে মুগ্ধ হল বিজয়ী ইংরেজের অমেয় পৌরুষবীর্যের সঙ্গে বিজ্ঞানশক্তি ব্যবহারের অদ্ভুত নিপুণতা দেখে। সে যুগের বিত্তশালী ভূস্বামী সম্প্রদায় নবাগত ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করল সমকালীন ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে। বণিক ইংরাজ কিন্তু দেশশাসনের ভার মুখ্যতঃ দেশীয় মুসলমান ও হিন্দু প্রধানদের উপর অর্পণ করে নিজেরা মনোনিবেশ করল দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তারে। এ সুযোগে দেশীয় ভূস্বামীর দল দেশের দরিদ্র প্রজাকে নিপীড়ন করে দুহাতে অর্থ লুঠ করতে লাগল (রেজাখাঁ, দেবী সিং প্রভৃতির প্রজাশোষণ দ্রষ্টব্য)। এই বিবেকহীন দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে যোগ দিল অর্থলোলুপ বিদেশী বণিক। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে কিরূপ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল তার প্রমাণ আছে

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। দেশীয় ভূস্বামীদের সহায়তায় বিদেশী বণিকের নীতিহীন শোষণের বিরুদ্ধে একটা আঞ্চলিক খণ্ড বিদ্রোহ (সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) উপস্থিত হলেও দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বিরত হল না। বিদ্রোহ দমনের পর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এবার বণিক-রাজ সচেষ্ট হল। ব্যাপক বিদ্রোহ প্রচেষ্টাও আর দেখা গেল না। এ শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে বিদেশী ইংরাজ এবার অগ্রসর হল দেশের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। গ্রামের সন্ত্রস্ত বাঙালী সসম্ভ্রমে তাদের বিজয়যাত্রার পথ দিল ছেড়ে। স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল বণিকের বাণিজ্যকুঠি, প্রজাশাসনের উদ্দেশ্যে আপিস-আদালত ; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল খৃষ্ট ধর্মোপাসনা ও ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে ভজনালয় (গির্জা)। বিদেশাগত বহু খৃষ্টান মিশনারী অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল খৃষ্টধর্মের মহিমা, দেশীয় পৌত্তলিক ধর্মের গ্লানি, আর প্রলুব্ধ করল তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে। ফলে কিছুসংখ্যক লোক খৃষ্টানও হল। সমাজের অধিকাংশ লোক যারা খৃষ্টান হল না, তারা মেতে রইল তাদের মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা, এবং খেউড়, তর্জা, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি স্থূলরুচির আমোদপ্রমোদ নিয়ে। সনাতন হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা তখন দেশ হতে বিলুপ্ত, বিচারহীন আচারের রাজত্ব সমস্ত সমাজজীবনে। গড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান সে যুগের বাঙালীর অপরিচ্ছন্ন জীবনপরিবেশে সংস্কৃতির রূপ কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

সমাজের উচ্চমঞ্চের অধিবাসীদের মধ্যে সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থ ও ভোগ-লোলুপতা, প্রজাপীড়ন ; আর সাধারণ স্তরের মানুষ নানা কুসংস্কারে মোহগ্রস্ত ও নীচ আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত—সমাজের এই বিকৃতির মধ্যে সুস্থ সবল সাহিত্য সৃষ্টির কথাই ওঠে না। জাতীয় জীবনের এ তমসাচ্ছন্ন যুগে ক্ষণিকতা-ধর্মী চটুল সঙ্গীত রচনাই ছিল জাতির সাহিত্য প্রয়াসের একমাত্র নিদর্শন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হল জব চার্ণক -প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ক্রমোন্নতির ফলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হতে বাষ্পচালিত জলযানে করে ভোগের নানা উপকরণ আসতে লাগল সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে, আর বিদেশী বণিক সে পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসল এ হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা

শহরে। সুখসম্ভোগ ও বিলাসময় জীবনের দুর্নিবার আকর্ষণে দেশের জমিদার শ্রেণী ক্রমশঃ পল্লীর মায়া ত্যাগ করে ছুটল কলকাতা শহরে; সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এবং জমিদারের আনুকূল্যপুষ্ট শিল্পী ও কবিরাও এল নতুন বণিকরাজের বাণিজ্যকেন্দ্রে অর্থ উপার্জনের আশায়। বিস্তৃত ভূমির পত্তনি পেয়ে জমিদারদের কেউ হলেন রাজা, আর বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজ বণিকের ব্যবসায়ে লেনদেনের সাহায্য করে, কেউ বা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে অর্জন করলেন বিপুল বিত্তসম্পদ। ভূস্বামী-দের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পূজা-আর্চা ও সামাজিক-অনুষ্ঠানে দেশী ও বিলাতি প্রথায় বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে অবিশ্বাস্য রকমের অনাবশ্যক অর্থব্যয় ও নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাই ছিল এ শ্রেণীর হঠাৎ-বড়লোকদের সংস্কৃতির প্রধান পরিচয়। তাদের সামাজিক উৎসবগুলি এতটা জৌলুষপূর্ণ ছিল যে বিদেশী ভিন্নধর্মী ইংরাজ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা পর্যন্ত এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। এ হঠাৎ-রাজা ও বেনিয়ান মুৎসুদ্দিরা তাদের কাজকর্মের সুবিধার জন্যে বিদেশী বণিকের সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু ইংরাজী শিখল, যদিও সে ইংরাজী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। পাশ্চাত্যের সঙ্গে নব পরিচয়ের ফলে পল্লীপ্রবাহিনী বাঙালী-সংস্কৃতি ক্রমশঃ নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করল। এ নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হল ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহর।

শোভাবাজারের রাজবাড়ী ছিল সে যুগে কবিসম্প্রদায় ও যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গীত ও অভিনয়চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। আর লোকশিল্পীদের শিল্পচর্চা চলতে লাগল কালীঘাটের কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে। বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত হল কলকাতা শহরে। কবিগণের আসরগুলি শুধু যে গ্রাম থেকে আগত নিম্নশ্রেণীর বাঙালীরা জমিয়ে রাখল তা নয়; কোন কোন ইংরাজ পর্যন্ত এ কৌতুকাবহ কবির লড়াইয়ে যোগ দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি-চর্চায় অত্মনিয়োগ করল। কালীঘাটের পটুয়ারা গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বহুকাল। কলকাতার হঠাৎ-বড়লোকেরা যখন থেকে দেশীয় শিল্পকে

উপেক্ষা করে মোগল ও বিলাতি শিল্পের আনুকূল্য করতে শুরু করলেন তখন থেকে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পীরও দুর্দিন এল ঘনিয়ে।[১]

কলকাতার নতুন মেজাজের অর্থশালী অভিজাত বাঙালী যখন উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-ব্যসন ও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত (যেমন, বাইনাচ, বারাঙ্গনা-পোষণ, বহুবিবাহ, পায়রার লড়াই দেখা, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অপরিমিত ব্যয়, ইংরাজের অনুকরণে মদ্যপান, পক্ষীর দলের রঙ্গ ব্যঙ্গ ইত্যাদি), বিদেশী ইংরাজেরা তখন বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্য সংগঠন, এবং খৃষ্ট-ধর্ম প্রসারের স্বপ্নে মশগুল। বাষ্পচালিত জলযানের সাহায্যে তারা নিজ দেশের শিল্পসম্ভার দিয়ে শুধু কলকাতার বাজারকে ভারাক্রান্ত করল না; বাষ্পচালিত যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা করল তারা গঙ্গার ধারে ধারে পাটকল, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যার প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। এ বাষ্পচালিত যন্ত্রের সহায়তায় তারা পরবর্তীকালে কলকাতায় স্থাপন করল বহু কলকারখানা, যার ফলে বাংলা তথা ভারতের কুটিরশিল্পের অবনতি হল ত্বরান্বিত, এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনে একটা বিরাট বিপর্যয় হয়ে উঠল আসন্ন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাষ্পশক্তির ব্যবহার আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকরণসম্ভার বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ যন্ত্রোৎপাদনবাহুল্য আমাদের স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে করে তুলেছে জাতিকে পরনির্ভরশীল, আমাদের অন্তর্মুখী মনকে করেছে বহির্মুখী—বাঙালী-সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার আমাদের এ সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। এ গ্রন্থের বিভিন্ন মনীষীর জীবনচর্চা ও কর্মসাধনায় দেখা যাবে, এ উপকরণসম্ভারমুগ্ধ, আত্মপ্রত্যয়হীন, উৎকেন্দ্রিক ও বহির্মুখ জাতীয় মনকে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিযুক্ত করেছেন জীবনের সমস্ত উদ্যম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একজন বিদেশী ইংরাজের একটি আবিষ্কার বহুযুগের জীর্ণ বাঙালী সংস্কৃতিকে পৌঁছিয়ে দিল আধুনিকতার তোরণ-প্রান্তে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী স্যর চার্লস উইলকিন্স্ শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকারকে শিখিয়ে দিলেন বাংলা হরফ

১ শ্রীবিনয় ঘোষ॥ কলিকাতা কালচার

তৈরীর কৌশল। এ অখ্যাত শ্রমজীবী মানুষটি ছেনির ঘায়ে বাংলা হরফ তৈরী করে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি যুগসমাপ্তি ঘোষণা করল। শুধু মানুষের আবেগময় অনুভূতি নয়, মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত কথাকে ছাপার অক্ষরে বহুজনের সামনে পৌঁছিয়ে দেবার সুযোগ দিয়ে বিদেশী উইলকিন্স্ সাহেব ও দেশী শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার সেদিন আধুনিক সংস্কৃতি বিকাশের কঙ্করময় পথকে দিয়েছিলেন মসৃণ ও সুগম করে। এ নতুন যন্ত্রশিল্প আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টি হল আধুনিক ভাব-প্রকাশের বাহন গদ্যসাহিত্য ও সংবাদপত্র, এবং এ যুগল শক্তিকে অবলম্বন করে কোন কোন বিদেশী ইংরাজ ও বহু দেশীয় মনীষী বাঙালী-সংস্কৃতিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চললেন একটা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

উনবিংশ শতাব্দীর জন্মলগ্নে ফোর্ট উইলিঅম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্তে দেখা গেল অস্পষ্ট উষালোকের প্রচ্ছন্ন মহিমা।

আধুনিক সংস্কৃতির বস্তুগত ও ভাবগত ভিত্তি

উক্ত আলোচনায় 'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। বস্তুসম্পদ জাতির সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম প্রধান উপকরণ, আর মানস-সম্পদ সংস্কৃতির রুদ্ধদ্বার খুলবার চাবিকাঠি। সংস্কৃতি বস্তুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি গতির প্রশ্ন। সেজন্যে সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ। সংস্কার (কুসংস্কার হলে ত কথাই নেই) মানুষের জীবনকে করে গতিহীন, আর সংস্কৃতি মানুষের জীবনে আনে গতিবেগ, সজীবতা। মনের পরিশীলন বা পরিমার্জন হল সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। মনের পরিমার্জনের পথে আসে বুদ্ধির মুক্তি, এবং এ মুক্তিপথেই সংস্কৃতি একটা সুস্পষ্ট অবয়ব লাভ করে।[১]

সংস্কৃতির বস্তুগত ভিত্তি

বাষ্পশক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য জাতি এ দেশে যে পণ্যসম্ভার পাঠাল তার মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক বাঙালী সর্বপ্রথমে লাভ করল বণিক ইংরাজের

১ গোপাল হালদার ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ সংস্কৃতির সদর্থ

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। আধুনিক সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তারে এ ইংরাজ-সাহচর্যের ফল যে কতটা অর্থপূর্ণ ছিল, তার সাক্ষ্য দেয় বাঙালীর পরবর্তী ইতিহাস। একই শক্তির সহায়তায় শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধারণ বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল তাও লক্ষ্য করা হয়েছে পূর্ব অধ্যায়ে। এ পরিবর্তনের ফলে সে যুগের বাঙালী বাধ্য হয়েছিল নতুন জীবিকা গ্রহণে। বাঙালীর এ জীবিকা-পরিবর্তন পল্লীমুখী বাঙালী সংস্কৃতিকে করেছে নগরমুখী, আর পল্লী ও নগর জীবনের ব্যবধানকে করেছে দুস্তর। জীবন পরিবেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রভাব অনিবার্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে সাহিত্যপ্রয়াসে যার ফলে পল্লীকেন্দ্রিক মধ্যযুগের সাহিত্য বিবর্তিত হয়েছে নাগর সাহিত্যে। এ বাষ্পচালিত জলযান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে শুধু বিলাসের পণ্যই বহন করে আনেনি, সঙ্গে সঙ্গে এনেছে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উপকরণ—জ্ঞানসমৃদ্ধ নানা পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ। ফলে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম যুগে ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আগত কোন কোন শিক্ষিত বাঙালীর মানস-কৌতূহল হয়েছে উদ্দীপ্ত, পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রগতিশীল ভাবধারা তাঁদের জাতীয়তাবোধ ও সংস্কারচেতনাকে করেছে জাগ্রত। এই বাষ্পচালিত জলযানই সুদূর য়ুরোপকে শিক্ষিত বাঙালী-জীবনের নিকটে এনেছে, যার ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ বাঙালীর নবজন্ম ঘটিয়েছে।

এ বাষ্পশক্তি-চালিত জলযান আধুনিক বাঙালীকে পাশ্চাত্ত্যের বস্তু ও ভাব-সম্পদের সঙ্গে পরিচয় লাভে সহায়তা করেছে; আবার বাষ্পচালিত রেলগাড়ির ব্যাপক প্রচলন বাঙালীর সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধকে প্রসারিত করেছে ভারতীয় চেতনার উদার অবকাশে। ডাক, তার ও পরে (বিংশ শতাব্দীতে) বেতারের ব্যবহার আধুনিক বাঙালী জীবনকে যুক্ত করেছে শুধু সর্বভারতীয় জীবনের সঙ্গে নয়, সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে। সর্বশেষে এসেছে বিদ্যুতশক্তি। আধুনিক সংস্কৃতিবিকাশে এ শক্তির ভূমিকা কি তা বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশে সব চাইতে বেশী সহায়তা

করেছে বোধ হয় মুদ্রাযন্ত্র, যার উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে। এ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বাংলা বইয়ের ব্যাপক মুদ্রণ যদি সম্ভব না হত তা হলে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে আমরা এখনও পাণ্ডুলিপির যুগে থেকে যেতাম, শিক্ষা লোকায়ত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শুধু মাত্র শিক্ষায়তনের মধ্যে নয়, শিক্ষায়তনের বাইরেও বিস্তৃত জ্ঞানানুশীলন সম্ভব হয়েছে। এ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা পেয়ে গত শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র। সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়নি, এ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করেই ক্রমশঃ জাগ্রত হয়েছে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ, আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশে যার প্রভাব ছিল প্রায় সর্বাত্মক। সাহিত্য পত্রিকাগুলিকে আশ্রয় করেই বাঙালীর সাহিত্যপ্রতিভা ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে, আর সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্য—বাঙালী সংস্কৃতি-নির্মাণে যার প্রভাব অনস্বীকার্য।

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আরো অনেক আছে দেখা যাবে। কিন্তু উক্ত বর্ণনা হতে সে উপাদানের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই।

সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি

বস্তুগত উপাদান সংস্কৃতি বিকাশের পথকে সুগম করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবগত প্রেরণাই জাতীয় সংস্কৃতিকে সচল করে, পূর্ণ অবয়বে গঠিত করে তোলে। আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি হল বাঙালীর বুদ্ধির মুক্তি ও হৃদয়ের মুক্তি,—যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি আলোচনায় প্রথমেই একটা জিনিস উল্লেখ্য। বুদ্ধির মুক্তিতে সংস্কৃতি একটা সুস্পষ্ট রূপ পায় বটে, কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মুক্তি না ঘটলে সংস্কৃতি কখনও পূর্ণরূপে বিকশিত হবার অবকাশ পায় না। জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত আছে বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির মধ্যে। আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনাও বুদ্ধি ও হৃদয়মুক্তি-সাধনারই একটানা ইতিহাস।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই এ বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তি-সাধনা সে যুগের মোহাচ্ছন্ন বাঙালীর সামনে এনে দিয়েছিল একটা নবজীবনের ইঙ্গিত। সমস্ত শতাব্দী ব্যাপী নবজাগ্রত বাঙালী মনীষী এবং বিবেকবান স্বজাতি-প্রেমিক কর্মীদের জীবন ও কর্মবৃত্তের মধ্যে ফুটে উঠেছে এ দ্বৈত সাধনার পরিচয়। সমকালীন সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে কোন কোন মনীষী অবশ্য প্রাধান্য দিয়েছেন বুদ্ধির মুক্তির উপর, আবার কোন কোন মনীষীর জীবন আবর্তিত হয়েছে হৃদয়ের মুক্তি-সাধনায়। আবার কোন সময় দেখা যায় যুগপ্রয়োজনে একই মনীষীর জীবনে এ দ্বৈত সাধনা যুগপৎ রূপ লাভ করেছে। এ সংস্কৃতি সাধনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান আলোচনা। আধুনিক রাজনীতিরও উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ফলে। তবে আধুনিক সাহিত্য আলোচনাটাই এখানে আমাদের মুখ্য প্রয়াস।

আধুনিক সংস্কৃতি সাধনায় প্রধানতঃ বুদ্ধির মুক্তিপথে অগ্রসর হয়েছিলেন যুগস্রষ্টা রামমোহন, ডিরোজিওর শিষ্য-সম্প্রদায় (Derozians), অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য-ভারতীয়-সংস্কৃতি-পুনরভ্যুত্থানের কোন কোন নেতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষী। আবার হৃদয়ের মুক্তিপথে একটা উদার সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ক্রান্তিদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী। অবশ্য এঁদের মধ্যে কোন কোন মনীষীর জীবনে বুদ্ধি ও হৃদয়মুক্তির সাধনা একই সঙ্গে দেখা যায়। রামমোহন রায় বুদ্ধিমুক্তির সাধনা করেছিলেন ব'লে হৃদয়মুক্তির সাধনা তাঁর জীবনে ছিল না এ কথা বলা যায় না; আবার দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মুখ্যতঃ হৃদয়মুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও একটা সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টি ভিত্তি রচনা করেছে তাঁদের সুগভীর জীবনবোধের। হৃদয়ের মুক্তি স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতীয় জীবনের জাগরণের পথ হলেও মননের মুক্তির উপরও তিনি কম জোর দেননি। আবার প্রখর মনীষার সাহায্যে বাঙালীর সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে

মোহমুক্ত করবার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ জীবনলাভের জন্যে জাতির হৃদয়কে জাগ্রত করবার সমান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র।

রামমোহনের পরে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়। ডিরোজিওর 'অ্যাকাডোমিক এশোশিয়েশন' বিস্তৃত জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ ও স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তাঁর ভাবশিষ্যদের করে তুলল প্রবল স্বাতন্ত্র্যবাদী; পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী দর্শন-পাঠের ফলে তাঁরা হয়ে উঠলেন প্রবল সংশয়ী। হিন্দুর সনাতন ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি এবং জীবনচর্যার স্বাভাবিক সরলতাকে তাঁরা দেখতে লাগলেন অন্তহীন ঘৃণার চোখে; এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অনুকরণের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেলেন জীবনের চরম সার্থকতা।

হিন্দু কলেজের নব্য ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এ কালাপাহাড়ী মনোভাব ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে চরমে উঠ্‌লেও তার সূচনা হয়েছিল রামমোহনের জীবৎকালে। ফরাসী বিপ্লবের বৈদ্যুতিক ভাবস্পর্শ এবং ইংরাজ জাতির প্রগতিশীল মতামতের প্রবলতা তাঁদের উদ্দীপ্ত মনে ধরিয়ে দিয়েছিল বিপ্লবের বহ্নিশিখা। এ বিপ্লবাত্মক ভাবধারা ব্যক্তিজীবনে করে তুলেছিল তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল এবং গোষ্ঠিগত জীবনে নাস্তিক্যভাবাপন্ন। চিন্তা ও জীবনের ক্ষেত্রে এ স্বধর্মচ্যুতি ও নাস্তিক্যবুদ্ধি স্বধর্ম ও স্বজাতিপ্রেমিক রামমোহনকে পর্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত করেছিল। রামমোহন তাঁদের এ নাস্তিক্যবুদ্ধি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সমালোচনা করেন। তাঁরাও রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনকে ধর্ম এবং রাজনীতির মাঝামাঝি একটা জগাখিচুড়ি বলে উপহাস করতেও দ্বিধা করেননি। এ সম্প্রদায়ের কোন কোন চরমপন্থী বিপ্লবী ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীকে স্তম্ভিত করে দিলেন প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। আবার ডিরোজিওর মননশীল সমাজবিপ্লবী চিন্তাধারা যাদের গভীরভাবে স্পর্শ করেনি তারা শুধু মদ্যপানকেই মানসমুক্তির প্রধান প্রতীক বলে গ্রহণ করল।

অবশ্য একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ডিরোজিও-শিষ্যদের নিত্য-

নূতন চিন্তা, মনন, জ্ঞানানুশীল ও অচিন্ত্যপূর্ব কর্মক্ষেত্রে সবল পদক্ষেপের ফলেই আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতিতে সর্বপ্রথমে একটা উদ্দাম প্রাণচঞ্চল জাগৃতির লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্ত্য সজীব সভ্যতার ভাবপ্রেরণায় তাঁরা শুধু বাঙালীর বহুযুগলালিত সংস্কারের মূলে আঘাত করেই ক্ষান্ত হননি, জাতীয় চিত্তকে আকর্ষণও করেছিলেন প্রগতিশীল বিচিত্র কর্মোদ্যম ও মননের পথে। 'The Enquirer,' 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'Bengal Spectator,' 'Quill,' এবং 'মাসিক পত্রিকা' প্রভৃতি সংবাদপত্র ছিল তাঁদের বিপ্লবাত্মক ভাবপ্রকাশের মুখপত্র। ডিরোজিওর বিখ্যাত 'Academic Association'কে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। নিত্যনতুন জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ বিচরণের জন্যে তাঁরা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন 'Society for the Acquisition of General knowledge," বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা।'

উল্লেখযোগ্য ডিরোজিও-শিষ্যদের বিশিষ্ট চিন্তা ও বহুমুখী কর্মোদ্যমের একটা মোটামুটি খতিয়ান নিলে দেখা যাবে, জীবনের কত বিচিত্রধারায় তাঁদের মুক্তবুদ্ধি সার্থকতার পথ খুঁজেছিল।

১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামমোহনের বিভিন্ন স্মৃতিসভায় ডিরোজিও-শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক কোম্পানির চার্টার পরিবর্তন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে দাবী উপস্থিত করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন তাঁরা একটি কারিগরি বিদ্যালয়। সুদূর মরিসাসে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে ডিরোজিও-শিষ্যেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন; জুরী প্রথায় বিচারের দাবী, ইংরাজীকে আদালতের ভাষা হিসেবে গণ্য করবার দাবী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবী এবং সরকার কর্তৃক কুলীদের বেগার খাটাবার রেওয়াজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে তাঁরা যে মানসিক সক্রিয়তার পরিচয় দেন তা সে যুগে ছিল একান্ত দুর্লভ। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় তাঁরা নিছক সংস্কৃতি-চর্চার স্তর অতিক্রম করে বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হন দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনায়। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অ[illegible]গুলিতে শুধু যে সামাজিক ও বিভিন্ন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ পড়া [illegible] নয়, এ সা[illegible]তিক সংস্থাটি হয়ে উঠল ক্রমশঃ রাজনীতি চর্চার

কেন্দ্রস্থল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায় মানবতাবাদী জর্জ টমসনের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্থাপন করলেন 'বেঙ্গল বৃটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। এ রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমবেত চেষ্টায় প্রজার স্বার্থরক্ষা।

এ সমস্ত কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ দেশের মধ্যে জাগ্রত করে তুললেন একটা রাজনৈতিক চেতনা। 'ব্ল্যাক এক্টে'র খসড়া বিল সমর্থনে তাঁর তেজোগর্ভ মন্তব্য—(Remarks on the Black Acts) সে যুগের পক্ষেও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তার পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

শুধুমাত্র সাধারণ সংস্কৃতিচর্চা বা রাজনৈতিক চিন্তায় নয়, সে যুগের সাহিত্য, শিক্ষা, ও সমাজসংস্কারেও ডিরোজিওর মনস্বী শিষ্যসম্প্রদায় যে বিদ্রোহ-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, আধুনিক বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তি ও সংস্কৃতিপ্রসারে তার প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের ভাষান্দোলন আধুনিক বাংলা গদ্যকে গতিমন্থরতা ও আড়ম্বরমুক্ত করে নবসৃষ্টির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার এবং রামতনু লাহিড়ী হিন্দু-সংস্কারের জীর্ণ অচলায়তনে আঘাত করে সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী মনে নতুন ভাবান্দোলন উপস্থিত করেছিলেন,—হোক সে আন্দোলনের প্রভাব স্বল্পস্থায়ী। ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ সংস্কারের আদর্শ তাঁদের যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, তার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না কোথাও। জীবনচর্যায় বা সামাজিক আচার আচরণে যে সমস্ত লোকব্যবহারকে তাঁরা যুক্তিহীন বলে জেনেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি। আবার সমসাময়িক যে সংস্কারপ্রয়াসকে তাঁরা সমাজ-প্রগতিমূলক মনে করেছেন, তার জন্য অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বার্থত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। (এ প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে ভূমিদান স্মরণযোগ্য)।

ডিরোজিও-শিষ্যদের বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনে বেগ ছিল, বলিষ্ঠতা ছিল—

একথা অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু তাঁদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন সংস্কৃতি চিন্তায় ছিলনা কোন সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল আদর্শভাবনা, যার ফলে তাঁদের বিপ্লবী চিন্তাধারা জাতীয় চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ভাঙনের কাজে যতটা অগ্রসর হয়েছিল, গঠনের কাজে ততটা ক্রিয়াশীল হয়নি। একজন আধুনিক সংস্কৃতি-সমালোচক ডিরোজিও-শিষ্যদের চরমপন্থী সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

"...Their stand lacked much positive content and they failed to develop a definite progressing ideology. The concept of the people and their rights which had flowered in the great western bourgeois-democratic revolution that had awakened them did not take much concrete shape in their mind,...They made some mark in their day but none the less, they faded out like "a generation without fathers and children."[১]

সমকালীন সমাজ ডিরোজিও-শিষ্যদের এ ভাববিপ্লব প্রচেষ্টাকে কি চোখে দেখেছিল এবং জাতীয় জীবনের একাংশের উপর তাঁদের একপেশে সংস্কৃতি-সাধনা কি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে ঐতিহাসিক সত্যের বিবৃতিপ্রসঙ্গে উক্ত সংস্কৃতি-সমালোচক বলেন :

"Their only trait which was widely copied in contemporary society was the escape from social conventions ; but even here there was no sturdy revolt or bold defiance but mere evasion. This led to sad corruption in which there was amongst the immitators no trace of personal integrity and courage of the real Derozians which has such a charm even to-day." [২]

১ Notes on the Bengal Renaissance, The Derozians—Amit sen, p 21

২ Notes on the Bengal Renaissance, The Derozians—Amit Sen, p. 27.

আধুনিক সংস্কৃতি বিকাশে ডিরোজিও-শিষ্যদের বুদ্ধিমুক্তিসাধনার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর ; কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং স্বদেশীয় গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন পরিবেশে এ আন্দোলনের প্রভাব জাতীয় জীবনের উপর স্থায়ীভাবে বিস্তৃত না হয়ে নাগরিক জীবনে যে একটা অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, এ ঘটনা বেদনাদায়ক হলেও সত্য।

ডিরোজিয়ানদের স্বধর্মের প্রতি আস্থাহীন প্রগতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতীয় চিত্তকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমির উপর স্থাপন করবার জন্যে। মহর্ষির 'আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' -চর্চার সঙ্গে ঐতিহ্যাশ্রয়ী বিচিত্র কর্মোদ্যম মিশ্রিত হয়ে সমকালীন বাঙালী সংস্কৃতিকে এমন একটা বিশিষ্ট রূপ দিল, জাতীয় জীবনে যার প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী।

ডিরোজিও-শিষ্যদের জীবনের গতিকে তুলনা করা চলে একটা অতি দ্রুত-গামী বৈদ্যুতিক ট্রেনের সঙ্গে যে ট্রেনের গন্তব্য কোথায় জানা নেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে উদ্দাম গতিবেগকে সংযত করতে চাইলেন আত্মবীক্ষা, প্রার্থনা, আর চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে। মহর্ষির ভাবশিষ্য কেশবচন্দ্রও জাতির চিত্তকে একই উপায়ে আকর্ষণ করলেন বিশ্বাস ও আত্মিক জাগরণের পথে। তাঁর গভীর প্রত্যয়শীল হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে যুক্ত হল সমাজতাত্ত্বিকের যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনায়ও সে একই গভীর আত্মসমীক্ষা আর বিশ্বাস! এ বিশ্বাস স্বামীজির জ্ঞান ও বিশুদ্ধ হৃদয়ধর্মী প্রেমের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজির গভীর আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, জ্ঞান প্রেম ও কর্মময় জীবনবোধই শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করল এমন একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর যার ফলে সে যুগের বাঙালী জেগে উঠল নবতর জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে। শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী রেনেসাঁস নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠল শতাব্দী-শেষে। এ রেনেসাঁসের ভিত্তিভূমি হল আত্মার জাগরণের ভিত্তিতে একটা নতুন ধর্মবোধ। ঐতিহ্যাশ্রয়ী এ উদার ও সমন্বিত ধর্মবোধ স্পর্শ করল সমগ্র জাতির চিত্তকে, ফলে এ রেনেসাঁসের প্রভাব হল বহুবিস্তৃত ও স্থায়ী। এ রেনেসাঁসের

ফলেই গড়ে উঠল নবীন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও রঙ্গমঞ্চ। বাঙালী-সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল নতুন দিগন্তে। আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতির মৌলিক প্রেরণার সন্ধানে আবার আমাদের ফ্রেজারের ধারণায় ফিরে আসতে হয়। ফ্রেজার বলেছেন:

"We are not to make sense of time and history by inventing imaginary patterns of eternal recurrence, nor, on the otherhand, by boarding, like Wells and Shaw, a fast train with no known destination. In the larger sense, just as man depends on God and time on eternity, so for society at large culture depends on religion. In a civilization without faith, such as our own, everything tends to disintegrate and everybody tends to drift." [১]

সংশয় হতে উদার ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের জগতে উত্তরণের ফলেই গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছিল একটা সজীব সংস্কৃতি ও প্রাণবন্ত সাহিত্য—যার পূর্ণ পরিণতি দেখি বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র-সাহিত্যে। আবার ইতিহাসের পুনরাবর্তনে সংশয় ও বিশ্বাসহীনতা আক্রমণ করেছে আমাদের এ যুগের সভ্যতাকে, যার ফলে সমাজ যাচ্ছে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে, আর ধর্মবোধহীন একটা কল্পিত সমাজ-প্যাটার্ণের স্বপ্ন নিয়ে আজকের সাহিত্যশিল্পী ও সমাজনেতারা ভেসে চলেছেন একটা অজানা স্বপ্নজগতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

আধুনিক সংস্কৃতিবিকাশে জাতির মানস-সম্পদ

আধুনিক সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য হল, আত্মশক্তির জাগরণ যেমন সে সংস্কৃতিকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, তেমনি জাতির মানস-সম্পদ সে সংস্কৃতিতে এনে দিয়েছে একটা ব্যাপক প্রসার। এ মানস-সম্পদ বৃদ্ধিতে সব চাইতে সহায়তা করেছে উনবিংশ

১ Fraser, G, S. The Modern Writer and his world.—The Background of Ideas, p. 17.

শতাব্দীর নবপ্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষা। ফারসীর স্থলে ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করবার যুগান্তরকারী সিদ্ধান্তের ফলে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তন হয়েছে ; আর যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ছিল প্রথমে হিন্দুকলেজের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় ও নিত্য নতুন স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠায় সে শিক্ষার সুযোগ হয়েছে দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট বিস্তৃত। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারও এনে দিয়েছে জাতীয় জীবনে নতুন জাগরণের মন্ত্র। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যাপক ও গভীর পরিচয়ের ফলে পূর্বযুগের 'বাবু'-সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্টি হয়েছে মুক্ত মানসাশ্রয়ী মিশ্র-সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতিবৃত্তের এক কোটিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী, আর এক কোটিতে নব্যশিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ উদার সংস্কৃতি প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গত শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্য, নাট্যকলা ও চিত্রশিল্প।

কেবলমাত্র গত শতাব্দীতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলি নয়, কলকাতার বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিও জাতির মানস-সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে প্রচুর। যে সমস্ত বিদ্যায়তন দেশীয় প্রাচীন চিন্তাধারা ও বিদেশী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি 'মানবিকী বিদ্যা' (Humanistic studies) ও বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করে বাঙালীর মানস-সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, কলা মহাবিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেথুন কলেজ প্রভৃতি। প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং জাতির মানস-সম্পদ বিকাশের সুযোগ দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি সম্প্রসারণে প্রধানতঃ সাহায্য করেছিল কলকাতার নিম্নলিখিত সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি :—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ; টাউন হল, কৃষি সমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, মেটকাফ হল, কলা মহাবিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সেনেট হল, এলবার্ট হল, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি

ইনষ্টিটিউট্, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ্, প্রভৃতি।[১]

এ সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় আলোচনা-গবেষণার ফলে জাতির মানস-সম্পদ বর্ধিত হল, এবং বাঙালী সংস্কৃতি ক্রমশঃ যুক্ত হল বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে।

গত শতাব্দীতে জাতির মানস-সম্পদ সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বাঙালী-মনীষীর প্রয়াসই শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় নয়, উক্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্রের বহুমুখী কর্ম-ধারার আলোচনায় দেখা যায় কয়েকজন সহৃদয় বিদেশীয়ও বাঙালী মানসের দিগন্তবিস্তারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন। এ সমস্ত সংস্কৃতিপ্রেমিক বিদেশীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন স্যর উইলিঅম জোন্স্ (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি), ফাদার ইউজিন লাফোঁ (ভারতবর্ষের "father of Scientific research" নামে খ্যাত ; ১৮৭১—১৮৭৯ পর্যন্ত সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজের রেক্‌টর), রবার্ট কীড্ (উদ্ভিদ্ সংগ্রহশালার প্রথম উদ্‌ভাবয়িতা), ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও ও রিচার্ডস্‌সন, উইলিঅম কেরী, পাদ্রী ডাফ্, লর্ড বেণ্টিঙ্ক, স্যর চার্লস মেটকাফ্ (মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত), জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (স্ত্রী শিক্ষা), ই. বি. হ্যাভেল (ভারতীয় শিল্প), ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালেচ (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম)।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর আলোচনা-গবেষণায়, শিল্প-সাহিত্যের চর্চায়, সংস্কৃতি বিকাশের নানাবিধ বাধা অপসরণে উক্ত সহৃদয় বিদেশীরা যদি সেদিন সবল পদক্ষেপে অগ্রসর না হতেন, তা হলে গত শতাব্দীতে বাঙালীর মানস-সম্পদ এত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হত কিনা তা খুবই সন্দেহের বিষয়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী-মানসের শুভ সংযোগে অবশেষে জন্ম নিল আধুনিক বাংলা কাব্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য ও জীবনদৃষ্টির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে মানস-সম্পদ বর্ধিত না হলে শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের সাহায্যে মধুসূদন এই নবীন কাব্য সৃষ্টি

১ জাতির মানস-সম্পদ বৃদ্ধিতে এ সমস্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 'সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' নামক গ্রন্থে।

করতে সক্ষম হতেন কিনা তা চিন্তাসাপেক্ষ। এ মানস-সম্পদ বৃদ্ধির ফলে বাংলা কাব্য সর্বপ্রথম গতানুগতিকতা মুক্ত হল; কাব্যের form ও content-এ এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভারতচন্দ্র ও টমাস মুরের কাব্যাদর্শকে অতিক্রম করে বহু-অধীত মধুকবি সর্বপ্রথম আত্মীয়তা স্থাপন করলেন হোমার-ভার্জিল-দান্তে-ট্যাসো প্রভৃতি ক্লাসিক কবি এবং আধুনিক মহাকবি মিল্টনের সঙ্গে।

শুধুমাত্র form-এর অভিনবত্বই নয়, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তনের ফলেই মাইকেলের সৃষ্টিতে সাহিত্য সর্বপ্রথম প্রকৃতপক্ষে আধুনিক-ধর্মী হয়ে উঠল। হিন্দুর চিরাচরিত দৈব-প্রাধান্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর স্থলে দেখা দিল গ্রীক প্যাগান দৃষ্টির ঋজুতা, ফলে ব্যক্তিহৃদয়ের আনন্দ-বেদনার স্পর্শে জেগে উঠল ব্যক্তিত্বধর্মী ও জীবনধর্মী সাহিত্য। জীবনদৃষ্টির এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টি-প্রসঙ্গে কী গভীর অর্থপূর্ণ ছিল সেদিনের কাব্যপাঠক তার যথার্থ মূল্য অনুধাবন করতে না পারলেও আজকের পাঠকের কাছে সে ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সমকালীন জীবনের প্রতি প্রবল কৌতূহল সত্ত্বেও মানস-সম্পদের অভাবে বাংলা কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মধ্যযুগীয় ও নবীন ভাবধারার দ্বন্দ্বে কিরূপ দ্বিধাকম্পিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য। রঙ্গলালের মানস-সম্পদ খুব সমৃদ্ধ না হলেও জাতীয় ইতিহাসের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম অধুনিকতার আবাহন করেছিল। সমাজলাঞ্ছিত জীবনের প্রতি রামনারায়ণের বেদনাবোধ অকৃত্রিম হলেও সংস্কৃত পণ্ডিতের আধুনিক নাট্যশিল্পজ্ঞানের অভাব তাঁর সৃষ্টি প্রয়াসের ব্যর্থতার মূলে। প্যারীচাঁদের মানস-কৌতূহল বহুমুখী হলেও আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের টেকনিক তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি; তাই তাঁর উপন্যাস রচনা-প্রয়াস আজ শুধু ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ভূদেবের মননশীল প্রজ্ঞা বিশ্ব-ইতিহাস ও দেশীয় সমাজকে কেন্দ্র করে বিকশিত হলেও পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক উপন্যাসের সৌন্দর্যচেতনা তাঁর শিল্পী-অন্তরকে স্পর্শ করেছিল; সেজন্যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সর্বপ্রথম অভ্যাগমধ্বনি শুনতে পাই আমরা তাঁর ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাসে।

হিন্দু কলেজ বিলুপ্তির পর প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মানবিকী বিদ্যার ধারা বাঙালী শিক্ষার্থীদের নিকট হল অবাধ উন্মুক্ত। এ নব্যশিক্ষিত বাঙালীর প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হল বহু বিদ্বৎ-সভা। সে সমস্ত সভায় নানামুখী আলোচনা-গবেষণায় জাতির মানস-সম্পদ আরো বৃদ্ধি পেল। সৃষ্টি ও মননধর্মী ইংরাজী সাহিত্যের প্রাণধর্মে সঞ্জীবিত হল শিক্ষিত বাঙালী। ব্যক্তিগত কার্যোপলক্ষে ও সমষ্টিগত চেতনায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভারত-ভ্রমণ তাদের দৃষ্টিসীমা প্রসারে সহায়ক হল। একটা উদার সর্বভারতীয় চেতনা এল বাঙালীর মনে। মানস-সম্পদ বৃদ্ধির ফলে সনাতন ভারত-সংস্কৃতি উজ্জীবনের স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগল বাঙালী শিল্পী ও সাহিত্যিক। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থে এবং স্বাধীনজাতির জীবন-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালীর য়ুরোপ-ভ্রমণ বাঙালীর দৃষ্টিসীমাকে করল আরো প্রসারিত। প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বাঙালীর স্বাধিকারচেতনাও হল ক্রমশঃ জাগ্রত। এ নব-উদ্বুদ্ধ জাতীয় চেতনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চাইল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ। ফলে বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিরোধ উঠল অনিবার্য হয়ে। জাতি-বৈরের ভিত্তিতে এ ভাবে বিকশিত হল বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ।

এ জাতীয়তাবোধ প্রধানতঃ ভাবধর্মী সন্দেহ নেই ; কারণ এ নব-উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবোধের প্রথম যুগে কোন স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী সশস্ত্র বা নিরস্ত্র গণবিপ্লবের সাহায্যে বিদেশী শক্তিকে দেশ হতে বিতাড়িত করবার কল্পনাও করেননি। এ জাতীয়তাবোধের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হল স্বাধীনতাকামী জগতের জাতিসমূহের ইতিহাস ও সাহিত্যপাঠে জাতির মানস-সম্পদ বৃদ্ধি। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীকে শ্রদ্ধাবানও করে তুলল নবজাগ্রত জাতীয়তার প্রেরণা। ফলে সুরু হল জাতির গৌরবোজ্জ্বল বিস্মৃত ইতিহাসের আলোচনা-গবেষণা, আর আধুনিক যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাচীন শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। এ জাতীয়তাবোধের উদার ভিত্তি রচনা করেছে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নত জীবনবোধ, কিন্তু নবলব্ধ স্বাজাত্যবোধের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল—স্বদেশপ্রেমিকের ঐতিহ্যপ্রীতি আধুনিক দৃষ্টিবর্জিত নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত বাঙালীর সম্প্রসারিত মানস-সম্পদের রসরূপ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হল বঙ্কিমের উপন্যাসে, আর মননশীল রূপ এ মনীষীর প্রবন্ধ সাহিত্যে এবং প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনা-গবেষণায়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করলেও শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমের যে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা মুখ্যতঃ রোমান্টিক। বঙ্কিমের এ রোমান্সসৃষ্টি-প্রবণতা ইংরাজী রোমান্টিক উপন্যাস পাঠের প্রত্যক্ষ ফল। গভীর অনুশীলনের সাহায্যে ইংরাজী উপন্যাসের ভাবৈশ্বর্য এবং রচনাকৌশলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না ঘটলে বাংলা উপন্যাস এত শীঘ্র এ সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হত কি না তা চিন্তাসাপেক্ষ। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যের যে আকস্মিক যৌবনোদ্গম লক্ষ্য করা যায় তাও সম্ভব হত না যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক ও গভীর চর্চায় তাঁর মানস-সম্পদ সমৃদ্ধ না হত। বঙ্কিম-যুগে তারকনাথের উপন্যাসে সমাজাশ্রয়ী ভাবনার অন্যতম উৎসও হল বাস্তবধর্মী ইংরাজী উপন্যাস। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যে জাতীয়তা ও মানবতাবোধের উদ্দীপ্ত প্রেরণার মূলেও তাঁদের সমৃদ্ধ মানস-সম্পদ।

বঙ্কিম যুগে শিক্ষিত বাঙালী মনীষীর ক্রমবর্ধমান মানসসম্পদের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকতর হল, আর উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোদ্ভিন্ন বাঙালী-মানস দ্রুত অগ্রসর হল বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃততর সংস্কৃতি-জগতের অভিমুখে। বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে আরম্ভ হল সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা এবং ভারত সংস্কৃতি-চর্চায় রমেশচন্দ্র দত্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে প্রখর মনীষার পরিচয় দিলেন তা যে কোন যুগের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। স্বভাবতঃ ভাবালুতাপ্রবণ বাঙালী বঙ্কিমের পরিকল্পিত বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে লোকায়ত করবার দিকে অগ্রসর না হলেও, মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা' প্রতিষ্ঠার ফলে। ফাদার লাফোঁর উৎসাহ ও আনুকূল্যে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু হলেও

সমবেত প্রচেষ্টায় বাঙালী মনীষীদের মধ্যে এত ব্যাপক বিজ্ঞানচর্চা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। এ প্রতিষ্ঠানে নানামুখী বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাঙালীর অন্তর্মুখী মনকে ক্রমশঃ করল বিশ্বমুখী। গত শতাব্দীর শেষ কোটিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সার্থক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ে এনে দিল দৃঢ়তা এবং জড়জগৎ সম্পর্কে নিত্য নতুন অনুসন্ধিৎসা। এ আত্মপ্রত্যয় আরো বর্ধিত হল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের পুনরনুশীলনের ফলে। সমসাময়িক চিন্তাজগতে এ সমস্ত নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ভাবন শিক্ষিত বাঙালীর মানস-সম্পদের শুধু ঐশ্বর্য প্রমাণিত করেনি, মুখ্যতঃ ভাবধর্মী বাঙালী সংস্কৃতিকে যুক্ত করেছে আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে।

বঙ্কিমযুগের শেষ প্রান্তে সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা। সার্বভৌম প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকের সার্বিক সহানুভূতি ও সম্পন্ন মানস-সম্পদের স্পর্শে দেশসীমাবদ্ধ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতি অকস্মাৎ ব্যাপ্তিলাভ করেছে বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমৈত্রীভাবনাময় একটা উদার সংস্কৃতি জগতে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এ গ্রন্থের উত্তরভাগে আলোচ্য।

১

যুগারম্ভ ॥ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ॥ ভাববিপ্লব ॥ রামমোহন

শুধু ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে নয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-বিচারেও এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে—রামমোহন আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে যে সংস্কারমুক্তি, সামাজিক আচার-বিচারের রাজ্যে যে উন্নত রুচিবোধ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে অদম্য প্রয়াস, এবং সাহিত্যে যে গভীর চিন্তার স্বাক্ষর আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, রামমোহনের জীবন ও সাহিত্য-সাধনায় তার প্রথম সূত্রপাত। রামমোহন রায় আধুনিক বাঙলার যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ।

যে সামাজিক, ধর্মীয় ও যুগশিক্ষার পটভূমিকায় রামমোহনের সংস্কার-প্রচেষ্টার সুরু, প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন; না হলে রামমোহনের এই নবযুগসৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি সহজ হবে না।

যে সময় রামমোহন বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৭৪)[১] আর যে সময় তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়, সে সময়কে বলা যায় বাঙালীর এক চরম রুচি-বিকৃতির যুগ। মাত্র কিছুকাল পূর্বে বাঙলাদেশ হতে মুসলমান রাজত্ব অপসৃত হয়েছে, কিন্তু মুসলমান রাজত্বের যে "অনিষ্টফল তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা"[২] তা তখনও সমাজের বড় ছোট সকলের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। বিত্তশালী লোকদের মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে সুরাপান এবং বাইজীনাচ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বাইজীর জন্য যে ধনী যত বেশী ব্যয় করতে পারত, সে ধনী সমাজে তত বেশী গৌরবের অধিকারী হত। ধনীদের মধ্যে মুসলমানদের অনুকরণে স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে অবরোধ এবং বহুবিবাহ ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক।

১—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২)

২—শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৪০

এ ছাড়া বিবাহিত লোকের পক্ষেও বারাঙ্গনা নিয়ে প্রকাশ্যে আমোদ-প্রমোদ করা তখন সমাজে নিন্দিত হত না। মিথ্যাচার, জাল জুয়াচুরি, উৎকোচ গ্রহণ করে অর্থ সঞ্চয় করা ছিল তখন সমাজের মধ্যে প্রশংসার ব্যাপার। বাজি ধরে ঘুড়ি ওড়াতে, বুলবুলির লড়াই দেখতে আর পায়রা ওড়াতে কলকাতার ধনীরা যে বিপুল অর্থব্যয় করত তা বর্তমান যুগে অকল্পনীয়। এ ছাড়া কবি. পাঁচালী, আখড়াই, তরজা প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ সঙ্গীতের আয়োজন করতেও বড়লোকেরা প্রচুর অর্থব্যয় করত।

সমাজের ধনীশ্রেণীর জীবন যেখানে কুরুচিপূর্ণ সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনও যে উন্নত হতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য। মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণও ধনীসমাজের অনুকরণে এভাবে কলুষিত জীবন যাপন করছিল। এ সময় শহরগুলিতে, বিশেষতঃ কলকাতা শহরে একশ্রেণীর অর্ধ-শিক্ষিত বাঙালীর উদ্ভব হলো যাদের বলা হত 'বাবু'।

শিবনাথ শাস্ত্রী এ বাবু-সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ "এই সময় সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে একশ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত।...মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ-অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমারেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট-করা উড়ানী ও পায়ে বগ্‌লস-সমন্বিত চীনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এস্রাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ-আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"[১] এ ছাড়া গাঁজা খাওয়া এবং গাঁজার আড্ডার সভ্য হওয়া সহরের অনেক নিষ্কর্মা যুবকের সংস্কৃতি-বিলাসের চিহ্ন বলে পরিগণিত হত। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় তাঁর 'রামতনু

১—শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (পৃঃ ৫৬)

লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক স্মরণীয় গ্রন্থে বৌবাজারের একটি গাঁজার আড্ডার ('পক্ষীর দল') কৌতুককর কাহিনীর অবতারণা করেছেন (পৃঃ ৫৬), কৌতূহলী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন।

এই তো গেল সামাজিক রীতিনীতি ও আমোদ-প্রমোদের কথা; শিক্ষার পরিধিও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ব্যবস্থা অনগ্রসর। কোনপ্রকার বাংলা বা ইংরাজী পাঠ্যগ্রন্থ তখন দেশে ছিল না; সেজন্য লিখতে শেখাটাই ছিল শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিছুদিন পাঠশালায় লিখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তানেরা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চলে যেত টোলে। তখনো ফারসী ভাষার মাধ্যমে রাজকার্য পরিচালিত হত বলে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের কিছুটা ফারসী শিখার ব্যবস্থা করত; আর যে ছাত্র জমিদারী সরকারে সামান্য কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতে চাইত বা ব্যবসা করবে স্থির করত, তারা আরো কিছুদিন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় পড়ে পাঠ সমাপ্ত করত। পাঠশালার পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল বর্ণমালা পাঠ, ধারাপাত, তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী, মানসাঙ্ক প্রভৃতি। গুরুমশাইদেরও নির্দিষ্ট কোনো বেতন ছিল না; যে ছাত্র গুরুমশাইকে যত বেশী অর্থ বা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করতে পারত, সে তার কাছে তত বেশী প্রিয় হত। পাঠশালার শাস্তিদানের প্রণালী ছিল নির্মম। অন্ততপক্ষে চৌদ্দ রকমের শাস্তি দেবার প্রণালী তখন পাঠশালায় প্রচলিত ছিল।[১] গুরুমশায়ের হৃদয়হীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় ছাত্ররা মাঠে-ঘাটে পালিয়ে যেত। এই হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলাদেশে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা।

শিক্ষা ও সমাজজীবন যেখানে এত অনগ্রসর সেখানে ধর্মজীবনের অবস্থা যে আরো অবনত ও প্রতিক্রিয়াশীল হবে তাতে সন্দেহ কি? সনাতন হিন্দুশাস্ত্রচর্চা দেশ থেকে তখন একরকম অন্তর্হিত হয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুর উৎসবগুলি উপলক্ষে অতিরিক্ত আড়ম্বর ধর্মচর্চার অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচারের স্থান গ্রহণ করেছে সমাজ-প্রচলিত অন্ধ সংস্কারমূলক আচার; যে যত কঠোর আচার-পন্থী তাকে তত ধর্মজ্ঞ বলে মনে করা হত। হিন্দুদের

১ উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শিক্ষাসচিব মিস্টার উইলিয়ম এডামের দেশীয় শিক্ষার অবস্থা-সম্পর্কিত ১৮৩৪ সালের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন বেদচর্চার স্থান দখল করল স্মৃতি ও ন্যায়চর্চা; তন্ত্রশাস্ত্রের বিকৃত আলোচনার ফলে সমাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি পেল। প্রকৃত ধর্মজ্ঞানের অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণের আধিপত্য যে বেড়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণেরা তাই অব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের উপর চালাত নির্মম শোষণ, সতীদাহকে পরম পুণ্যের কাজ বলে ফতোয়া দিত, শিষ্য-দের কানে মন্ত্র দিয়ে ব্রাহ্মণেরা অনেক উপার্জন করত, যদিও তারা মন্ত্রের অর্থ কি নিজেরাই কিছু বুঝত না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ধর্মব্যবসা ত্যাগ করে কলকাতার আপিস-আদালতে ইংরেজের অধীনে কর্ম গ্রহণ করলেন, তারা দিনের বেলাকার ম্লেচ্ছস্পর্শ হাস্যকরভাবে দূর করতেন বিকেলে বাড়ী ফিরে অবগাহন স্নান করে। তারপর সন্ধ্যাপূজা সেরে আহার করতেন তাঁরা দিনের শেষ বেলায়।

ধর্ম যেখানে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার নামান্তর, সেখানে মানবতা যে নিত্য-নিয়ত লাঞ্ছিত হবে সে ত স্বাভাবিক। বাস্তবিকপক্ষে হয়েও ছিল তাই। ধর্মজীবনে বাঙালী তখন একটা পরম গ্লানিকর জীবন যাপন করছিল।

রামমোহনের আবির্ভাবের সমসাময়িককালে এই ছিল বাঙলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাজীবনের পটভূমিকা।

বাঙালী-জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপশিখা হাতে এগিয়ে এলেন সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী রামমোহন। তাঁর নতুন চিন্তা, নতুন শিক্ষা, নতুন কর্মধারার প্রবল স্পর্শে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালীর চিত্তভূমি হঠাৎ আন্দোলিত হয়ে উঠল। ধর্মচেতনা, সমাজসংস্কার, স্বাজাত্যবোধ, সাহিত্যনির্মাণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বচৈতন্যের বিস্তৃত অবকাশে বাঙালী-সংস্কৃতি রামমোহনের সাধনায় প্রাথমিক রূপ পেল। ক্রমশঃ এ প্রসঙ্গ আলোচ্য।

সমাজ, ধর্ম এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের যে সংস্কার-প্রচেষ্টা বাঙলা-দেশে নতুন সংস্কৃতি-পত্তনে সহায়তা করেছিল তার প্রস্তুতি-পর্বে ছিল বাল্যে ও প্রথম যৌবনে রামমোহনের উদার শিক্ষা। বাল্যকালে পাটনাতে আরবী ও ফারসী শিক্ষা প্রসঙ্গে রামমোহন পরিচিত হয়েছিলেন ইসলামের একেশ্বর-বাদের সঙ্গে, তারপর কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা উপলক্ষে তিনি পরিচিত হন

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্রের উদার ধর্মমতের সঙ্গে। আবার ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত কর্ম-উপলক্ষে তিনি যখন তাঁর মনিব ডিগ্‌বির সঙ্গে বাংলা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে ইংরাজী শিক্ষা করেন [ব্রজেন্দ্রনাথ] এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। এ ছাড়া আরো কিংবদন্তী আছে—প্রথম যৌবনে হিন্দুধর্মের বাইরে অন্য ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে তিনি সুদূর তিব্বত পর্যন্ত গমন করেন এবং তিব্বতী বৌদ্ধদের কুসংস্কার দেখে তার তীব্র সমালোচনাও করেন।[১] বাল্যকালে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের কাছে তন্ত্রশিক্ষা নিশ্চয়ই তাঁর মনকে বৈষ্ণব-স্বভাব-সুলভ ভাবালুতা হতে মুক্ত করে চরিত্রে এনে দিয়েছিল দৃঢ়তা এবং ঋজুতা। এই জন্যই বোধহয় রামমোহন ইহজীবনের ভোগ, সুখ ও আনন্দকে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আনন্দের মত সমভাবে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর জীবনের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা খুব সম্ভব সমকালীন ভিন্নধর্মী ইংরাজ বন্ধু ও মনিবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশারই ফল। তাঁর প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও খুব সম্ভবতঃ ইয়োরোপীয় ইতিহাস ও ইংরাজ-চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিজাত।[২]

রামমোহন বাঙলাদেশের সর্বপ্রথম সার্থক বুদ্ধিজীবী। সমসাময়িক ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে তিনি এ-কথা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন—এ বিদেশী নতুন রাজার আমলে আত্মসম্মান নিয়ে বাস করতে হলে বিস্তৃত জ্ঞানচর্চার সঙ্গে যথোপযুক্ত অর্থাগম-চেষ্টাও সমভাবে প্রয়োজন। সেজন্য অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি সম্প্রসারণে, কিংবা তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করে, অথবা ইংরাজের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত থেকে যে-কোনো উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। এদিক দিয়ে রামমোহন ইংরাজ গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের এই তিব্বত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিতর সত্য আছে বলে মনে করেন না। কারণ এরকম কোন বর্ণনা তাঁর কোন রচনাতে বা অন্য কোন লেখকের বর্ণনাতে পাওয়া যায় না। (দ্রঃ—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা : রামমোহন রায়, পৃঃ ১৪)

২ এ প্রসঙ্গে ১৮০৯ সনের ১২ই এপ্রিল রামমোহন ভাগলপুরের কালেক্টর স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন কর্তৃক অপমানিত হয়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট প্রতিকারের জন্য যে আবেদন করেন সে-পত্র দ্রষ্টব্য।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬)

রামমোহন বাঙলাদেশের সর্বপ্রথম মানবতাবাদী ও সংস্কারমুক্ত পুরুষ। এ মানবতাবোধ তাঁর উদার ধর্মশিক্ষার ফলেই হোক, কি পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদী ভাবধারার প্রভাবেই হোক, কি ধর্মের ক্ষেত্রে, কি সমাজের ক্ষেত্রে, কি ব্যক্তিজীবনে—যেখানেই তিনি মানবতার লাঞ্ছনা দেখেছেন সেখানেই তাঁর বিদ্রোহবাণী অগ্নিগর্ভ ভাষায় উৎসারিত হয়েছে। কি সতীদাহের নির্মম প্রথার উচ্ছেদ-অভিপ্রায়ে, কি জাতিভেদের বিষময় প্রভাব দূর করতে, কি অস্ট্রীয় সৈন্য কর্তৃক নেপল্‌স্‌বাসীর স্বাধীনতা-হরণের সংবাদ শুনে রামমোহন যে সমস্ত পত্রে নিজের নির্ভীক মনোভাব ব্যক্ত করেন, তাতে রামমোহনকে আধুনিক মানবতাবাদী মনীষীদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী বলতে দ্বিধা হয় না। বস্তুতঃ, চাকরি ছেড়ে ১৮১৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করবার পর বাঙলাদেশের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের যে বিরামহীন সংস্কার-প্রচেষ্টা, তা তাঁর বিস্তৃত ও গভীর মানব-মাহাত্ম্য উপলব্ধিরই ফল।

বাঙলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর হল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ। ঐ বৎসর মানিকতলা অঞ্চলে একটা বাড়ী কিনে রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস সুরু করেন; সে-সময় হতেই বাঙলা দেশের আধুনিক সংস্কৃতি-জগতে নতুন ভাববিপ্লবের শুরু হল। রামমোহনের আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীটি ছিল এ প্রগতিশীল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। এ ভাব-বিপ্লবীর প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এ বাড়ীতে যাতায়াত করতেন; এমনকি বিদেশী পর্যটকেরাও (যেমন—ফিট্‌স্ ক্লারেন্স—আর্ল অফ্ মানস্টার, ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরাজ মহিলা ফ্যানী পার্কস)[১] কলকাতায় এলে এ বাড়ীতে এসে রামমোহনের সঙ্গে দেখাশুনা ও আলাপ-আলোচনা করে তৃপ্তি পেতেন। মুসলমানী ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয়, এমনকি মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে বসে পানাহার করতেও তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। এজন্য আচারনিষ্ঠ

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬)

সমকালীন বাঙালী হিন্দুসমাজের কাছে রামমোহন যে তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠবেন তাতে আর বিচিত্র কি? রক্ষণশীল হিন্দুদের তীব্র সমালোচনার পাত্র হলেও, ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান রামমোহন তাঁর মুসলমান বন্ধুদের কখনও ত্যাগ করেননি।

প্রথম জীবনে আরবী-ফারসী শিক্ষা ও কোরাণ পাঠ, প্রথম যৌবনে বৈষয়িক কর্ম উপলক্ষে ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা এবং খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা, তারপর রংপুরে বাসকালে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর নিকট হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ে গভীর অনুশীলন রামমোহনের ধর্মজীবনে যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। এ মানস-বিপ্লবের প্রথম ফল ১৮০৩-৪ সনে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আরবী ভাষায় রামমোহন-রচিত 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্দিদীন' নামক গ্রন্থ। কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করবার পর রামমোহন গভীরভাবে হিন্দুর বেদান্ত ও বেদ-উপনিষদ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বেদান্তচর্চার ফল ১৮১৫ সনে প্রকাশিত 'বেদান্ত গ্রন্থ'। এ গ্রন্থখানি বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তরকারী রচনা সন্দেহ নেই। কারণ যে যুগে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুষ্ক আচার-নিষ্ঠাই ছিল ধর্মানুভূতির চরম প্রকাশ, সে সময় রামমোহনের বেদান্ত-বিষয়ক এ গভীর আলোচনা সমকালীন প্রগতিশীল হিন্দুদের মনে এক নতুন ধর্মজগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এ ছাড়া বাংলাভাষায় এ বেদান্ত-গ্রন্থের ভাষ্যরচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও একটা যুগান্তরকারী ঘটনা। যুগান্তরকারী এজন্য যে—সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুসৃতিই যে যুগে সাহিত্য-প্রয়াসের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হত, সে যুগে রামমোহন বেদান্তের মত এত গভীর অধ্যাত্মবিষয়ক গ্রন্থের ভাষ্য মাতৃভাষায় রচনা করে বাঙলাভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা যে কত বেশী তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করলেন। অবশ্য এরকম কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল না; অতএব বলা ভাল, তাঁর বেদান্ত ভাষ্য রচনার মধ্য দিয়ে বাঙলাভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা প্রমাণিত হল।

এই ত হল ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। এর পর তীক্ষ্ণধী রামমোহন অনুভব করলেন ধর্মের ক্ষেত্রে এ সংস্কার-আন্দোলনে

শক্তি ও বেগ সঞ্চার করতে হলে চাই সমবেত প্রয়াস। এ উদ্দেশ্যে তৎকালীন কলকাতার সমাজে প্রগতিশীল মতবাদী যাঁরা, তাঁদের নিয়ে স্থাপন করলেন তিনি 'আত্মীয় সভা'—খ্রীষ্টীয় ১৮১৫ সনে। এ আত্মীয়-সভাও বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতি-বিবর্তনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য আলোকস্তম্ভ। এ সভার সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেযুগের শিক্ষিত বাঙালী ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান পেল।[১] রামমোহনের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মালোচনায় মুগ্ধ হয়ে সমসাময়িক প্রগতিশীল ও বিত্তবান হিন্দুরা তাঁর চারদিকে সমবেত হতে লাগলেন; ওদিকে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজও ধর্মীয় ব্যাপারে রামমোহনের এ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন দেখে তার বিরোধিতা করতে উঠেপড়ে লাগলেন। বাঙলার সংস্কৃতি-জীবনে রক্ষণশীল প্রাচীন ও সংস্কারপন্থী নবীনের প্রবল দ্বন্দ্ব জেগে উঠল। এ দ্বন্দ্বে নতুন প্রাণশক্তির অধিকারী সংস্কার-পন্থীরা জয়ী হয়ে সমন্বয়ের ভিত্তিতে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে তুললেন—সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

রামমোহন বেদান্তধর্মের ভাষ্য রচনা করেই শুধু নিশ্চেষ্ট রইলেন না। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্যেই যে প্রাচীন শাস্ত্রগুলি প্রধানতঃ রচিত হয়েছিল—এ সত্য প্রমাণ করবার জন্যে তিনি প্রবল উৎসাহে অতঃপর ক্রমান্বয়ে কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি কতগুলো উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। শুধু প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, নিজ ব্যয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচারের ব্যবস্থাও করেন।[২]

১ 'আত্মীয় সভা' যে সমসাময়িক সংস্কারমুক্ত ধর্মালোচনার সভা মাত্র ছিল না, সমাজ-সংস্কারও যে এ-সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল – শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৮১৯ সালের ৯ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনের বিবরণ উদ্ধার করে তা প্রমাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত অন্ততঃ এমন কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়নি, যা এ-সভাতে অন্ততঃ আলোচিত না হয়েছে।" দ্রঃ পৃঃ ১১১। "'আত্মীয় সভা' প্রকাশ্যে বেদপাঠ বা ব্রহ্মোপাসনার সভা হলেও, সমাজ-সংস্কার ছিল তার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য।" —পৃঃ ১১২। ১৮১৯ সালের ৯ই মে তারিখে 'আত্মীয় সভা'র যে অধিবেশন হয় তাতে—"জাতিভেদ, নিষিদ্ধ খাদ্য, বাল্যবৈধব্য, বহুবিবাহ, সতীদাহ-সহমরণ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে এই অধিবেশনে অবাধ-আলোচনা হয়েছিল। বোঝা যায়, কেবল এই অধিবেশনেই হয়নি, আরো অনেক অধিবেশনে হয়েছিল।"—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড পৃঃ ১১২)—বিনয় ঘোষ

২ 'আত্মীয় সভা' গঠনের পর প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে রামমোহন কী

এ সময় খ্রীষ্টের উপদেশের সার সংকলন করবার পর থেকে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গেও রামমোহনের বিরোধ জেগে উঠল। তাদের সঙ্গে ধর্ম-সম্পর্কে অনেক তর্ক-বিতর্ক প্রকাশিত হতে লাগল। খ্রীষ্টধর্ম-সম্বন্ধীয় এ সমস্ত শাস্ত্রীয় বিচার অবশ্য শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি গোঁড়া পাদ্রীদের রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিবর্তন করতে পারল না; কিন্তু উইলিঅম এডামের মত একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী রামমোহনের এই যুক্তিবাদী শাস্ত্রবিচারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মতানুবর্তী হলেন। রামমোহনের ধর্ম-উপলব্ধিতে কতটা সার্বভৌমত্ব ছিল এ ঘটনাই তার প্রমাণ।

কিন্তু নবীন ও প্রাচীন দলের মধ্যে বিরোধ যখন পেকে উঠল তখন 'আত্মীয় সভা' বেশীদিন স্থায়ী হল না। খ্রীষ্টীয় ধর্মোপাসনার অনুসরণে উপাসনা করবার জন্য এডামের সহায়তায় রামমোহন তারপর প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি'—১৮২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। খ্রীষ্টান মতে উপাসনা হত বলে এ-সভাও বেশীদিন স্থায়ী হল না। তখন বিশিষ্ট বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে রামমোহন ১৮২৮ সনে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ব্রাহ্মসমাজ' (লোক-প্রচলিত নাম 'ব্রহ্মসভা')। এ-'সমাজ'-প্রতিষ্ঠাই রামমোহনের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরিণতি। ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে এরূপ উদার মতবাদের পরিকল্পনা সে যুগে অভিনব। কারণ রামমোহন-প্রবর্তিত এ ধর্ম-সমাজ শুধুমাত্র কোন বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। "ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা, আদি-অন্ত-রহিত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরের"[২]

অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন—মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে—১৮১৫-১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে :—"বেদান্ত দর্শনের অনুবাদ—১৮১৫; বেদান্তসার; এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ—১৮১৬; কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্পর্কীয় গ্রন্থ (ইংরাজী ও বাঙলাতে)—১৮১৭; সতীদাহ সম্পর্কীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার পুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক, এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ—১৮১৮; সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ—১৮১৯। এইসকল গ্রন্থের উত্তরে তাঁহার বিরোধীগণ তাঁহার প্রতি অভদ্র কটূক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিত চিত্তে ঐ সমুদয় কটূক্তি সহ্য করিতে লাগিলেন।"

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (পৃঃ ৬১)

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায় (পৃঃ ৫৬)

উপাসনার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নিকট এ ধর্ম-সভার দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

রামমোহনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল এজন্যে যে, তাঁর এ সমন্বিত ধর্ম-আদর্শ অনুসন্ধান করবার প্রবণতা পরবর্তীকালে বাঙলাদেশের অনেক সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনের পটভূমিকায় সক্রিয় থেকে আধুনিক বাঙলার সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত নতুন সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী-সভার ধর্ম-আন্দোলন এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য]

ধর্মবোধ যেখানে ব্যাপক ও গভীর, মানব-মাহাত্ম্য উপলব্ধিও সেখানে সহজ ও আবেগময়। এ গভীর ধর্মবোধই মানবপ্রেমিক রামমোহনকে প্রেরণা দিয়েছিল সমসাময়িক কালের নারীজাতির দুঃসহ অপমান ও লাঞ্ছনা দূরীভূত করবার জন্যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর সতীদাহ-প্রথার নির্মম অত্যাচার হতে হিন্দু বিধবাকে রক্ষা করবার জন্যে। এ বর্বর প্রথা নিবারণ করতে গিয়ে তৎকালীন বৃটিশ সরকার যেখানে দোলাচলচিত্ত, খ্রীষ্টান মিশনারীদের সর্বপ্রকার চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে রামমোহনের এ সমাজ-সংস্কার প্রয়াস যে কতটা কঠিন কাজ ছিল সে কথা আজকের সর্ববন্ধন-মুক্তিপ্রয়াসের দিনে অনুমান করা রীতিমত শক্ত। সতীদাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করবার অভিপ্রায়ে এ সময় রামমোহনের শাস্ত্রসমুদ্রমন্থন তাঁর অন্তরের আবেগ-গভীরতারই পরিচায়ক। রামমোহনের অন্তরের এ উদ্বেল ভাবাবেগ তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের চিত্তকে স্পর্শ না করলেও, সে-যুগের ভারত-শাসক উদার-মতবাদী বেণ্টিঙ্কের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—যার ফলে তিনি ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর এ বর্বর প্রথাকে আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এ ছাড়া নারীজাতির সম্পত্তিতে অধিকারের জন্য সে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে রামমোহনের যে আন্দোলন, তার ভেতরেও স্ত্রীজাতির প্রতি রামমোহনের উদার অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধাই সূচিত হয়েছে। বহুযুগের অবহেলায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত নারীজাতির চিত্তে শিক্ষার আলোকপাত করে নারীকে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রয়াস পরবর্তীকালে

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তার প্রথম সূচনা দেখা যায়—নারীকে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রামমোহনের প্রয়াসের ভেতর। উদার মানবতা-বোধের ফলে নারীজীবনের এ মূল্য-উপলব্ধি আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি যুগ-নির্দেশক চিহ্ন।

রামমোহনের শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টাও বাঙলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে দেশীয় সংস্কৃত-শিক্ষার স্থলে আধুনিক ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা প্রচলিত করার জন্যে রামমোহন তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন, বাঙলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা এক উল্লেখযোগ্য দলিল। এ পত্রে নিজ দেশ-বাসীকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় শিক্ষিত করে প্রগতিশীল ইয়োরোপীয় জাতির সমকক্ষ করে তোলবার জন্য রামমোহনের যে ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়, সে-যুগের পক্ষে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এ চেষ্টা ও ব্যাকুলতার পরিণতি ১৮১৭ সনে আধুনিক বাঙলার উন্নততর সংস্কৃতির কেন্দ্র কলিকাতা হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠা। শুধু তৎকালীন সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করেই রামমোহন দেশের মধ্যে আধুনিক ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ধারা প্রবাহিত করে দেবার গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপ্ত করেননি। ১৮২২ সনে তিনি নিজব্যয়ে কলকাতায় একটি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করে তাঁর আদর্শকে কর্মে রূপান্তরিত করবার আংশিক চেষ্টা করেন। বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাকে কলকাতার বুকে প্রবাহিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত না হলে বাঙলাদেশের আধুনিক উদার সংস্কৃতির বিকাশ আরো কত বিলম্বিত হত তা সঠিক বলা যায় না।

আধুনিক সংস্কৃতি-বিকাশের অন্যতম বাহন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও রামমোহনের অক্লান্ত প্রয়াস অনুল্লেখ্য নয়। তাঁর সম্পাদিত 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণসেবধি' (সেপ্টেম্বর, ১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১) ও মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার (১২ এপ্রিল, ১৮২২)—এ

তিনখানি পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা সমসাময়িক বাঙলাদেশের সংস্কৃতি জগতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এ পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথমখানি ছিল ইংরাজী-বাঙলায়, দ্বিতীয়খানি বাঙলায় এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি প্রকাশিত হত ফারসী ভাষায়। বাঙলায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকাখানিতে অনেক চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় তৎকালীন বাংলা সাংবাদিকতা একটি উচ্চ মান লাভ করে।

সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য ১৮২৩ সালে রামমোহন কলকাতায় যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, বাঙলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য গভর্নমেণ্ট থেকে লাইসেন্স নেবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তদানীন্তন সরকার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যে নিয়ম প্রবর্তন করেন তা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী এবং অসম্মানজনক মনে করে রামমোহন সে বৎসর তাঁর সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' নামক সংবাদপত্র-খানির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রবল আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী রামমোহন পত্রিকাখানির প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, সেই আইন রেজিষ্ট্রি হবার পূর্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাবিরোধী বলে ক্ষমতালোভী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠিত হননি। এ আবেদন অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি। রামমোহন তাতে খুব ব্যথিত হন সন্দেহ নেই; কিন্তু এই ব্যর্থতাও তাঁর স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমাতে পারেনি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তখন তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট ভারত-সরকারের এ জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও ভীত হননি।

তীব্র রাষ্ট্রনীতি-চেতনা ও উদার আন্তর্জাতিক মনোভাব সমকালীন বাঙালী সংস্কৃতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, বাঙলাদেশের সে কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগেও গভীর হৃদয়ানুভূতি ও স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী রামমোহন আধুনিক সংস্কৃতির এ উভয়ক্ষেত্রেই নিজের প্রগতিশীল কর্ম ও চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শুধু নিজ দেশের মাত্র নয়, তাঁর সমকালীন সমস্ত পৃথিবীর রাজ-নৈতিক উত্থান-পতন এবং প্রগতিশীল দেশগুলির খবর তিনি রাখতেন। এদেশের

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্তন সম্পর্কীয় আন্দোলনের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বদেশীয় লোকের অধিকার লাভের জন্য তাঁর জুরীপ্রথা-প্রবর্তন-আন্দোলনও স্মরণীয়। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয় সৈন্যগণ কর্তৃক নেপল্‌স্‌বাসীর স্বাধীনতা-হরণ তাঁকে যে কতটা বেদনাভিভূত করেছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে রামমোহন যখনই কোন নিপীড়িত জাতির বন্ধনমুক্তি বা সাম্যবাদের জয়যাত্রার সংবাদ শুনতে পেতেন তখনই যে ভাবাবেগে অধীর হয়ে উঠতেন—রামমোহনের জীবনীতে তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[১] রামমোহনের জীবনীতে আরো দেখা যায়, ইংরাজাধীন সমস্ত ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক চেতনার নামগন্ধও নেই, রামমোহন তখন বিলাতে গিয়ে "ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানারকম রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান" করেছেন এবং "যাহাতে ইংরাজ-শাসনে এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে"[২] সে চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন। রামমোহনের ইংলণ্ড হতে ফ্রান্স ভ্রমণে (১৮৩২ খ্রীঃ) যাবার ঔৎসুক্যের মূলেও ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্স দেখে অন্তরে তৃপ্তি লাভ করা। এ ছাড়া রামমোহনের জীবনী পাঠে আরো জানা যায়, ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারা জন্মলাভও করেনি, রামমোহন তখন বিশ্বের বিভিন্ন বিবাদমান জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য

১ এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের জীবনীতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) স্পেনের স্বেচ্ছাচার হতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশসমূহের মুক্তিসংবাদে রামমোহনের ভাবোচ্ছ্বাস ;

(২) ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে উদারনৈতিক দলের জয়-সংবাদে রামমোহনের আনন্দ ;

(৩) ১৮৩০ সনে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিবর্তন সংবাদ শুনে তাঁর আনন্দ ও কেপটাউনে ফরাসী জাহাজের উপর স্বাধীনতার পতাকা দেখে ভাবোচ্ছ্বাস ;

(৪) ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্তিত হওয়ায় তাঁর উল্লাস ;

(৫) ইংলণ্ডে 'রিফর্মস্ বিল' পাস হওয়া সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১)

'জাতি-সংঘ'-গঠনের স্বপ্নে বিভোর' রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে রামমোহনের এরূপ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে যে শুধু বিদেশে প্রভূত সম্মানের অধিকারী করেছিল তা নয়, তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিকেও সংকীর্ণ জীবন-পরিবেশের বাইরে যে ভাববিক্ষুব্ধ একটা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক জীবন আছে সেদিকে আকৃষ্ট করে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হতে সহায়তা করেছিল। বাঙালী-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় রামমোহনের এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সংস্কৃতির অন্যতম বাহন ভাষা ও সাহিত্য। আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতির প্রথম যুগে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের জন্য যখন যথোপযুক্ত ভাষা সৃষ্টি হয়নি, রামমোহন তখন ভাবপ্রকাশক্ষম ভাষা সৃষ্টি করে তৎকালীন বাংলা গদ্য তথা বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে সহায়তা করেন। রামমোহন বাংলা গদ্যের স্রষ্টা কি না সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে ইতিপূর্বে ফোর্ট উইলিঅম কলেজের পণ্ডিতদের রচিত আড়ষ্ট গদ্যরীতিতে সর্বপ্রথম শক্তি ও গতিবেগের সঞ্চার করেন রামমোহন। শুধু গদ্যরীতিতে নয়, তৎকালীন অগভীর বাঙলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে রামমোহন আনলেন গভীরতা ; অনুবাদ ও অনুস্মৃতিমূলক গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে এল বেদান্ত ও উপনিষদের আলোচনা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিতর্কমূলক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে [যেমন—উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (ইং ১৮১৬-১৭) ; ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (ইং মে ১৮১৭) ; গোস্বামীর সহিত বিচার (ইং জুন. ১৮১৮) কিংবা বিচারমূলক প্রস্তাবগুলিতে

১ এ প্রসঙ্গে তৎকালীন Foreign Minister of France (Paris)-কে লিখিত রামমোহনের পত্রাংশ দ্রষ্টব্য :

"...it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each ; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the chairman to be chosen by each nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other ; such as at Dover and Calais for England and France."
—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬৬-৬৭)

(যেমন— সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (ইংরাজী নবেম্বর, ১৮১৮) ; ঐ—দ্বিতীয় সম্বাদ (ইং নবেম্বর, ১৮১৯) ; কবিতাকারের সহিত বিচার (ইং ১৮২০) ; সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (ইং ১৮২০) ; কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (ইং ১৮২৬)] বাংলা গদ্যরীতি পেল গতি, অর্জন করল নতুন প্রাণশক্তি।

এ সম্পর্কে সুলেখক বিনয় ঘোষ বলেছেন :

"রামমোহন রায় তাঁর ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা এই 'theological criticism' বা আধ্যাত্মিক সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক বা ধর্মবিষয়ক এই স্বাধীন আলোচনা থেকেই এ যুগের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার ও জীবনদর্শনের বিকাশ হয়েছিল।...বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রতিপালন করেছেন সদ্যোজাত বাংলা গদ্য-ভাষাকে, কারণ গদ্য-ভাষা মূলতঃ— 'a language of discourse'—যুক্তিতর্কই তার প্রাণ।...বাংলা গদ্য-ভাষায় প্রথম বেগ, বলিষ্ঠতা ও যুক্তিবদ্ধতা দান করলেন রামমোহন।"

—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (পৃঃ ৫৪-৫৫)

রামমোহনের গদ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাসৌষ্ঠব ছিল না এ-কথা সত্য, কিন্তু বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতের ভারমুক্ত করে সর্বজনবোধগম্য ভাষারীতিতে পরিণত করতে রামমোহনের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বিভিন্ন-বিষয়ক আলোচনায় বিভিন্ন রীতি-প্রয়োগ রামমোহন-রচিত নতুন গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া বাংলা গদ্য-রচনা যাতে ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়, সে উদ্দেশ্যে রামমোহন রচনা করেছিলেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। সামান্য একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা—আজকালকার দিনে অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা মনে হবে ; কিন্তু যে-যুগে বাংলা গদ্যের কোনো আদর্শ ছিল না, ভাষা প্রকাশের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না, সে-যুগের লেখকদের কাছে রামমোহন-রচিত বাংলা ব্যাকরণের মূল্য কতখানি অনুভূত হয়েছিল, তা সাহিত্যের এ সমৃদ্ধির যুগে অনুমান করা দুঃসাধ্য। এ ব্যাকরণ-রচনার মধ্যে আমরা বিশুদ্ধ ভাষাসৃষ্টি-প্রয়াসী সাহিত্যব্রতী রামমোহনের পরিচয় পাই।

বিশুদ্ধ সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্যে রামমোহন লেখনী ধারণ করেননি ; কিন্তু ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজের অগোচরে এ ক্ষণজন্মা পুরুষ

বাংলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদের সৃষ্টি করলেন—সাহিত্যের মূল্য-অনুসন্ধানী পাঠক আজ তা ভাল করে অনুভব করতে পারেন। বস্তুতঃ, রামমোহনের মনীষা ও চিন্তার স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে গভীরতা, মননশীলতা, বলিষ্ঠতা ও বেগের সঞ্চার না হলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতি আরো যে বহুকাল বিলম্বিত হত, তা বলাই বাহুল্য।

উক্ত আলোচনা হতে এ-কথা স্পষ্ট হবে—আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যজগতে রামমোহন রায় একটি জীবন্ত শক্তি। বাঙলাদেশের সেই কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব, চিন্তা ও কর্মের যুগে তিনি যে জ্ঞানের আলো জ্বাললেন, সেই আলোই পথ দেখাল তাঁর পরবর্তী মনীষীদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-কর্মে নতুন পথরেখার অনুসন্ধান করতে। সে পথ বিসর্পিত সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সংস্কারমুক্তি-আন্দোলনের তিনি প্রধান পুরোহিত, সে-আন্দোলন তাঁর অনুবর্তীদের দৃষ্টিতে এনে দিল স্বচ্ছতা এবং চিত্তে এনে দিল বল। সে চিত্ত-শক্তির বলে তাঁদের চরিত্রে এল দৃঢ়তা, কর্মৈষণায় জাগল প্রবল উন্মাদনা। ফলে সে বিসর্পিত পথ অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সহজ হলঃ বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বিত আদর্শে একটা নতুন রূপ পেল।

২

সংশয় ॥ দ্বিধা ॥ ভাবক্রান্তি ॥ ঈশ্বরগুপ্ত ॥

ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্পজীবী ছিলেন। মাত্র ৪৭ বৎসর তাঁর জীবৎকাল। জীবনের এ অপেক্ষাকৃত স্বল্প অবকাশের মধ্যেই কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা তুমুল আলোড়নের স্বষ্টি করে গেছেন। সমসাময়িক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয়কুমার দত্তের প্রগতিশীল সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ কোন যোগ নেই, অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাব্যপ্রতিভা-বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সে যুগের মনীষী ও প্রবীণ সাহিত্যিক উচ্ছ্বসিত। আবার প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে এ যুগের বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানতৎপর ব্যক্তির চোখে ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যকৃতি অতি-মূল্যায়িত।[১] এ অবস্থায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত স্থান কোথায় তা নির্ণীত হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে: ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কি? বাংলা দেশের নবজাগ্রত সংস্কৃতি-আন্দোলনে ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত ভূমিকা কি? উনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যকৃতির মূল্য কতখানি?

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বে যে একটা তীক্ষ্ণ ধার ছিল সে সম্পর্কে তাঁর সকল সমালোচকই একমত। সে যুগ ছিল প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারের যুগ। সমাজ সংস্কারের সংঘাত-মুখর পথে সেকালে ব্যক্তিপ্রচেষ্টা যখনই বাধাপ্রাপ্ত হত তখনই ব্যক্তিত্ব জেগে উঠত জীবনের সমস্ত বলিষ্ঠতা নিয়ে—এ সত্য দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে। ঈশ্বর গুপ্তেরও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ

১ J. C. Ghosh, Bengali Literature p. 134 ॥ ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সমসাময়িক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সমাজসংস্কারক ছিলেন না; কিন্তু সমকালীন জীবনচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ সমাজের একজন তীব্র এবং তীক্ষ্ণ সমালোচক ছিলেন। সে যুগের সমাজজীবনে যা কিছু তাঁর কাছে অসঙ্গত ঠেকত তাকেই তিনি ছোবল মারতেন। ঈশ্বরচন্দ্র 'মেকির বড় শত্রু। সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ করিতেছেন—গভর্ণর জেনারেল হইতে কলিকাতার মুটে মজুর পর্যন্ত কাহারও মাফ নাই।'[১] ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যপ্রতিভার অনুরাগী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন—মেকির ওপর রাগ কবির বাল্য সংস্কার হতে প্রাপ্ত (এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম-বর্ণিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম বিমাতাসম্ভাষণ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর গুপ্ত মেকি বলে যাকে আঘাত করছেন, সে যুগের পরি-প্রেক্ষিতে বাস্তবিক পক্ষে তা মেকি কি না সেকথা অবশ্য বিচারের বিষয়; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্ব বিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিষয় এই যে, সে যুগের প্রবহমান জীবনধারাকে আঘাত করবার মত দুঃসাহস ঈশ্বর গুপ্তের ছিল, এবং ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন এ দুঃসাহসও তাঁর বাল্যসংস্কার হতে প্রাপ্ত।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বে যেমন একটা ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা ছিল, তেমনি একটা কোমল মাধুর্যও ছিল—এ সত্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর ব্যক্তিত্বের এ আকর্ষণীয় গুণের জন্যেই পল্লীগ্রাম হতে কলকাতা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন কলকাতার একটা অভিজাত পরিবারের সঙ্গে, এবং তাঁদের অর্থানুকূল্যে সে যুগের একখানা শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন—ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এ ঘটনাটি খুব উল্লেখযোগ্য।[২] এ ছাড়া গুপ্তকবির ব্যক্তিত্বে ছিল প্রবীণ ও নবীন লেখকদের আকর্ষণ করবার মত এক চৌম্বক শক্তি যার সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সে যুগের কলকাতার বণিকধর্মী অপরিচ্ছন্ন সভ্যতার মধ্যে

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব।

২ পাথুরিয়াঘাটার জমিদার বিদ্যোৎসাহী যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে প্রথম 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। পরে ঠাকুরবংশের আরো অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের এ সাংবাদিক প্রচেষ্টাকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

একটি চাঞ্চল্যকর সাহিত্যিক পরিবেশের। গুপ্তকবির এ গোষ্ঠী-চেতনার প্রভাবেই পূর্বযুগের পল্লীপ্রবাহিণী বাংলা সাহিত্য ক্রমে ক্রমে এসে মিলিত হল নগরকেন্দ্রিক বিচিত্র সাহিত্যসঙ্গমে।

১২৫৩ সালের (১লা বৈশাখ) সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্র সে পত্রিকার যে সমস্ত লেখকের নাম-তালিকা প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, তাঁরা ছিলেন সে কালের 'ধনবান ব্যক্তি ও কৃতবিদ্য লেখক' (বঙ্কিমচন্দ্র)। সংবাদ-প্রভাকর যখন সাপ্তাহিক হতে দৈনিকে রূপান্তরিত হয় তখন পুরাতন লেখকেরা ত ছিলেনই, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তকবির উৎসাহ ও আনুকূল্য পেয়ে এসে জুটলেন সে যুগের কবিযশঃ-প্রার্থী অনেক নবীন লেখকও। গুপ্তকবি তখন সাহিত্যজগতে Uncrowned King of Bengal. সে অবস্থায় এ সমস্ত তরুণ কবিযশঃ-প্রার্থীদের অপরিণত রচনা-প্রয়াসকে প্রশ্রয় না দিলেও তাঁর প্রতিষ্ঠার কোন হানি হত না। কিন্তু সাহিত্যপ্রাণ ঈশ্বর গুপ্ত যখন কোন তরুণ কবির রচনায় কিছুমাত্র প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দেখতে পেতেন তখনই তাঁকে উৎসাহিত করে তুলতেন।নত্য নতুন রচনা-কার্যে। গুপ্তকবির মধ্যে এমন একটা দূরদৃষ্টি ছিল যার সাহায্যে তিনি বুঝতে পারতেন কোন্ লেখক কোন্ বিশিষ্ট রচনা দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী যশ অর্জন করতে পারবেন ; এ দৃষ্টি-প্রভাবেই তিনি কবিযশঃলিপ্সু তরুণ বঙ্কিমকে উপদেশ দিয়েছিলেন পদ্য ছেড়ে গদ্যে রচনা করতে—যার ফল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। তাঁর উৎসাহ-আনুকূল্যে সাহসী হয়েই প্রথম ব্রতীর সংশয়কে অতিক্রম করে এ সমস্ত নতুন কবি শুরু করেন বাংলার সারস্বত কুঞ্জে সর্বপ্রথম কলতান। ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য যাই হোক, তিনি যে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিককে অনুপ্রেরণা দিয়ে নতুন সাহিত্য রচনার গতিপথ সুগম করে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যশিষ্যদের অন্তরে গুপ্তকবি কতটা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার পরিচয় পাই যখন দেখি উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র অনবকাশের মধ্যেও তাঁর সাহিত্যগুরুর কবিতা ও জীবনী-সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছেন এবং কবিত্ব-নির্ণয়ে প্রয়াস পেয়েছেন। গুপ্তকবির কবিত্বের মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্র

কোথাও কোথাও আতিশয্যের পরিচয় দিলেও তাঁর সে প্রয়াসের সর্বত্রই গুরুঋণ পরিশোধ করবার একটা আন্তরিক চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন,—রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বসু প্রভৃতি গুপ্তকবির অন্যান্য সাহিত্যিক শিষ্যও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ছিলেন সারাজীবন সশ্রদ্ধ। আসলে গুপ্তকবির ব্যক্তিত্বে ছিল একটা দ্বৈত রূপ: এক রূপে সাংবাদিক ও সমালোচক ঈশ্বর গুপ্ত তীক্ষ্ণ স্যাটায়ারের মাধ্যমে বাংলা দেশের ক্রান্তিযুগের সকলপ্রকার অভিনব উদ্যমকে ব্যঙ্গ করছেন; আর এক রূপে সহৃদয় সাহিত্যকর্মী ঈশ্বরচন্দ্র উদার সহমর্মিতার সাহায্যে সমসাময়িক তরুণ লেখকদের সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও তত্ত্ববোধিনী সভার সমবেত প্রয়াসে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বাংলা দেশে যেমন একটা প্রজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি গুপ্তকবির সংবাদ-প্রভাকরকে কেন্দ্র করে গত শতকের তৃতীয় দশকে একটা নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছিল,—ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্ব বিচার প্রসঙ্গে একথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

একটা প্রবল নেতিবোধ (sense of negation) ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমসাময়িক কালে বাংলা দেশের সমাজ-জীবন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাতে সংক্ষুব্ধ। দিকে দিকে জেগে উঠছে নিত্য-নতুন চিন্তা, আর সে চিন্তা রূপলাভ করছে নতুন কর্মৈষণার মধ্যে। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধের (humanism) আদর্শ এসে বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারকে দিচ্ছে খানখান করে ভেঙে, আর সে জায়গায় জেগে উঠছে একটা নতুন সমাজগঠনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করবার চেষ্টা পাচ্ছে দেশের ভেতর ব্যাপক স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চায়, আর ঘুনধরা বাঙালী সমাজের বিচারহীন চিরাচরিত প্রথা ভাঙবার উন্মাদনায়। এক কথায় বাংলা দেশে তখন একটা বিরাট নবজাগরণের সাড়া জেগেছে। ঈশ্বর গুপ্ত সে নবজাগরণের যুগেরই মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দৈবী প্রতিভার অধিকারী হলেও এ নব-জাগরণের স্পন্দন গুপ্তকবির চিত্তকে উদ্বোধিত করে তুলতে পারেনি। দূর হতে তিনি এ বাঁধ-ভাঙা জীবন-উন্মাদনাকে লক্ষ্য করছেন, আর মাঝে মাঝে

ব্যঙ্গের তীর ছুঁড়ে মারছেন সমসাময়িক জীবন-সাধকদের প্রতি। জীবনের কোন প্রকার পরিবর্তনকেই তিনি যেন বিশ্বাসের চোখে দেখতে পারছেন না। সব কিছুতেই কবির নাস্তিক্যবুদ্ধি! সার্থক কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণের জন্যে যে সহজ আস্তিক্য-বুদ্ধির প্রয়োজন, তাও যেন হারিয়ে ফেলেছেন ব্যঙ্গপরায়ণ কবি।

এ প্রবল নেতিবোধের কারণও হয়ত তাঁর জীবন-সংস্কারের মধ্যে ছিল। বাল্যে মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত, যৌবনে পত্নীপ্রেম-বঞ্চিত,—এক কথায় গার্হস্থ্যপ্রীতি বর্জিত অস্থির জীবনে গ্রহণ হতে বর্জনের ভাবই যে প্রাধান্য বিস্তার করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এ নেতিবোধের ফলেই ঈশ্বর গুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সময় রক্ষণশীল। কোন কোন সময় প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনে। জনৈক সাহিত্যের ইতিহাসকার সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন—"His influence was conservative, and in many ways retrograde."—(দ্রষ্টব্য, Bengali Literature—J. C. Ghosh, p. 135)

এ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির প্রতিফলন হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অজস্র কাব্য কবিতায়। "প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য" লিখেও [দ্রষ্টব্য—ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসুমতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৪] ঈশ্বর গুপ্ত আজ কাব্যামোদী পাঠকসমাজে অনাদৃত। উদার শিক্ষা ও মার্জিত রুচির অভাবে তিনি ঠিক যুগচেতনার পরিচয় দিতে পারেন নি, বরং যুগসচেতন সকল মহৎ উদ্যমকে [যেমন,—স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি] তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। সর্বত্র রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাল্‌কা মেজাজ—বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন "খেউড়, ইয়ারকি"। ঈশ্বরকে নিয়ে ইয়ারকি করতেও তিনি ছাড়েন নি। তবে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গের একমাত্র শুভ দিক হল এই, সে ব্যঙ্গ পরবর্তীকালের হুতোমের মত বিদ্বেষপ্রসূত নয়। সে ব্যঙ্গ রঙ্গভরা, যেমন রঙ্গভরা দেখেছিলেন তিনি 'ভঙ্গ বঙ্গদেশকে'।

নিপুণ শব্দকুশলী হলেও ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতা আধুনিক পাঠকের নিকট অপাঠ্য। গুপ্তকবির অমার্জিত রুচির স্পর্শে তাঁর অনেক কবিতা অশ্লীল। গুপ্তকবির সাহিত্যশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র যুগপ্রভাবের কথা তুলে তাঁর এ অশ্লীলতা ক্ষমার যোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠক ক্ষমাশীল হলেও কাব্যামোদী পাঠকসমাজ গুপ্তকবির এ রুচিহীনতাকে ক্ষমা করতে পারবেন কি? যে কবিতা কাব্যামোদী পাঠকের মনে উন্নত রসবোধের সৃষ্টি করতে পারে না—কাব্য হিসাবে তার মূল্য কতটুকু? "তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল" (দ্রঃ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ—১৯) ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতার কারণ নির্ণয়ে এ নজীর হয়তো উল্লেখযোগ্য, কিন্তু উৎকর্ষ-বিচারে নয়। কিংবা, "কেবল পাঠককে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। (দ্রঃ—ঐ, পৃঃ ১৭-১৮)। মার্জিত ও সংযতরুচি বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীল ভাষা সমর্থনে এ উক্তি করেন তখন তা তাঁর সাহিত্যগুরুর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বলেই মনে হয়। অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজের রচনায় পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করবার জন্যে কখনও অশ্লীল বা রুচিহীন ভাষা ব্যবহার করেন নি।

আসলে বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র খেউড় ও হাফ্-আখড়াইয়ের যে অশুচি পরিবেশের মধ্যে বাস করেছিলেন এবং নিজেও অমার্জিতরুচি ওই সমস্ত কবিগান রচনা করেছিলেন, সে অপরিচ্ছন্ন গ্রাম্য রুচিই সংক্রামিত হয়েছিল তাঁর অসংখ্য কবিতার মধ্যে। গুপ্তকবির কাব্যপ্রতিভা ও কবিত্ব বিচারে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি কঠোর মনে হলেও অনেকাংশে সত্য বলেই বিবেচিত হবে:

"A journalist by profession, he was a journalist in verse. He often imitated Bharatchandra but was too little an artist to do it well. While Bharatchandra was a classicist to his finger-tips, Iswar Gupta derived his characteristic manner from folk poetry. From that source came the pawky wit and the racy language of the social squibs with which Iswar

Gupta achieved a popularity far surpassing that of any other Bengali poet of his life-time. From folk-poetry, again, came his drollery and doggerel, his clowning and scurrility. One is less surprised at his coarseness when one remembers that in his younger days he used to take part in the Kheur and Half-Akhrai." [১]

গুপ্তকবির এক শ্রেণীর কবিতার রুচিহীনতা আধুনিক কাব্যপাঠকের রসবোধকে পীড়িত করলেও আর এক শ্রেণীর কবিতায় এমন বিষয়বৈচিত্র্য দেখা যায়, যার মধ্যে আমরা আধুনিকতার দূরাগত ধ্বনি শুনতে পাই। এ সমস্ত কবিতায় গুপ্তকবির সমাজ ও স্বদেশচেতনা স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। পূর্বযুগের কবির ঊর্ধ্বচারী দৃষ্টি ঈশ্বর গুপ্তে এসে হয়েছে ধরার ধূলিতে বিচরণশীল —পূর্ণায়ত না হোক, বহুবিস্তৃত মানবিক কৌতূহলে চঞ্চল। শুধু তাই নয়, বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম নাগরিক বাগ্‌ভঙ্গীতে দীপ্তি লাভ করেছে গুপ্তকবির এক শ্রেণীর কবিতা। আর এও উল্লেখ্য যে, তাঁর আর এক শ্রেণীর কবিতায় দেশাত্মবোধের যে চেতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত, বাংলা সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন বস্তু। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হয়ে সে যুগের যে সমস্ত নকলনবীশ দেশীয় সংস্কৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, গুপ্তকবি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে তাদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন স্বদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চায়। এদিক দিয়েও বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের দান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেমে হয়ত মননশীল দেশাত্মবোধের গভীরতা ছিল না, (থাকলে গুপ্তকবি স্বদেশবাসীকে 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' স্বদেশের কুকুরকে ভালবাসতে পরামর্শ দিতেন না), কিন্তু তাঁর অন্তরের নবজাগ্রত হৃদয়াবেগের মধ্যে যে একটা প্রবল উন্মাদনা ছিল এ কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এ উদ্দীপ্ত ও সাগ্নিক হৃদয়ানুভূতিই তাঁর সাহিত্যশিষ্য ও অব্যবহিত পরবর্তী কবি রঙ্গলালকে প্রেরণা

১ J. C. Ghosh. Bengali Literature p. 134

দিয়েছিল অফুরন্ত প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ দেশাত্মবোধক কাব্যরচনায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও স্মরণীয়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বই আধুনিকতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। ভাবপ্রকাশের নতুন ভঙ্গী বা টেকনিকই সৃষ্টি করেছে সাহিত্যে আধুনিক যুগের। সে হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত বলা চলে না—যেমন বলা চলে মাইকেলকে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত একদিকে বাংলা দেশের প্রাচীন কাব্যকলার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে সকরুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন; আর একদিকে নতুন যুগের নতুন ভাবধারাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাংলা কাব্যের নতুন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলেই ঈশ্বর গুপ্তের সুনির্দিষ্ট স্থান।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যধর্ম-বিচারে সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র আর একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: সে হল তাঁর বাস্তবধর্মিতা। পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আংশিকভাবে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের কাব্যেও স্থান লাভ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বাস্তববোধ আরো প্রখর, আরো সর্বতোমুখী। জীবন-পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সদা-জাগ্রত। এ পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকে সে যুগে যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কাব্যসৃষ্টির বহু স্থলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেও সে যুগের পক্ষে সর্বাধিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী ও কাব্য-সংগ্রহে। যে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পাশ্চাত্ত্য কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিভা-মুগ্ধ, সে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের যুগেও গুপ্তকবি বিপুল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সুদীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিক কাল মহাকবি ভারতচন্দ্রের জীবনী এবং কবিওয়ালাদের জীবনী ও বিস্মৃতপ্রায় কবিতাবলী সংগ্রহকার্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের যে অন্ধকার দিকটির অনেক অংশ আজ বাংলা সাহিত্যামোদীদের নিকট অনাবৃত, সে প্রাথমিক পরিচয়-সাধনের কৃতিত্ব স্বদেশপ্রেমিক কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রাপ্য। সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যের বিপুল চর্চা ও গবেষণার যুগেও গুপ্তকবির

এ সাহিত্যপ্রীতির দৃষ্টান্ত খুবই দুর্লভ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি এ স্বাভাবিক মমত্ববোধ ও ঐতিহ্যচেতনাই যে গুপ্তকবির সাহিত্যশিষ্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিপ্রধান বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাব্যরচনার স্থানে স্থানে যত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিন না কেন, এ একটিমাত্র গঠনমূলক কাজের জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সম্প্রতি অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত পুরনো সংবাদ-প্রভাকরের জীর্ণ পৃষ্ঠা হতে গুপ্তকবির আবিষ্কৃত প্রাচীন কবি-জীবন ও কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করে সংস্কৃতিপ্রেমিক বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

॥ অনুচিন্তা ॥

ঈশ্বর গুপ্ত কি প্রগতিশীল ছিলেন?

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সম্প্রতি গবেষক মহলে নতুন কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে, এ খুবই আশার কথা।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা বিশ্লেষণ করে কোন কোন চিন্তাশীল গবেষক মত প্রকাশ করেছেন, গুপ্তকবি রক্ষণশীল হলেও প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। এই মতের সমর্থনে তাঁরা বলেন, পদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল, আর গদ্য রচনায় তিনি প্রগতিশীল। একজন গবেষকের মতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিমানসে একটি ক্রমবিকাশের স্তর লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে, তারপর তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে তিনি পুরনো মনোভাবকে অতিক্রম করে "নতুন যুগের নতুন ভাবধারাকে কিছু কিছু গ্রহণ করেন।" [১] আর একজন গবেষক মনে করেন, সমকালীন স্ত্রী-শিক্ষা বা বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেও সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায়

১ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী সংগ্রহ, পৃঃ, ৪৭

খ্রীষ্টধর্মান্তরিতদের শুদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ও স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থনে যে সমস্ত উক্তি করেছেন তাতে তাঁকে প্রগতিবিরোধী কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না। এ ছাড়া গুপ্তকবি সে যুগের প্রগতিশীল সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় "কতকগুলি বিষয়ে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন।"[১] ঈশ্বর গুপ্তের উপর সে যুগের নবজাগরণের আরও কোন কোন প্রভাবের উদাহরণ তিনি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছেন। আবার পদ্যে সিপাহীযুদ্ধের বিদ্রোহীদের আক্রমণ এবং বৃটিশ সরকারের জয়গান গাইবার পর 'সংবাদ-প্রভাকরে' শিখজাতির প্রশংসা করাতে শেষোক্ত লেখক গুপ্তকবির অন্তরে "বহ্নি দীপ্তি সঞ্চারে"র সংকেত লক্ষ্য করেছেন।

গত শতাব্দীর সংস্কৃতি-বিকাশে সে যুগের বিশিষ্ট সমাজসেবীদের ব্যক্তিত্ব-নির্ধারণ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে যাতে অতি-মূল্যায়ন না ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলেই আমাদের মনে হয়। গদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের কোন কোন প্রগতিশীল মত দেখে উক্ত দুজন গবেষকই তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কোন বিষয়ে বিশ্বাস গভীর হলে মানুষের জীবনে প্রত্যয় আসা স্বাভাবিক, এবং মনে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হলে মত প্রকাশে কোন দ্বিধা থাকে না। সমসাময়িক বিভিন্ন সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের বিভিন্ন মনোভাবের (কোন কোন সময় পরস্পরবিরোধী মনোভাব—যেমন স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে) প্রকাশ দেখে মনে হয় সে যুগের প্রগতিশীল সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক যেন মনস্থির করতে পারেন নি। তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন ও সমসাময়িক বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে উক্ত দুই মনীষীর যে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে দ্বিধার কোন অবকাশ ছিল না। সতীদাহ প্রথা নির্মম কিংবা বালবিধবাকে জীবনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পথ থেকে বিচ্যুত করা মানবতা-বিরোধী—এ প্রত্যয়ের প্রভাবে হিন্দুসমাজের এই দুই সংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থ ভাষা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিরামহীন সংগ্রাম

১ ডাঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২১০

পরিচালনা করেছিলেন এই দুই চিন্তাশীল মনীষী। সমাজ-প্রগতি সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের চিন্তা এরূপ কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর মনে বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে নি। করলে একই সঙ্গে তিনি গদ্যে-পদ্যে প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিতে পারতেন না। এই পরস্পর-বিরোধী স্বদেশ ও সমাজচিন্তা দেখে একজন গবেষক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: "ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেন কোথায় একটা স্বতঃবিরোধিতা ছিল।"[১] গুপ্তকবির মানসধর্ম ও ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে এ ধারণাটি অভ্রান্ত, এবং তাঁর স্বতঃ-বিরোধিতা প্রত্যয়ের অভাবজনিত—এই হল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয়।

ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যে-পদ্যে প্রকাশিত সমাজ-চিন্তাকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করবার ফলেই বোধ হয় উক্ত দুজন লেখক তাঁর ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্পর্কে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। আর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ববিচারে স্বতঃ-বিরোধিতাই যদি ঈশ্বর গুপ্তের মানসধর্মের পরিচয় বলে বিবেচিত হয়, তা হলে গুপ্তকবির মতান্তরে উত্তরণের ধারণাটিও গ্রহণযোগ্য কি না তা চিন্তাসাপেক্ষ।

আসলে একটি কৌতূহলী মনের সঙ্গে স্বভাবকবির আবেগ মিশ্রিত হয়ে গুপ্তকবির জীবন হয়ে উঠেছিল সক্রিয়। গদ্যে সমসাময়িক সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মতামতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নতুনের প্রতি তাঁর অদম্য কৌতূহল—যে কৌতূহল অবশ্য কখনও মননের রাজ্যে উত্তীর্ণ হয় নি। আবার দেশের যা কিছু পুরাতন ও সনাতন তার প্রতি প্রবল ভাবাবেগপূর্ণ অনুরাগের ফলে পদ্যে কখনও তিনি রক্ষণশীল, আবার কখনও প্রতিক্রিয়াশীল (যেমন, ব্যঙ্গের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে আঘাত করবার চেষ্টা, কিংবা হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার)।

শুধুমাত্র গদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব-পরিবর্তন দেখে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন: "ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে রক্ষণশীলদের পক্ষে থাকলেও পরে পক্ষ পরিবর্তন করেছিলেন। পঞ্চম দশকে আন্দোলন কতকগুলি স্থির

১ ডাঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য

মূল্যবোধে রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের এই মতান্তরে উত্তরণ প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের প্রতীক।"[১]

সমসাময়িক পদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাবকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র গদ্য রচনার ওপর নির্ভরশীল এরূপ মত কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিশ্চয়ই বিবেচনাসাপেক্ষ। পঞ্চম দশকের "স্থির মূল্যবোধ" সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত যদি বাস্তবিকপক্ষে দ্বিধামুক্ত হতেন, তা হলে গদ্যে প্রকাশিত প্রগতিশীল মতকে "প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের প্রতীক" বলে গ্রহণ করতে কোন বাধা থাকত না। কিন্তু এই "মতান্তরে উত্তরণে"র নিঃসংশয় প্রমাণমূলক তথ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলেই—আমাদের ধারণা। বরং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কবির দলে গান বেঁধে এবং কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে গুপ্তকবি যে পূর্বযুগের সংস্কৃতির প্রতি সমান অনুরাগ দেখিয়েছিলেন এমন দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনীতেই দেখা যায়। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হচ্ছেন—এরূপ মনে করা অহেতুক নয়। নতুনকে গ্রহণ করবার জন্যে তাঁর কৌতূহল বেড়েছে, কিন্তু প্রাচীনের মোহও তিনি একেবারে ত্যাগ করতে পারছে না—এই হল তাঁর সেই সময়কার মানসিকতার প্রকৃত পরিচয়।

আমাদের মনে হয়, নতুনের প্রতি একটা সংশয়ী মনোভাবই ঈশ্বর গুপ্তের মানসিকতার প্রথম স্তর, তারপর নবীন ভাবের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক কবির সযত্নলালিত ঐতিহ্যপ্রীতির দ্বন্দ্বে তাঁর মনে সৃষ্টি হয়েছিল একটা দ্বিধার ভাব। এ দ্বিধা হতে মুক্ত হয়ে অনন্যচিত্তে নবীন যুগের নতুন ভাবধারাকে গ্রহণ করবার অভ্রান্ত কোন সংকেত তাঁর রচনায় নেই। সে ভাব ও কর্মান্দোলনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে বাস করেও গুপ্তকবি যে নবীন যুগের নতুন আদর্শকে সবলে আঁকড়ে ধরতে পারেন নি, তার প্রধান কারণ তাঁর যুগোপযোগী উদার শিক্ষার অভাব। শুধু গুপ্তকবি কেন, নবযুগের জীবনাদর্শের প্রতি একটা সংশয়ান্বিত মনোভাব সে যুগের আরও কোন কোন লেখকের চিত্তকে করেছিল দ্বিধাগ্রস্ত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তের "মতান্তরে উত্তরণে"র ধারণা যেমন প্রশ্নাতীত নয়, তেমনি সে "উত্তরণকে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের

১ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবিজীবনী-সংগ্রহ, পৃঃ ৪৯

প্রতীক” বলেও বোধ হয় স্বীকার করা চলে না। বরং গদ্য রচনায় প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্তের উদার মতামত সেই ভাঙাগড়ার যুগে তৎকালীন বাঙালীর সুস্পষ্ট মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতীক বলে গ্রহণ করাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অমর্যাদা প্রকাশ পায় না, অপর পক্ষে সত্যের মর্যাদাও রক্ষিত হয়।

৩

লোকহিত ॥ বীর্য ও প্রেম ॥ ভাষাশিল্প ॥ বিদ্যাসাগর

আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দীর্ঘ-বিসর্পিত পথরেখা। আদি আছে, অন্ত নেই।

কুহেলিকার অস্পষ্টতায় ঢাকা সে ছায়াচ্ছন্ন পথে সবেগে যাত্রা করেছিলেন এক সবল মানুষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। প্রতিভাদীপ্ত তাঁর ললাট, হাতে উজ্জ্বল দীপশিখা। সে যাত্রীর নাম রামমোহন রায়। সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমের দিকে যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী হলেন আরো অনেক তীর্থপথিক। কলরবে মুখরিত হল পায়ে চলার পথখানি। হঠাৎ একদিন থেমে গেল ক্লান্ত পথিকের অগ্রগতি!

কিন্তু দীপ নিভল না; দীপশিখাও রইল অম্লান। সে দীপ হাতে রাম-মোহনের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমের দিকে যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী হলেন আরো অনেক তীর্থপথিক। পূর্ব দিকে প্রসারিত সে পথের রেখা।

সে পথের ওপর ছড়িয়ে পড়ল পাশ্চাত্ত্য আকাশের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেবেন্দ্রনাথেরই অন্যতম সঙ্গী অক্ষয়কুমারের সাধনায়। তীর্থপথের রেখা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। দৃষ্টির আচ্ছন্নতা গেল আরো কেটে।

সে দৃষ্টির আলোকে তীর্থপথিকেরা দেখতে পেলেন সংস্কৃতির গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম যেন অতি নিকটে। কিন্তু সংস্কৃতি-সঙ্গমের কলধ্বনিময় প্রবাহ-ই তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছিল। আসলে পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের মিশ্রিত আলোকে দীপ্তোজ্জ্বল সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গম এখনও অনেক দূরে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দূর দিগন্তে অবস্থিত সংস্কৃতির সে সাগর-সঙ্গমের স্বপ্নে বিভোর দেবেন্দ্রনাথেরই সহযাত্রী আর একজন তীর্থপথিক।

বিসর্পিত পথের একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি যাত্রীদের এ মিছিল দেখছেন। কখনও তাঁদের সঙ্গে খানিকটা এগোচ্ছেন, কখনো বা থম্‌কে দাঁড়াচ্ছেন। উন্নত ললাটে তাঁর সুগভীর চিন্তার রেখা।

অনুভব করছেন এ পথিক মনে মনে, দূর-দিগন্তে অবস্থিত সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমে পৌছাতে হলে আগে চাই তীর্থপথিকের মনে অপরাজেয় শক্তি, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, আর দীর্ঘপথ চলবার জন্য অপরিমিত বল।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বল ছাড়া মানুষ আত্মস্থ হবে কি করে? সে বল লাভের জন্য প্রথমে চাই মুক্তজ্ঞানের চর্চা, যে জ্ঞান এনে দেবে চিত্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ। এ স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই মানুষের মনে জেগে উঠবে নিত্য নব আদর্শলাভের চেষ্টা—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সে বিচিত্র ভাব ও কর্মাদর্শই জীবনপথের পথিককে পৌছিয়ে দেবে সংস্কৃতির উদার সাগর-সঙ্গমে।

সে তীর্থপথিক আরো অনুভব করলেন, সংস্কৃতি-চর্চার নামে সংস্কৃতি-বিলাস দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানো যাবেনা। তার জন্যে চাই অক্লান্ত কর্মোদ্যম। জ্ঞানের আলোকে দৃষ্টি যদি স্বচ্ছ না হয়, তা হলে সংস্কৃতির বিসর্পিত ও দুর্গম পথে মানুষ চলবে কি করে? আর সমাজের মুষ্টিমেয় পুরুষ যদি এ শিক্ষা পায় তাতেও চলবেনা,—এ দূরান্তরের পথে 'আত্মার সঙ্গিনী' সংস্কারমুক্ত নারী যদি সাহচর্য দেয়, তা হলে পুরুষ চিত্তে পাবে বল, তার যাত্রাপথ হবে সুগম। সেজন্য নারীর চিত্তেও জ্ঞানের নির্মল আলোক ছড়িয়ে দিতে হবে। দূর করে দিতে হবে নারীর জীবনের পথ থেকে সকল রকমের বাধা—সমাজের অবাঞ্ছিত নিষ্ঠুর অত্যাচার, সংস্কারের দুঃসহ গ্লানি। তবে তো বহুযুগান্তব্যাপী অন্তঃপুরে শৃঙ্খলিত খাঁচার পাখী হয়ে উঠবে মুক্তপক্ষ বনবিহঙ্গী—মৃতপ্রায় বাঙালী জাতির জীবনে জেগে উঠবে মুক্তির জয়সঙ্গীত!

উদ্দেশ্য স্থির হয়ে গেল। এবার লক্ষ্যে পৌছাবার আয়োজন। দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে তখন অগ্রসর হলেন সে উন্নতললাট প্রতিভাদীপ্ত যুবক আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গম অভিমুখে। সে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের কথা। এ তীর্থপথিকের নাম পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

পূর্বসূরী রামমোহন বা সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথের মত আভিজাত্য গৌরব নেই; সমকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনের দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রবক্ষে তরণীও ভাসাননি তিনি: সম্বলের মধ্যে আছে তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের প্রবল তেজস্বিতা, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় অগাধ অধিকার, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হবার উদগ্র কামনা, চারদিকের ঘটনাস্রোতের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি, আর সংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসর মানুষের জন্যে তাঁর উদার অন্তরের সহজ মমত্ববোধ—ইংরাজীতে যাকে বলে 'হিউম্যানিজম'।

এ মূলধন নিয়ে বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি ও শিক্ষা আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে। রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মত প্রচুর অবকাশ বা স্বাধীনতা প্রথম কর্মজীবনে তাঁর ছিলনা, বাংলাদেশে যে নতুন চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে উঠছে, তারই প্রতীক বিদ্যাসাগর—অন্ন-সংস্থানের জন্য প্রথমে লালদীঘির পাশে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক (সেরেস্তাদার পণ্ডিত), তার পর গোলদীঘির সংস্কৃত-কলেজের প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ, এবং আরো পরে অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টরের কাজ।

ফোর্ট-উইলিয়মে কাজ করবার সময়ও (১৮৪১) দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ' বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ক্লান্তিহীন প্রয়াস,—মাইনের ৫০টি টাকার মধ্যে ২০টি টাকা পিতামাতা ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্যে বাড়ীতে পাঠিয়ে বাকী ৩০৲ টাকা দিয়ে বৌবাজারের বাড়ীভাড়া, নয় জন লোকের খাইখরচা প্রভৃতি করে পয়সার অভাবে চলছে বৌবাজার থেকে লালদীঘির পাশে রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত হেঁটে কলেজে যাওয়া। কিন্তু যে অদম্য জ্ঞানস্পৃহা বিদ্যাসাগর-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—জীবনের এত কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যেও সে প্রবৃত্তি এখনও তাঁর মনে সজীব। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার অবকাশে নিজের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট হিন্দী ও ইংরাজী লেখা ও পড়া দুই-ই শিখেছিলেন বিদ্যাসাগর। যে পরহিতৈষণা পরবর্তীকালে তাঁর চরিত্রে গৌরব দান করেছে, তার প্রারম্ভও হয় এ সময়ে।

তাঁর বৌবাজারের বাসা ছিল একই সঙ্গে তাঁর বাসস্থান ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। এখানেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ইংরাজী শিক্ষা করেন[১]; এখানেই রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত পড়াতে গিয়ে তিনি প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত পড়ার দুরূহতা উপলব্ধি করেন—যার ফলে পরবর্তীকালে সহজ উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি রচনা করেন 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'।"[২] এ সময় প্রচলিত ঘুণধরা সমাজ ও শিক্ষার সংস্কারকামনা বিদ্যাসাগরের মনে নিশ্চয়ই জাগত; ইতিপূর্বে ছাত্রজীবনেই তিনি সৃজ্যমান বাঙালী-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবীন ও প্রাচীনের প্রবল দ্বন্দ্ব স্বচক্ষে দেখেছেন; তাঁর কর্মজীবনে সে দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে এলেও একেবারে স্তিমিত হয়নি।[৩] কিন্তু যে মধ্যবিত্ত জীবনের ধূসর ছায়ায় তাঁর জীবন তখন প্রবহমান, সে সময় সমাজ বা শিক্ষা-সংস্কারের বড় বড় সমস্যা মাথায় এলেও তা সমাধান করবার মত সময় বা সুযোগ তাঁর ছিল কোথায়?

সময় বা সুযোগ না থাকার কারণ—১৮৪১ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দশবছর বিদ্যাসাগর অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনা দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য নিজেকে গড়ে তোলবার কাজে ব্যস্ত। এ সময়টার মধ্যে বিদ্যাসাগর একটানা চার বছর ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের কাজ, তারপর তিন মাস সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ, তারপর একবছর নয়মাস ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের হেড-রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। তারপর ১৮৫০-এর ৫ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক, এবং তার একমাস পরেই (১৮৫১, ২২শে জানুয়ারি) সে কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন।[৪]

সেদিনের কলকাতার নবোদ্ভিন্ন বিত্তকুলীন সমাজে যে কোন জনহিতকর কাজে হাত দিতে গেলে পদমর্যদার দরকার, অর্থেরও দরকার—দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে বিদ্যাসাগরের মনে নিশ্চয়ই এ বোধ জেগেছিল। তাই

১ বিনয় ঘোষ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ২৩৮-২৩৯

২ শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ॥ পৃঃ ১৮৯-১৯০

৩ বিনয় ঘোষ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ২৩৯

৪ বিনয় ঘোষ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ২৩৬

সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের পদ এবং অধ্যক্ষজীবনের শেষের দিকে সম্মানজনক স্কুলসমূহের পরিদর্শকের কাজ পেয়ে হয়ত তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু 'মূল্যহীনের সোনা করবার' কাজে যাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁর যে 'সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা' হবে সে ত স্বাভাবিক। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত এ সাতবৎসর কাল তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা ও বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে সে একচ্ছত্র ব্রিটিশ-অধিকারের যুগেও শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার কার্যে যে স্বাধীন কর্মোদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আজকের যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর জীবনেও দুর্লভ। শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারমূলক জনহিতকর কাজ করতে গিয়ে যখনই তিনি বাধা পেলেন তৎকালীন রক্ষণশীল সরকার থেকে, তখনই তিনি লোভনীয় বেতনের উচ্চপদ ত্যাগ করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি।

সে-যুগের পক্ষে এতবড় সম্মানজনক চাকরি বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করা বিদ্যাসাগরের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। তাঁর সে প্রবল ব্যক্তিত্ব সে যুগের অধিকাংশ মেরুদণ্ডহীন বাঙালীর আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে যে একটা বিরাট আদর্শের সন্ধান দিয়েছিল তাও খুবই সম্ভব। এভাবে সরকারী চাকরি-জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তির পর বিদ্যাসাগর এসে দাঁড়ালেন বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে। এর পর শুরু হল বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের দীর্ঘতম পর্ব, যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর (১৮৫৯ থেকে ১৮৯১ সাল)—তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টার পরিচয় নেওয়ার আগে আজীবন শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের মানব-মাহাত্ম্যবোধের অন্যতম নিদর্শন—শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষা-প্রচারের কিছুটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি দুটো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের তৎকালীন অন্যতম সংস্কৃতি-কেন্দ্র। একটিতে চলছে ইংরাজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার (লক্, হিউম, মিল, বেন্থাম প্রভৃতির) অবাধ আলোচনা, আর একটিতে সংস্কৃত

ব্যাকরণ (মুগ্ধবোধ), সংস্কৃত অলঙ্কার (সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর), সংস্কৃত কাব্য-নাটক (রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, নৈষধচরিত ইত্যাদি), বেদান্ত, স্মৃতি (মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ইত্যাদি), জ্যোতিষ (লীলাবতী, বীজগণিত প্রভৃতি) এবং ছিটেফোঁটা ইংরাজী-চর্চা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র অধিকাংশই তৎকালীন কলকাতার বিত্তবান ও প্রগতিশীল হিন্দু পরিবারের আদরের দুলালেরা; আর এক বিদ্যালয়ের ছাত্র রক্ষণশীল উচ্চবংশের সন্তানেরা। এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৃষ্টি পশ্চিমদিকে, আর এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৃষ্টি পূর্বদিকে। একদলের মনোভাব—'A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia', আর একদলের মনোভাব 'ব্যাদে সবই আছে'র মত। একদল বলত—'If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism', আর একদলের মনোভাব—সনাতন হিন্দুধর্মই একমাত্র সত্য। একদলের কাছে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, সুরাপান (এককালে বেশ্যাসক্তিও), নিষিদ্ধ-মাংস ভোজন প্রগতিশীলতার প্রধান লক্ষণ; আর একদলের কাছে এ সমস্তের সংস্পর্শ বিষবৎ এড়ানোই সংস্কৃতির অন্যতম চিহ্ন। এত বিপরীতধর্মী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ বাংলাদেশে আর কোনদিন বোধ হয় দেখা যায়নি।

হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় রাঢ়ীয় কুলীনবংশের দরিদ্র সন্তান বিদ্যাসাগর কলকাতার সংস্কৃতিক্ষেত্রে এ ভাববিপ্লব নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন; কিন্তু এ ভাবান্দোলন তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানবার উপায় নেই। কোন প্রতিক্রিয়া হলেও, বড়বাজারের সে অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহবাসী ঈশ্বরচন্দ্রের সেদিকে মন দিয়ে সমসাময়িক আন্দোলনে সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করবার সময় বা সুযোগ ছিল না। জ্ঞানতাপস ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞানসমুদ্রে সন্তরণই ছিল এ সময় প্রধান কাজ। তারপর ছাত্রজীবনে সাফল্যের পর ফোর্ট-উইলিঅম কলেজে তিনি যে শুধু চাকরি করতেন তা নয়, কর্মের অবসরে কলেজে বসে একদিকে তিনি নতুন বাংলা-সাহিত্য নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন, আর একদিকে তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের সাহায্যে ইউরোপীয়

ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার প্রমাণ আছে। এ পাশ্চাত্ত্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি তাঁর স্পর্শকাতর মনের সামনে নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছিল ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজ্ঞাত রাজ্য। তাঁর যুগসচেতন চিত্তে লেগেছিল এ যুগের ছোঁয়া। এ যুগ-শিক্ষাকে আমাদের দেশীয় শিক্ষার প্রাচীন ধারার সঙ্গে মিশিয়ে বাঙালী-চিত্তকে উদার সংস্কৃতির গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে কি করে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, এ চিন্তা এ সময় তাঁর মনে জেগেছিল—এ অনুমান একেবারে অহেতুক মনে হয় না। অবশেষে বহুবাঞ্ছিত সুযোগ এল, যখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি। তখন থেকে লেগে গেলেন তিনি যুগোপযোগী শিক্ষা-সংস্কারের কাজে।

ইতিপূর্বে লালদীঘির ফোর্ট-উইলিঅম কলেজের শাসন-শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর; তাই সর্বপ্রথমে সংস্কৃত কলেজের শ্লথ নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের কঠোর নিয়মানুবর্তী করে তুললেন। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজ-ছুটির বদলে ইংরাজী স্কুলের মত প্রতি রবিবার ছুটির দিন ধার্য হল। এর মধ্যেও আমরা বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনের পরিচয় পাই। কলেজে ছাত্র নির্বাচন ব্যাপারে যে বর্ণবৈষম্য প্রচলিত ছিল, 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যাসাগরের কাছে তা মনে হল মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার মত। সমস্ত দেশের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যার আদর্শে এই একটি মাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; তার দ্বারও যদি অব্রাহ্মণদের নিকট রুদ্ধ থাকে, তা-হলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের আশা কোথায়? তাই তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থদের নিকট, এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সকল জাতির নিকট সংস্কৃত-কলেজের উচ্চশিক্ষার দ্বার দিলেন উন্মুক্ত করে।

শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখী। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজজীবনের উচ্চতম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে না সে শিক্ষার মূল্য কতখানি?—এ প্রশ্ন বিদ্যাসাগরের মনে জাগল যখন তিনি দেখলেন সংস্কৃত কলেজের উচ্চতম উপাধিধারী ছাত্রকে সরকারী উচ্চতম পদ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) দেওয়া হয় না, অথচ হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সে পদ দেওয়া হয়। এ অধিকার লাভের জন্য আরম্ভ হল বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টা। সে চেষ্টা অবশেষে

ফলবতী হল। তদানীন্তন সরকার বিদ্যাসাগরের যুক্তির মূল্য বুঝে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরও শাসনবিভাগে উচ্চতর পদে (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) নিযুক্ত করতে স্বীকৃত হলেন।

দয়ার সাগর ছাত্রবন্ধু বিদ্যাসাগর। কিন্তু যে দয়া ছাত্রসমাজকে নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী করে তোলে, সে দয়া তাঁর কাছে অর্থহীন। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৪ সন থেকেই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য কোন বেতন লাগত না। এতে ছাত্ররা ইচ্ছামত কলেজে যাওয়া-আসা করত। এ শৃঙ্খলাহীনতা দূর করবার জন্যে নিয়মব্রতী বিদ্যাসাগর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবেতন দু'টাকা এবং ১৮৫৪ সন থেকে এক টাকা করে ধার্য করলেন। এতে ঈপ্সিত ফল ফলল। ছাত্ররা নিয়মানুবর্তী হয়ে কলেজে যাওয়া-আসা করতে লাগল। শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষকদের মধ্যেও যেখানে তিনি শৈথিল্য দেখলেন, কঠোর হস্তে সে শিথিলতা দূরীভূত করে সংস্কৃত কলেজকে অন্যান্য ইংরাজ-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মত আধুনিক করে তুললেন।

বিদ্যাসাগরের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নিয়মাধীনে সংস্কৃত কলেজের কাজ চলতে লাগল। এবার তিনি আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-সংস্কারে মন দিলেন। যে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' আয়ত্ত করতে বিদ্যাসাগর নিজে অনেক চোখের জল ফেলেছেন, পাঠ্যক্রম থেকে বোপদেবের সে 'মুগ্ধবোধ'-পাঠ তিনি তুলে দিলেন। সে জায়গায় প্রবর্তিত করলেন তিনি বাংলায় লেখা স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। সংস্কৃত কাব্য ও গদ্য হতে সুনির্বাচিত অংশ নিয়ে তৈরী 'ঋজুপাঠ'ও ছাত্রদের পাঠ্য করা হল। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম হল। সেকালের সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে এ যে কত বড় সংস্কার তা আজকের শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে অনুভব করা অত্যন্ত শক্ত।

এর পর আরম্ভ হল কলেজের ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কার। ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর পক্ষপাতী ছিলেন আধুনিক Direct Method-এর। তাই সংস্কৃতের মাধ্যমে ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' শিক্ষার স্থানে তিনি ইংরাজীর মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ইংরাজী শিক্ষা

আগে ছিল ঐচ্ছিক, বিদ্যাসাগর ইংরাজীকে একটি আবশ্যিক শিক্ষার বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলেন। ইংরাজী ও ইংরাজীর মাধ্যমে অঙ্ক শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত বেতনে শিক্ষকও নিযুক্ত হলেন।[১]

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজের শিক্ষাদর্শে গড়ে তুলবার কাজে ব্যস্ত, সে সময় (১৮৫৩ সনে) শিক্ষা-পরিষদের আমন্ত্রণে কাশী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেণ্টাইন এলেন সংস্কৃত কলেজের কার্যধারা পরিদর্শন করতে। কলেজের কার্যক্রম পরিদর্শন করে ডাঃ ব্যালেণ্টাইন সংস্কৃত-কলেজে প্রচলিত শিক্ষাকে আরো কার্যকরী করে তুলতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার সে-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের নিকট একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দেন। শিক্ষা-পরিষদ সে-রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠিয়ে দিলে, বিদ্যাসাগর ব্যালেণ্টাইনের শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত মতামত সমর্থন করতে না পেরে যে সমালোচনা শিক্ষা-পরিষদের নিকট পাঠিয়ে দেন—সেখানি, এবং ইতিপূর্বে ১৮৫০ সালে সংস্কৃত-কলেজের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শিক্ষা-পরিষদের নিকট প্রেরিত বিস্তৃত রিপোর্টখানি "বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে দুটি যুগান্তকারী দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য।"[২] এ দুখানি রিপোর্টে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেন, তা ছিল সে-যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রগতিধর্মী।[৩] প্রথম রিপোর্টে তিনি প্রচলিত সংস্কৃত-শিক্ষার অসার অংশ বর্জন করে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষাকে উন্নীত করতে উপদেশ দেন। ব্যালেণ্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন—এ নির্ভীক উপলব্ধি বিদ্যাসাগর সে যুগের প্রাচীনপন্থী সমাজের মধ্যে বাস করেও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি।

১ প্রসন্নকুমার অধিকারী—ইংরাজীর অধ্যাপক, শ্রীনাথ দাস—গণিতের অধ্যাপক। দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃঃ ৩২

২ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬০-৭০

৩ এ দুখানি দলিলের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের যে আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীযুক্ত ঘোষ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের ৬৫ হতে ৮২ পৃষ্ঠায়।

তারপর, ডাঃ ব্যালেণ্টাইন বেদান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সামঞ্জস্য অনুভব করবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদের যেখানে বার্ক্‌লের *Inquiry* পড়তে উপদেশ দিচ্ছেন, সে জায়গায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদকে পরামর্শ দিচ্ছেন সংস্কৃত-কলেজে 'খাঁটি' পাশ্চাত্ত্য দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। তা হলে, বিদ্যাসাগরের মতে, সংস্কৃত-কলেজের ছাত্ররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক বিচার করে সত্যে উপনীত হতে সহজেই সক্ষম হবে। ব্যালেণ্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা। বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য 'ডিপ্লোম্যাট' ব্যালেণ্টাইনের এ অপচেষ্টা-প্রবৃত্তিকে ধরে ফেলেন, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সে-অপচেষ্টাকে বাধা দেন। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে বিদ্যাসাগর দেখতে পেয়েছিলেন, বাংলাদেশে প্রাচীনপন্থীদের যুগ অবসিতপ্রায়। কর্ম ও ভাবচঞ্চল বিদেশী ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে নতুন যুগচেতনা জেগে উঠেছে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ; অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনগ্রসর প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বসে থাকলে চলবে না—দেশকে নতুন আদর্শে জাগাতে হলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

ব্যালেণ্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে বিদ্যাসাগর এ সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদকে লেখেন :

"বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃ-ভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের

দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে।"[১]

বিদ্যাসাগরের এ আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী একই সঙ্গে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন নর্মাল স্কুল, বাংলাদেশের চারিটি জেলায় মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালা স্থাপন এবং নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এবং অন্য পণ্ডিতদের রচনায় উৎসাহিত করে বাংলাদেশে জনশিক্ষার পথ সুগম করে দিতে। যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি এতদিন ছিল নগরকেন্দ্রিক, বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত বিদ্যা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রসারিত হতে থাকল বাংলাদেশের দিকে দিগন্তরে। এ জনশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজিত হল।

বাংলাদেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বহুবিস্তৃত ধারাকে প্রবাহিত করে দিতে গিয়ে এ চিন্তা বিদ্যাসাগরের মনে হওয়া স্বাভাবিক : অবিদ্যা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নারীজাতির মনকেও যদি উদার শিক্ষার আলোকে উদ্বোধিত করে না তোলা যায়, তা হলে দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতি-বিকাশের আশা সুদূরপরাহত। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতা করবার সময়েই বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টায় দুটো সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, নারীশিক্ষা-দরদী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন সাহেবের সহকর্মী হিসেবে 'বীটন নারীবিদ্যালয়'-এর মারফতে কলকাতায় নারীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্যে বাংলাদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস। কলকাতায় বা গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার করতে গিয়ে নানা দিক থেকে বিদ্যাসাগরের সামনে বাধা ছিল অনেক, তথাপি তাঁর উদ্দাম প্রাণাবেগের সামনে সমস্ত বাধা স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে গিয়েছিল সেদিন। এই 'বীটন বালিকা-বিদ্যালয়'কে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে নারীশিক্ষার বিকাশ হয় কলকাতা শহরে, এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে উত্তরকালে একটা

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃঃ ৩৮-৩৯

নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় – ইতিহাসের ধারা যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁরা সকলেই এ খবর জানেন। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ আদর্শবাদী হলেও, 'বীটন নারী-বিদ্যালয়'-সংলগ্ন নর্মাল স্কুলের মাধ্যমে বাঙালী শিক্ষিকা তৈরি করার অসুবিধা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিস্মিত করে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সুহৃৎ মিস্ কার্পেণ্টারের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়, এবং ১৮৭২ সনে বাংলার ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্পবেল যখন বীটন-বিদ্যালয়-সংলগ্ন নর্মাল স্কুলটি তুলে দিতে আদেশ দিলেন তখন সকলেই বুঝতে পারলেন যে, নর্মাল স্কুলের ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু নারী-শিক্ষিকা তৈরি করা যে অসম্ভব, বিদ্যাসাগরের এ অনুমান ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

সরকারী সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-র মে মাস থেকে ১৮৫৮ সনের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে অন্ততঃপক্ষে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। ১৮৫৭ সনের সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে সরকারের আর্থিক বিপর্যয় উপস্থিত হওয়ায়, সরকার বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হন। এতে বিদ্যাসাগরের আরব্ধ স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচার কাজে বাধার সৃষ্টি হল। এদিকে তদানীন্তন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে বিদ্যাসাগর কলেজে ৫০০ টাকা বেতনের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দিলেন। চারদিক থেকে সকল বাধাবিপত্তি যেন ষড়যন্ত্র করে বিদ্যাসাগরের এ মহৎ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে উদ্যত হল। কিন্তু বিদ্যাসাগর দমলেন না। নিজের চেষ্টায় 'নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার' খুলে তিনি বেসরকারী চাঁদায় বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করতে লাগলেন। সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন মাত্র আট বছরের মধ্যে বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে আলোড়ন উপস্থিত করে-ছিলেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ, স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর সেদিন যদি তাঁর সমস্ত প্রয়াসকে নিয়োজিত না করতেন, তা হলে আধুনিক সংস্কৃতির বহুমুখী অগ্রগতি যে সম্ভব হত না তা বলাই বাহুল্য। বিদ্যাসাগরের এ মানবতাবাদী স্ত্রী-শিক্ষা-আন্দোলনই পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করেছে স্ত্রী-জাতিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত

করবার আন্দোলনে; আর আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত নারীর সমাজ-জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলেই বিচিত্রধর্মী আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত হয়ে ভারতীয় তথা পৃথিবীর চর্যাসম্পন্ন জাতিদের মধ্যে বাঙালীকে একটা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

সরকারী সহায়তায় ব্যাপকভাবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার কার্যে আকস্মিকভাবে বাধা এলেও, আজীবন শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের শেষ স্তরেও এদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করলেও, বইয়ের ব্যবসা হতে তখন বিদ্যাসাগরের আয় প্রচুর (মাসিক প্রায় তিন-চার হাজার টাকা)। ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বাদুড়-বাগানে বাসের জন্য বাড়ী কিনলেন বিদ্যাসাগর, নিজের জ্ঞানচর্চার জন্য দেশী বিদেশী মূল্যবান বই কিনে নিজের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধও করে তুললেন। কিন্তু এতেও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের তৃপ্তি হল না, সম্পূর্ণভাবে দেশীয় অধ্যাপকদের পরিচালনায় তিনি ১৮৭৩ সনে মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করলেন। ১৮৭৯ সনে এ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে ফার্স্ট গ্রেড কলেজে পরিণত হল, এবং ১৮৮১ সনে এ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্ররা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করল। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকদ্বারা পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের অসামান্য সাফল্য দেখে একদিকে তৎকালীন শাসক ইংরেজদের যেমন বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি বাঙালীদের আত্মপ্রত্যয়ও গেল শতগুণে বেড়ে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সার্থকভাবে কার্য পরিচালনা একটি স্মরণীয় অধ্যায় সন্দেহ নেই।

সমাজ-চিন্তা-নিরপেক্ষ শিক্ষা মানুষের মনে সৃষ্টি করে সংস্কৃতির নামে সংস্কৃতিবিলাস—সে শিক্ষা করে মানুষের মনকে শুষ্ক, প্রাণহীন। পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এ ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের চারদিকে একটা সূক্ষ্ম ভাবমণ্ডল তৈরী করে অহংকৃত আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ইংরাজীতে এ শ্রেণীর সংস্কৃতিবিলাসীদের বলা হয় 'dilettante'। সৌভাগ্যের বিষয়—

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর 'dilettante' ছিলেন না, যেমন ছিলেন না উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরো অনেক চিন্তানায়ক মনীষী। এ সমাজ-চিন্তাশ্রিত শিক্ষাই এ যুগের চিন্তানায়কদের প্রেরণা দিয়াছিল বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি-নির্মাণে—যে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ দেখি আমরা সে যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টায়, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে এবং কিছুটা রাষ্ট্রচেতনায়।

এ সমাজ-চিন্তাই স্বভাবতঃ-মানবদরদী বিদ্যাসাগরকে জীবন-মধ্যাহ্নে টেনে আনল সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের বিক্ষুব্ধ ক্ষেত্রে।

বিদ্যাসাগরের যে সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা সে যুগের ঘুণ-ধরা রক্ষণশীল বাঙালী সমাজে বিক্ষোভের তরঙ্গ তুলেছিল, তার মধ্যে প্রধান হল—বিধবা বিবাহের অবাধ প্রচলন, এবং বহু-বিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ।

কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল দাঁড়িয়েছিল এরূপ: বিত্তকৌলীন্যহীন তথাকথিত কুলীন ব্রাহ্মণেরা একাধিক বিবাহ করে নিজেদের জীবিকার পথ সুগম করত, নিজেদের ভ্রান্ত বংশকৌলীন্য রক্ষা করবার জন্য কন্যার পিতারা আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন এবং অনেক সময় বৃদ্ধ কুলীন বরের কাছে বালিকা কন্যার বিবাহ দিতেন। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়াত বালবৈধব্য এবং সমাজের মধ্যে নানা ব্যভিচারের সৃষ্টি।

এ সমাজ-বিধ্বংসী প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল রামমোহনের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টায় এবং ইয়ংবেঙ্গলদের সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায়—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে চতুর্থ দশক পর্যন্ত। এ বিক্ষুব্ধ ভাবান্দোলন ছাত্রাবস্থায় ও প্রথম কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন; কিন্তু বিত্ত-কৌলীন্য ও সামাজিক বিশিষ্ট মর্যাদা না থাকায় বিদ্যাসাগর পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়া (১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দ্রষ্টব্য) তেমন কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেননি। সংস্কৃত-কলেজে সম্মানজনক অধ্যক্ষের পদ লাভ করবার পর ঈপ্সিত সুযোগ পেলেন বিদ্যাসাগর। ইতিমধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর সে প্রগতিশীল জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ করে ১৮৫৫ সনের ৪ঠা অক্টোবর

'বিধবা বিবাহ আইন' প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন।[১] সরকার সে আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ আইন' সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর জানতেন, শুধু আইন প্রণয়ন করে আদর্শ লাভ সম্ভব নয়। তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের পুত্রের এবং আরও কয়েকজন যুবকের বিধবা বিবাহ দেন। এভাবে বহু-যুগ-সঞ্চিত অনড় সমাজের বুকে বিদ্যাসাগর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন, তার ফলে সংস্কারান্ধ হিন্দুর অচলায়তনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল সেদিন। ১৮৫৪-৫৬-৫৭ সালে তাঁর এইসব সামাজিক ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া হয়—"বাংলাদেশের ইতিহাসে, তার আগে বা পরে, আর কোন ব্যক্তির কর্মের ফলে তা হয়েছে বলে মনে হয় না।"[২]

গুহাশ্রয়ী জীবের চোখে তীব্র আলোর ঝলক যখন লাগে তখন এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক—আলোকের দূত যাঁরা, তাঁরা আলোক বিকীর্ণ করে যাবেনই। বিদ্যা-সাগরের জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম'[৩] এভাবে সাধিত হল, এবং প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাতে সংস্কারবিমুখ তৎকালীন বাঙালীর চেতনা ক্রমশঃ জেগে উঠতে লাগল একটা নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতির প্রত্যাশায়। প্রবল আশাবাদী বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হলেন। অতঃপর সমাজের অপর দুষ্টক্ষত—'বহু-বিবাহ' রহিত করবার জন্য ১৮৫৫ সনে এবং ১৮৬৬ সনে দু'বার সরকারের কাছে আবেদন করলেন। এ প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ হলেও, তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙালীর অন্তর হতে কুসংস্কারের নীরন্ধ্র অন্ধকার দূর করবার জন্য বিদ্যাসাগর সেদিন যে আলোকোজ্জ্বল দীপ জ্বেলেছিলেন, সে দীপই পথ দেখিয়েছিল পরবর্তী মনীষীদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন পথরেখা অনুসন্ধান করতে। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার মূল্য হল এখানে।

১ সে আবেদনপত্রে বিদ্যাসাগর ব্যতীত আরও ৯৮৬ জন আবেদনকারীর স্বাক্ষর ছিল। দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২১

২ বিনয় ঘোষ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২০

৩ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের পত্রের একাংশ।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের রচনার মূল্য বহু আলোচিত, অতএব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ শেষ করব।

সাহিত্যে একশ্রেণীর লেখক দেখা যায়, যাঁরা সৃষ্টি-ক্ষমতাহীন হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর লেখেন খ্যাতির লোভে, আর এক শ্রেণীর লেখক সৃষ্টি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিমূলক রচনা না করে শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন জাতির বৃহত্তর কল্যাণব্রতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে। বর্তমান কালে অনেক কথাশিল্পী সম্বন্ধে যদি প্রথম মন্তব্য প্রযোজ্য হয়, তা হলে শেষোক্ত মন্তব্য প্রতিভাধর লেখক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য।

বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা এবং বহু-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে প্রস্তাব রচনা করবার পর তৎকালীন পণ্ডিতেরা বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত হীনভাবে রচনার মাধ্যমে আক্রমণ করেন।

এ সমস্ত আক্রমণের উত্তরে বিদ্যাসাগর বেনামীতে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি কয়েকখানি হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক বই লেখেন। এ সমস্ত বইয়ের ভেতর বিদ্যাসাগরের যে নির্মল রসবোধ এবং গতিশীল ভাষা সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে বিদ্যাসাগর যদি পাঠ্যপুস্তক রচনায় সময় ক্ষেপ না করে সৃষ্টিমূলক রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন, তা হলে বাংলা-সাহিত্যে রসসৃষ্টি বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই শুরু হবার সম্ভাবনা ছিল। ছাত্রজীবনেও বিদ্যাসাগরের রসবোধ যে কত প্রখর ছিল—তাঁর সাহিত্যাধ্যাপক সুরসিক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নির্দেশে সরস্বতীর উদ্দেশ্যে তাঁর রসাত্মক শ্লোক-রচনাও তার প্রমাণ।[১] তাঁর প্রথম অনুবাদ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' পাঠ করলে মনে হয়, বিদ্যাসাগর তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম হতেই গতিশীল গদ্য-

১ শ্লোকটি এই :

লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তা নিরন্তরম্॥

দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড—পৃঃ ১৬৩

রচনায় বেশ নিপুণ ছিলেন। তাঁর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক স্বাধীন রচনাগুলিতে আবেগধর্ম প্রবল। 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' অনুবাদ হলেও, সে সমস্ত রচনার মধ্যে বিদ্যাসাগরের চিত্রধর্মী রচনাদক্ষতা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিকার্যের উপযোগী এত ক্ষমতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খ্যাতির প্রলোভন ছেড়ে ছাত্রপাঠ্য পুস্তক (বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, শকুন্তলা, কথামালা প্রভৃতি), অথবা দেশী ও বিদেশী বিষয় অবলম্বনে জ্ঞানমূলক রচনাকার্যে (যেমন—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত) তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবন অতিবাহিত করতে গেলেন কেন, সে কথা মনে ওঠা স্বাভাবিক।

শিক্ষা-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন লোকহিতৈষণা, তেমনি সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রেও এ লোকহিতৈষণা বিদ্যাসাগরেকে অনুপ্রাণিত করেছিল শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক সাহিত্য রচনায়। এ প্রেরণা বলেই সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি ও ভিন্নপ্রবৃত্তির অধিকারী হয়েও বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারকে সুদীর্ঘ ষোলবছর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-প্রকাশে (১৮৪৩-১৮৫৯) সাহায্য করতে দ্বিধা করেননি। শুধু 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রবন্ধ-নির্বাচনে নয়, অনেক সময় সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচনা পরিমার্জিত করে দিয়ে, আবার কোন সময় নিজে বহু জ্ঞানমূলক রচনা লিখে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সমৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি একবৎসর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনার গুরু ভার গ্রহণ করেছিলেন।[১] তিনি এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন—গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত এ পত্রিকাখানি সমসাময়িক বাংলাদেশে জ্ঞানবিস্তারে ও গদ্য-সাহিত্যের মেজাজ পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করবে। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের অক্লান্ত চেষ্টায় 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিস্তৃত চর্চা ও আলোচনা হত, তা সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্য-পাঠ-বিমুখ 'ইয়ং

১ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত সম্পাদকের নামতালিকায় দেখা যায়—বিদ্যাসাগর ১৭৭৮ শকে (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

বেঙ্গল'দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সমর্থ হয়েছিল।[১] বিদ্যাসাগরের ক্লান্তিহীন আনুকূল্য না পেলে একা অক্ষয়কুমারের পক্ষে বাংলা গদ্যের মান উন্নয়ন এত অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব হত না, তা বলাই বাহুল্য। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের নামের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়া উচিত। দেবেন্দ্রনাথের মত বিদ্যাসাগরও অক্ষয়কুমারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বস্তুতঃ এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ই ছিল স্বজাতিপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের নিকট তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দেওয়ার অন্যতম আকর্ষণ।

স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে গিয়ে এ কথা বিদ্যাসাগরের মনে হওয়া স্বাভাবিক—পাঠ্যপুস্তকের মারফতে শিক্ষা দিয়ে যদি পাঠক সম্প্রদায় তৈরী করা না যায়, তাহলে উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্য উপভোগ করবে কে? খুব সম্ভব এ কারণেই বিদ্যাসাগরের এ পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস। শিল্পী-মন থাকা সত্ত্বেও শিল্প-সৃষ্টি-কার্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আত্মনিয়োগ করেননি, যদিও এ কথা অনস্বীকার্য—পরবর্তী শিল্পস্রষ্টাদের তিনিই অন্যতম স্রষ্টা। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের সুনির্দিষ্ট স্থান হল এখানে।

বাণীভঙ্গীতে সর্বপ্রথম ছন্দোস্পন্দ ও কলানৈপুণ্যের অবতারণায় বাংলা গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের হাতে অকস্মাৎ কিরূপে প্রসাধিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গও বহু আলোচিত। অতএব সে সম্পর্কেও আর বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই। শুধু এই মন্তব্য করেই এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে—সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য যুগোপযোগী যে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, বিদ্যাসাগর নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর জীবৎকালেই তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল—তা কখনই সম্ভব হত না যদি না তিনি তাঁদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষা সৃষ্টি করতেন।

১ এ সম্পর্কে ইয়ং-বেঙ্গলদের অন্যতম কৃতী পুরুষ রামগোপাল ঘোষের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য স্মরণীয়: "রামতনু! রামতনু! বাংলা ভাষায় গভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ"—বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।

দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ১৮১

বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারা যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথাটা স্বীকার করবেন যে, যে মানবমুখিতা আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—তার প্রাথমিক বিকাশ বিদ্যাসাগরের জীবন-জিজ্ঞাসায়। যদিও তাঁর রচনায় এমন কোন কথার উল্লেখ নেই, তথাপি গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরসের মত বিদ্যাসাগরেরও বক্তব্য ছিল—'Man is the measure of all things'। কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, কোন বিশিষ্ট সমাজ নয়, কোন আদর্শ মতবাদ নয়—তাঁর কাছে সব-কিছুর একমাত্র মানদণ্ড হল মানুষ। বিদ্যাসাগরের উদার হৃদয়ে অনুভূত এ গভীর মানবতাবোধই যুগধর্মের প্রেরণায় সহস্র ধারায় বিকাশ লাভ করে সৃষ্টি করেছে আধুনিক শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

৪

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবদিগন্ত ॥ তত্ত্ববোধিনী সভা ॥

॥ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার ॥

গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একটা অনগ্রসর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে আকস্মিক রূপান্তর ঘটতে পারে তার পরিচয়বাহী হল ১৮৩৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর কলকাতায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৯ খৃঃ অক্টোবর হতে ১৮৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর—মাত্র এই বিশ বৎসর বাংলা দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ছিল; কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম-জীবনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়ে নয়া বাংলার গোড়া পত্তনে যে যুগান্তরকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তার তুলনা খুবই বিরল। বস্তুতঃ গত শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মচর্চামূলক এ সাংস্কৃতিক সংস্থা সে যুগের সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের নবতর রূপদানে যদি বহুমুখী ও বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ না করত তা হলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতি যে বিলম্বিত ও ব্যাহত হত, তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

যে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলা দেশে ইংরেজ অধিকারের প্রথম বিশৃঙ্খলার যুগ বহুদিন আগে গত হয়েছে। দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানী কলকাতা শহরে। জব চার্নকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কলকাতার চেহারা তখন আর চেনা যায় না। শাসনকার্যের জন্য বহু ইংরেজের সমাগম হয়েছে এ আজব নগরী কলকাতায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকও খুলে বসেছে তাদের বিচিত্র পণ্যের পশরা। ইংরেজরাজের রাজকার্যে ও বিদেশী বণিকের বাণিজ্য ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য তখন রাজধানী কলকাতায় যুগপ্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে একদল

অর্ধ-ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী। কিছু ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করে 'যেন তেন প্রকারেণ' ইংরেজ প্রভুর সঙ্গে কাজের কথা চালাতে পারলে রাজসরকারে চাকরি হবে, কিংবা বণিক-বৃত্তিতে উন্নতি করা যাবে, এই আশায় তৎ-কালীন কলকাতার বহু পরিবারের অভিভাবক ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। বিদেশী ইংরেজরাও সুযোগ বুঝে কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে মহা উৎসাহে বাঙালী ছেলেকে ইংরেজী শেখাতে লাগলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পাঠে জানা যায়, সে যুগে ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান ছিল চিৎপুর রোডে সারবর্ণ (Sherburne) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল, আমড়াতলায় ফিরিঙ্গী মার্টিন বাউলের (Martin Bowle) স্কুল, আর আরটুন পিট্রাস (Arraton Petres) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল। এ সমস্ত স্কুলে শিক্ষানবিশী করে যাঁরা উত্তরকালে কলকাতার বিত্তবান্ সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন তাঁদের দুজনের নাম বাঙলাদেশের সকলেই জানেন। একজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, আর একজন সুবিখ্যাত ধনী ও দানবীর মতিলাল শীল; এ ছাড়া কানা নিতাই সেন এবং খোঁড়া অদ্বৈত সেনও ছিলেন সাহেবদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। এ সমস্ত স্কুলের শিক্ষার মান ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। যে ছাত্র যত বেশী ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করতে পারত, তাকে তত বেশী শিক্ষিত বলে গণ্য করা হত।

সে কালের অর্ধ-ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী সামান্য ইংরেজী শব্দের পুঁজি নিয়ে ইংরেজদের আপিসে আদালতে কাজ করত, আর ইংরেজ বণিকের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। ক্রমে ক্রমে প্রগতিশীল বাঙালীদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষাকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে একটা আন্ত-রিক আগ্রহ জেগে উঠল। কিন্তু 'নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করলে পাছে এ দেশবাসী নতুন বিদ্যাকে গুরুমারা কাজে লাগায়, এ আশঙ্কায় সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারে বহুকাল উদাসীন হয়ে রইলেন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারের এরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা চলেছিল ১৮১১ খৃঃ যাবৎ। সে বৎসর বড় লাট লর্ড মিণ্টো

এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য যে মন্তব্য (minute) লিখলেন তাতেও তিনি এ দেশীয় শিক্ষার ওপরেই জোর দেবার কথা বললেন। এ দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। সে বৎসর ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ ভারত সরকারকে দেশী শিক্ষা প্রসারের জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করতে নির্দেশ দিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে Committee of Public Instructions নামক সরকারী শিক্ষা-সংস্থা গঠিত হলে কমিটির সভ্যগণ সে এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বাবদ ব্যয় করতে শুরু করেন।

সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা-প্রচারবিমুখ হলেও তৎকালীন প্রগতিশীল বাঙালী সমাজ যে দেশের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, রামমোহন রায়ের শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনই তার প্রথম প্রমাণ। শিক্ষা-প্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিচারপতি হাইড্ ইষ্ট্ (Sir Hyde East) প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে রামমোহন ১৮১৭ খৃঃ ১৭ই জানুআরী গরানহাটায় যে মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপন করবার উদ্যোগ করেন, এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু কলকাতায় নয়, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুরেও একটি মিশনারী কলেজ স্থাপিত হল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ সরকারী অর্থে নির্মিত সংস্কৃত কলেজের পাশে একটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও এ কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তাঁর যুক্তিবাদী শিক্ষায় এ সময় কলকাতায় সৃষ্টি হল 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত এক শিক্ষিত সম্প্রদায়। এঁদের বিপ্লবমুখী সংস্কার প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত জীবনে অনুভূত হল এক বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (মাইকেল) মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি। এঁদের

মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হলেও অধিকাংশ ছিলেন অবশ্য ভাববিপ্লবী নবীনপন্থী।

একদিকে সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে প্রাচ্য বিদ্যা, আর একদিকে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা—এ দু'ধারায় বাংলা দেশের শিক্ষা প্রবাহিত হতে থাকল আরও কিছুকাল। ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশের প্রগতিশীল শ্রেণীর দাবি জোরালো হয়ে উঠল। ১৮৩৫ খৃঃ ভারতের শিক্ষা-সচিব লর্ড মেকলে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক মন্তব্যে (minute) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে সুপারিশ করেন। সে সুপারিশ গ্রহণ করে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টীঙ্ক কোর্ট অফ ডিরেক্টর্‌স্ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ (এক লক্ষ টাকা) ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে ব'লে বিধি প্রচার করলেন (১৮৩৫, ৭ই মার্চ)। বাংলা দেশে ইরেজীর মারফতে শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করল। প্রগতিবাদী 'ইয়ং বেঙ্গল' সর্বান্তঃকরণে এ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানালেন। শুধু যে তাঁরা এই নব-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন তা নয়, ভারতীয় সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তাঁরা মেকলের মতই উন্নাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হয়ে উঠলেন। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষায় পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে; তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে—'এক শেলফ্ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই।' তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেকস্‌পীয়র সেস্থলে অধিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's tales সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সমক্ষে বেদ-বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।[১]

সরকারী শিক্ষাসংস্কারের পূর্বেই কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান্ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষা 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্তরে বিপ্লবের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। শুধু মাত্র অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে ডিরোজিও যে তাঁর ছাত্রদের অন্তরে স্বাধীন চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, ছাত্রদের নিয়ে

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৪২

'অ্যাকাডেমিক এসোশিয়েশন' স্থাপন করে বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমেও তিনি এ স্বাধীন চিন্তা-প্রবৃত্তিকে তীব্রতর করে তুললেন। এ স্বাধীন চিন্তা যে সর্বাংশে সুফলপ্রসূ হয়েছিল, তা বলা চলে না। সমাজ- ও ধর্ম-সংস্কারের উন্মাদনায় তাঁদের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনে প্রবল প্রতি-ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন ও সুরাপান, জাতীয় জীবনে যা কিছু পুরাতন ও সনাতন—তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হল। এদিকে ডাফ্, ড্রিয়াল্‌টি প্রভৃতি মিশনারীগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে যে শুধু খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে লাগলেন তা নয়, প্রকাশ্য সভাসমিতি করে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তনে তৎপর হলেন। হিন্দু-কলেজের প্রাচীনপন্থী হিন্দু সভ্যগণ এ সমস্ত কারণে শঙ্কিত হয়ে ছাত্রদের উন্মার্গগামী করবার অপরাধে প্রথমে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করলেন; তারপর খ্রীষ্টীয় ধর্মসভায় ছাত্র-উপস্থিতি নিষিদ্ধ বলে আদেশ প্রচারিত হল। হিন্দু সমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব ইংরেজী শিক্ষিতদের মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ও স্বধর্মে আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করলেন। কলকাতার স্থানে স্থানে তার শাখা স্থাপিত হল এবং তাতে সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তিত হতে লাগল।

রাজা রাধাকান্ত দেব ছাড়াও সনাতন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে যাঁরা সেই অনিশ্চয়তার যুগে অগ্রণী হয়েছিলেন তার মধ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন রামমোহন। কারণ রামমোহনই ছিলেন সে যুগে যুক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের প্রধান উৎসাহ-দাতা। রামমোহন প্রাচীনপন্থীদের 'চ্যালেঞ্জ'কে গ্রহণ করে যে ঐতি-হাসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। তারপর প্রাচীনপন্থীদের আক্রমণের সুতীক্ষ্ণ শরগুলি নিক্ষিপ্ত হতে লাগল ভাববিপ্লবী 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রতি। 'ইয়ং বেঙ্গল'ও এ আক্রমণের জবাব দিতে দেরী করলেন না। প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা গৃহতাড়িত ও লাঞ্ছিত হয়ে হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'Inquirer' নামে

সংবাদপত্র প্রকাশ করে প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নব্য-তন্ত্রের বিপ্লবী হিন্দুরাও দলবদ্ধ হতে লাগলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট Inquirer পত্রিকাতে একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হল: ডিরোজিওর শিষ্যদের প্রধান এক ব্যক্তি (মহেশচন্দ্র ঘোষ) খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। প্রাচীনপন্থীরা এ ধর্মান্তরের সংবাদ পেয়ে শিউরে উঠলেন। সে বছরের ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। জনরব প্রচারিত হল হিন্দু কলেজের সমস্ত ভাল ভাল ছাত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। এতে প্রাচীন-পন্থী হিন্দুসমাজের মনে আরও ভীতির সঞ্চার হল। কিছুকাল পরে প্রতিভা-বান 'ইয়ং বেঙ্গল' মধুসূদন দত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সনাতনপন্থী হিন্দুরা অনুভব করতে লাগলেন এ ধর্মান্তরের স্রোতকে বাধা না দিলে হয়ত বা বাঙালীর জাতীয় সত্তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ সনাতনপন্থী হিন্দুদের অনেকেই ছিলেন উদার মনোভাবের অধিকারী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার এ সমাজবিধ্বংসী প্রভাব দেখে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, জাতীয় জীবনে এ বিজাতীয় স্রোতকে বাধা দিতে হলে এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে যার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবপন্থীরা আত্মস্থ হবেন, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে এমন একটা উদার জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করবেন, যে সংস্কৃতি এনে দেবে বাঙালীর গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত জীবনে মুক্তির ইঙ্গিত। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ বিপরীত ভাবস্রোতের মধ্যে জাতীয় শ্রেয়বোধের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন চিন্তা-শীল ও কর্মবীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যে সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে সে যুগের বিভ্রান্ত বাঙালী শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে একটা কল্যাণময় সত্যপথের ইঙ্গিত পেল, সে প্রতিষ্ঠানের নাম—'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য-বিকাশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। এ বাড়ীরই কৃতী সন্তান দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত

চেষ্টা সর্বপ্রথম বাঙালীকে বিদেশাগত ইংরেজদের নিকট-সম্পর্কে এনে দিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর যুগে এ প্রগতিশীল মানুষটি ইংলণ্ডে গিয়ে নিজের ধনৈশ্বর্যের দীপ্ত গৌরবে বলদৃপ্ত ইংরেজের চোখে সে যুগের বাঙালীর আভিজাত্য-গৌরবকে বাড়িয়ে দেন শতগুণ। ইংরেজী শিক্ষা-প্রচারের প্রথম যুগে রামমোহনের দক্ষিণ বাহু ছিলেন দ্বারকানাথ। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ডিষ্ট্রিক্ট্ চেরিটেবল সোসাইটি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের জন্য তাঁর মুক্তহস্তে দানের কথা বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। রামমোহনের নব উপলব্ধ মানবতাবাদী ধর্মবোধের তিনি একজন প্রধান সমর্থক।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু মানসপ্রকৃতির দিক দিয়ে পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু কলেজের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদের জীবনে বিপ্লবের যে ঢেউ উঠেছিল, সে ঢেউ স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবল ভাবাবর্তের মধ্যে বাস করেও তাঁর মনে দেশীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট। কর্মক্ষেত্রে পিতার অসাধারণ ক্ষমতা হয়ত তাঁর ছিল না, কিন্তু বেদান্তবাদী হয়েও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি যে মোটেই উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে। পিতার বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও বিষয়-বাসনা দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবশুচি মনকে কখনও প্রলুব্ধ করতে পারেনি। উপনিষদের ঋষিদের সত্যধর্ম ও জীবনাদর্শ তাঁর সমস্ত চিন্তাকে জাগ্রত করেছিল, আর উন্মোচিত করেছিল তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে এক আদর্শ জীবনলোক।

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই মহাপুরুষের মন সমসাময়িক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-উন্মাদনা দেখে যে ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রেমিক দেবেন্দ্রনাথ তখন অন্তরের গভীরে অনুভব করতে লাগলেন, জাতীয় সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠায় এমন কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, যার সাহায্যে সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙালী যুবকেরা আত্মস্থ হবে—আর সৃষ্টি করবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বিত আদর্শে এক নব্য সংস্কৃতির। বাঙালী

সংস্কৃতির নতুন রূপদান-পরিকল্পনায় দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা যখন কুয়াশাচ্ছন্ন, রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে তখন সুদূর ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে (১৮৩৩ খৃঃ ২৩-শে সেপ্টেম্বর)। তিনি জীবিত থাকলে সে যুগের বাঙালীর জাতীয় জীবনের কেন্দ্রচ্যুতির কথা দেবেন্দ্রনাথকে হয়ত এত ভাবতে হত না। ভাবতে হত না এ জন্য যে, বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম করে জাতীয় সংস্কৃতিকে একটা আদর্শলোকে পৌঁছিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রামমোহনের ক্ষমতা ছিল তুলনাহীন। স্বদেশে থাকতে এবং বিলাতে গিয়েও রামমোহনের বেদান্ত-চর্চার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীর সামনে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবকে নতুন করে তুলে ধরা। তাঁর অকালমৃত্যুতে এ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটল। চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অনুসৃত শাস্ত্র-বিচারের পথেই জাতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তিনি অনুভব করলেন, বেদান্তচর্চার মাধ্যমে রামমোহন যে জীবন-সত্যের সন্ধান করেছিলেন, সে মহত্তম সত্যোপলব্ধিকে বিভ্রান্ত জাতির সামনে পুনরায় উপস্থিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল পরিণাম দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হলেন যে, দেশীয় কৃতবিদ্য লোকের পরিচালনায় দেশের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে উৎকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনকে জাতীয়তার পাদপীঠে স্থাপন করবার আশা বৃথা। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, অথচ সে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা হতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিষয়ও বাদ যাবে না। দেশবাসীর বিচার-বিমূঢ় চিত্তের সঙ্গে সনাতন ভারতীয় শাস্ত্রের সত্যোপলব্ধির মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্যে প্রতিবৎসর চারজন করে ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করাও তাঁর নবপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হল।

এ সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে রূপ দেবার জন্যে দেবেন্দ্রনাথ নিজ পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে মাত্র দশজন সভ্য সংগ্রহ করে ১৮২৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করলেন, যার নাম দেওয়া হল প্রথমে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভার

প্রধান উপদেষ্টা রামমোহনের সহকর্মী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে ঐ সভার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

প্রধানতঃ ধর্মালোচনা ও ধর্মপ্রচারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র পার্থক্য ছিল মৌলিক। সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদের 'ধর্মসভা'র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটা একপেশে (Parochial)। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে সে ধর্ম-সংস্থা সে যুগের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের ভাঙন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারেনি। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যেরা সংস্কারমুক্ত ও সত্যান্বেষী দৃষ্টি দিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করলেন তার ফলে সমসাময়িক প্রবল বিরুদ্ধ ধর্মস্রোতকে বাধা দেওয়া সহজ হল। এ দিক থেকে বিচার করলে সে যুগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

শুধুমাত্র বিরুদ্ধ প্রবল ধর্মস্রোতকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়, তদানীন্তন বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

স্বদেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের চেষ্টায় মনীষী দেবেন্দ্রনাথের এ মহৎ উদ্দেশ্য সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি শীঘ্রই আকর্ষণ করল। ১৮৪০ খৃঃ হতে এর সভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ঐ বৎসর সভার সভ্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৫ জন; কয়েক বছরের মধ্যেই সে সংখ্যা বেড়ে হল ৮০০ জন। এই সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী মহলে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এর সভ্য-সংখ্যা-বৃদ্ধিই তার অন্যতম প্রমাণ।

সভার কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে লাগলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শ্যামাচরণ শর্মাসরকার, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রমাপ্রসাদ রায়, অমৃতলাল মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তবে প্রকৃতপক্ষে এ সভার নায়ক ছিলেন চার জন: (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত ও

(৪) রাজনারায়ণ বসু। অবশ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সভার প্রধান উপদেষ্টা ও আচার্য।[১] কি ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বে, কি তীক্ষ্ণ সমাজচেতনায়, কি সংস্কৃতি-প্রসারে সমসাময়িক বাংলা দেশে এঁদের স্থান কোথায়, সে আলোচনা বোধ হয় এখানে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযোগানন্দ দাস ১৩৪৫ সনের চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ৬৪ জন সদস্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এ তালিকা হতে দেখা যাবে—এ সমস্ত সভ্যের অধিকাংশ বাংলা দেশের রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রধান নায়ক। নিম্নে সে তালিকা হতে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল: পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অক্ষয়কুমার দত্ত; রাজনারায়ণ বসু; তারাচাঁদ চক্রবর্তী; নবগোপাল ঘোষ; রাজেন্দ্রলাল মিত্র; কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়; ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; গঙ্গাচরণ সরকার; কালীকৃষ্ণ দত্ত; রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়; রামতনু লাহিড়ী; নন্দকিশোর বসু; কেশবচন্দ্র সেন; শিবচন্দ্র দেব; দিগম্বর মিত্র; দ্বারিকানাথ ঠাকুর; পাথুরীয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্যারীচাঁদ মিত্র; কিশোরীচাঁদ মিত্র; কাশীপ্রসাদ ঘোষ; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মধুসূদন দত্ত।

এ তালিকা পাঠে এ কথা স্পষ্ট হবে সমকালীন বাংলাদেশের প্রতিভাবান্ কবি, লেখক, মনীষী, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, এমনকি চর্যাসম্পন্ন ভূস্বামী পর্যন্ত—একই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন পাশ্চাত্ত্য ভাব-স্রোতে ভাসমান বাংলা দেশকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় আধুনিকতার পাদপীঠের ওপর স্থাপন করবার জন্যে। এ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের প্রধান নায়ক অবশ্য মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালী সংস্কৃতির নব রূপ দান করবার এরূপ প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীতে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার আগে আর দেখা যায়নি।

শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম—এক কথায় জাতীয়তার ভিত্তিতে বাঙালী সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল প্রয়াস ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং অবশেষে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ৩য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা

নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা সম্ভব হয়েছিল, তার প্রাথমিক সূচনা দেখি আমরা 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ত্রিবিধ কার্যক্রমের ভেতর। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তিকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হওয়ায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যধারার ভেতর হয়ত বা কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল বলে মনে হবে (যেমন, বেদাধ্যয়নের জন্য কাশীতে ছাত্র প্রেরণ); কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্বের বিশ বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খৃঃ পর্যন্ত কালটি বাঙালী সংস্কৃতির সৃজ্যমান যুগ।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম কাজ হল জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। সৃজ্যমান বাঙালী সংস্কৃতির যুগে এ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কতখানি তা বুঝতে হলে সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার আগেই দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এ ছাড়া কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগের নীতিও গৃহীত হয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশী ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশবাসীর মন যে উন্মুখ হয়ে উঠবে—এ ত খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর ওপর বেশী জোর দেওয়াতে দেশের বাংলা পাঠশালা ও মাতৃভাষা শিক্ষার যে খুবই দুরবস্থা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক একচক্ষু শিক্ষাকে এ ত্রুটি থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে একটি পাঠশালা স্থাপন করলেন ১৮৪০ খৃঃ ১৮ই জানুআরি। এ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মাধ্যমে ইওরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এ পাঠশালার আদর্শই মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণা দিল অনুরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করতে। এ ছাড়া ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে যাতে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, এ নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সেদিকেও দেবেন্দ্রনাথ এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের দৃষ্টি রইল সদা-জাগ্রত। এ উদ্দেশ্য নিয়ে

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৪০ খৃঃ ১৩ই জুন তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতার সিমলা অঞ্চলে। সভার অন্যতম সদস্য অক্ষয়কুমার দত্তের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রথম থেকেই পাঠশালার শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ নিজেদের পাঠশালার জন্যে যে সমস্ত বই কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বাংলায় লিখিয়েছেন, তাদের ভেতর যাতে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি, বা ভাবধারা স্থান না পায় সেদিকেই ছিল তাদের বিমাতা-সুলভ দৃষ্টি। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান নায়ক দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, এ সমস্ত বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তা হবে সভার আদর্শের পরিপন্থী। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজেই নতুন ধারায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রসর হলেন। ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি রচনা করলেন। পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তও ভূগোল, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বাংলায় পাঠ্য বই রচনা করলেন। এ সমস্ত বই 'পাঠশালা'র ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য 'ধর্মতত্ত্ব' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হল। এ ভাবে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাংলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন আদর্শের সন্ধান দিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যার অনুকূল না হওয়ায়, এবং শিক্ষার সময় (সকাল ৬টা হতে ৯টা) ছাত্রদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। এ সমস্ত কারণে 'পাঠশালা' কলকাতায় তিন বছরের বেশী চলল না। কর্তৃপক্ষ তখন পাঠশালার কার্যক্রমের কিছু পরিবর্তন করে এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করলেন। পল্লীবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই বিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হলেও আসলে কলকাতার ইংরেজী স্কুলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামর্থ্যের অভাবই এই স্থানান্তরের প্রধান কারণ বলে মনে হয়। পাঠশালার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হল: 'ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় উপযুক্ত মত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা

হইল।'[১] বংশবাটীতে 'পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা-উৎসব বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় আদর্শের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানই যে পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত হতে বলেন।[২]

'পাঠশালা'র দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ—বংশবাটীর বিদ্যালয়েও ছাত্রসংখ্যা ১২৭ জনের বেশী হয়নি। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যত কমই হোক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পঠন-রীতি ও শিক্ষার মান যে অত্যন্ত উন্নত ছিল তৎকালীন সরকারী শিক্ষা-পরিষদও (Council of Education) তা স্বীকার না করে পারেননি।

আরও তিন বৎসর পাঠশালাটি বাঁশবেড়েতে কৃতিত্বের সঙ্গে চলেছিল। কিন্তু 'কার ঠাকুর কোম্পানি' ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র পতনের ফলে 'পাঠশালা'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ আর প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে সক্ষম না হওয়ায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঠশালার কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস আজ অনেক পাঠকের নিকট হয়ত নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে; কিন্তু এখানে শিক্ষাবিস্তারের কথাটাই বড় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেকালের ইংরেজী শিক্ষানবীশ বাঙালীর উৎকেন্দ্রিকতাকে সুস্থ মানসবৃত্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা তাঁদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েও কতটা নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই এ দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা।

হিন্দু কলেজের শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মন্থন করে বাংলা দেশে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্মাণে ব্যস্ত, সে সময় তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নিজ ব্যয়ে কাশীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ছাত্রপ্রেরণ কতকটা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ বলে মনে হবে। কিন্তু মনীষী দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, যে শিক্ষা বিদ্যার্থীকে স্ব-ধর্ম ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ৩য় খণ্ড, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৬ পৃষ্ঠা

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৫ শক

করে তোলে সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র—বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কাশী প্রেরণ করেন ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪-৪৫ খৃঃ অঃ)। এঁরা যে শুধু বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠ করেছিলেন তা নয়, টীকা-সমেত উপনিষদ্ও এঁরা ভাল করে পাঠ করেছিলেন। এদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র (ভট্টাচার্য) বেদান্তবাগীশ পরবর্তী-কালে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসে বেদচর্চা ও আলো-চনার দ্বারা তাঁর দীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের উৎ-সাহ পেয়ে মনীষী রাজনারায়ণ উপনিষদের ইংরেজী তর্জমা করেন। এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ নিজেও হিন্দুশাস্ত্রের মূলসমেত কিছু কিছু অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করে হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ঔৎসুক্য জাগ্রত করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে এবং মনীষী দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ সমস্ত আলোচনা-গবেষণার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শুধু উৎ-কেন্দ্রিক কালচার-বিলাসী বাঙালী নয়, ভারতের এবং বিদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে বাঙ্লা দেশে বেদচর্চা বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে-ছিল, সন্দেহ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা বাঙালী মাত্রেরই স্মরণযোগ্য। কি সাংবাদিকতা, কি সাহিত্য, কি সমাজ-সংস্কার, কি ইতিহাস-চেতনা, কি বিজ্ঞানানুরাগ—সংস্কৃতির প্রায় সকল দিগন্তেই 'সভা'র মুখপত্র এই সংবাদপত্রখানি যে উচ্চ মান স্থাপন করল, বাংলা দেশে তা অভূতপূর্ব। বহুবিস্তৃত বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে এ সংবাদপত্রের লেখকদের অবাধ সঞ্চরণ বাঙালী মানসিকতাকে আধুনিকতার তোরণে উত্তীর্ণ করে দিল ; এ পত্রিকার আলোচনা-গবেষণার মাধ্যমে বাঙালীর স্বদেশ-চেতনাও একটা সৃষ্টিধর্মী রূপ পেল। এ পত্রিকার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদেরও অনুপ্রাণিত করল নিজেদের চিন্তাপ্রসূত বিষয়গুলিকে মাতৃভাষায় রূপ দিয়ে পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ করে তোলবার

জন্যে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোড় ঘুরে গেল। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়ে উঠল এ পত্রিকার ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকেরা।

পত্রখানির প্রভাব ছিল দ্বিবিধ: একদিকে এ পত্রিকা নব্যশিক্ষিত বাঙালীর জড়বাদী দৃষ্টিকে অধ্যাত্মমুখী করে তুলল, আর একদিকে ভাবালুতা-পূর্ণ বাঙালী-মানসকে যুক্তিবাদের কঠোর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি-রচনার অগ্রদূত হয়েছিল এই জ্ঞানগর্ভ সংবাদপত্র। 'গুপ্ত কবি'র সুবিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে এ পত্রিকার পার্থক্য ছিল মৌলিক। 'গুপ্ত কবি'র 'সংবাদ প্রভাকর' যেখানে সমসাময়িক কাব্যকবিতার অন্যতম উৎসাহদাতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেখানে কাব্যকবিতা প্রকাশের প্রতি একান্তভাবে বিমুখ। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদকেরা ছিলেন অনেকেই সংস্কারক, তাই সাহিত্যসৃষ্টিমূলক রচনা অপেক্ষা লোকহিতকর রচনাই যে সে পত্রিকায় প্রাধান্য পাবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল বলেন: 'শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনারীদের আক্রমণ হইতে স্ব-ধর্ম ও স্ব-ধর্মীদের রক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ-নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।'[১]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সম্পাদক বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্তের যোগাযোগ সে যুগের পক্ষে বলা যায় মণিকাঞ্চন সংযোগ। এ পত্রিকার মান যে কত উন্নত ছিল, তা বোঝা যায় প্রবন্ধ-নির্বাচন ব্যাপারে। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুসরণে একটি গ্রন্থ-কমিটি (Paper Committee) স্থাপন করে দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি প্রকাশযোগ্য রচনাকে কমিটি দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেবার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। গ্রন্থ-কমিটির সদস্যরাও ছিলেন সে কালের সেরা লেখক, যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। রচনা-নির্বাচন-ব্যাপারে এ গ্রন্থ-কমিটির মতামতই ছিল চূড়ান্ত। এমনও

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৩য় খণ্ড, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ২৫

হত, কোন কোন সময়ে গ্রন্থ-কমিটি রচনা প্রকাশে পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের মতামত পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছেন। ব্যক্তি ও মতামত-নিরপেক্ষ এ রচনা-নির্বাচনপ্রথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে যে সর্বজনসমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল তা নিঃসন্দেহ।

প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-খানি। প্রকাশের প্রথমাবস্থায় অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা রচনায় প্রাধান্য লাভ করলেও যুক্তিবাদী পণ্ডিত অক্ষয়কুমারের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পত্রিকার মেজাজ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় অধ্যাত্মবিষয় ছাড়াও যুক্তিনির্ভর জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বিচিত্রধর্মী রচনা পত্রি-কার পৃষ্ঠায় স্থান পেতে থাকে। বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ ঐ সমস্ত রচনা পছন্দ করুন আর না করুন, গ্রন্থ কমিটির সুচিন্তিত মতামতের ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অবশ্য মত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মনও যখন ক্রমশঃ যুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে, তখন ঐ শ্রেণীর রচনা প্রকাশে তাঁর আর কোন দ্বিধা দেখা যেত না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রচনা প্রকাশে শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের আদর্শই জয়ী হল। বস্তুতঃ তাঁর সম্পাদনা কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমৃদ্ধি হয়েছিল সব চাইতে বেশী।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক কত বিভিন্ন বিষয়ে কত জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে যুগের ইংরজী-শিক্ষিত বাঙালীর রুচি ও জ্ঞান-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিল বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের শীর্ষনাম থেকেই তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এ তালিকায় অবশ্য অধ্যাত্মবিষয়ক সমস্ত রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে:

অদ্ভুত কীটাণু; অয়স্কান্তমণি; অলৌকিক রাসায়নিক; অসভ্য জাতিগণের সৌন্দর্যের ভাব, অশোকচরিত; আকবর সাহার ধর্মবিষয়ক মত; আগ্নেয় গিরি; আত্মদর্শন—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব; আদিম মনুষ্য; আন্দামান দ্বীপবাসীদিগের বৃত্তান্ত; পার্বত্যজাতির নীতিশাস্ত্র, আর্যজাতির উপনিবেশ; আর্যবংশের আদি ধর্ম; * * সমুদ্রযাত্রা (প্রাচীন হিন্দুদিগের), সিন্ধুঘোটক, সিপিয়া মৎস, শূদ্রদিগের বেদপাঠে অধিকার বিষয়ে প্রমাণ, হিমশীলা, হীরক। ইংরেজীতে: A Bengali in Germany, Famine Relief—Letter dated about

1861, Female seclusion, Philosophy and religion from Cousin (দ্রষ্টব্য : ইংরেজীতে অধিকাংশ রচনা এবং পত্রের উত্তর ধর্মবিষয়ক)।[১]

তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তত্ত্ববোধিনীর বিভিন্ন সম্পাদক ও লেখকেরা আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম যুগে এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা-গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, যা এ কালের প্রগতিশীল সংস্কৃতির যুগেও আমাদের অনেক পত্রিকায় কম দেখা যায়। বিষয়গুলির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছিল :

উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, দর্শন, ভূগোল, প্রাচীন কীর্তি—স্থাপত্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জীববিষয়ক আলোচনা, পদার্থবিদ্যা, কীটতত্ত্ব, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, রাজা-প্রজা-বিষয়ক আলোচনা, পশুবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা (Zoology), পৃথিবীতত্ত্ব, সমরতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জ্ঞান ও ধর্মের তুলনামূলক বিচার, প্রাচীন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুদীর্ঘ বারো বৎসর (১৮৪৩-১৮৫৫ খৃঃ) যাবৎ এ পত্রিকার সম্পাদনা করেন জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদনা কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধু যে বিষয়বৈচিত্র্য লাভ করে-ছিল তা নয়, সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর জ্ঞানস্পৃহা সম্পর্কে জাগ্রত কৌতূহলকেও পরিতৃপ্ত করেছিল। সেকালে এ পত্রিকাখানির জনপ্রিয়-তার অন্যতম নিদর্শন হল—তাঁর সময়ে গ্রাহকসংখ্যার আশাতীতরূপে বৃদ্ধি। এ সম্পর্কে "অক্ষয়-চরিতকার" নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ও মনীষী দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় ইহাতে ধর্মবিষয় ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়।' (দ্রঃ--অক্ষয়-চরিত, পৃঃ ১৯-২১)।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল, তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।' [ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২১]

১ এই নির্বাচিত রচনার নামগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ম হতে ৯ম কল্পের নির্ঘণ্টপত্র থেকে সংগৃহীত —লেখক

অক্ষয়কুমার দত্তের ক্লান্তিহীন প্রয়াস ও মনীষার স্পর্শে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মালোচনা—এক কথায় সমকালীন সংস্কৃতির অনুর্বর ভূমিতে যে ঐশ্বর্যময় সোনার ফসল ফলিয়েছিল—তা সর্বজন-স্বীকৃত। এ পত্রিকার যুগোচিত আবির্ভাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি হল ভাববেগ-প্রধান বাঙালী চিত্তে যুক্তিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, যে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাধান্য পরবর্তীকালে বিদগ্ধ বাঙালী গদ্যলেখকদের অনুপ্রাণিত করেছে মননশীল প্রবন্ধরচনায়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রধান ও বিষয়নিষ্ঠ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঐতিহাসিক আবির্ভাব না ঘটলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্রমুখী সংস্কৃতি-বিকাশ যে বিলম্বিত হত—তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

১৮৫৯ খৃঃ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের এ যুগান্তকারী পত্রিকার প্রচারও বন্ধ হয়ে যায়।[১]

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যৌথ প্রয়াসের সাহায্যে দেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে নবযুগ সম্ভাবনা হয় সুদূর পরাহত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ভূমিকা সে যৌথ প্রয়াসেরই পরিচয়বাহী। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা যদি ত্রিমুখী কর্মপন্থার মাধ্যমে সে সাংঘাতপূর্ণ যুগে দেশের সর্বত্র 'সংঘমন'কে ছড়িয়ে দিয়ে একটা 'যুগমন'[২] গঠনে সক্ষম না হত তা হলে বাঙালী সংস্কৃতি কি রূপ নিত তা বলা কঠিন। শিল্প-চেতনার দিক দিয়ে না হোক, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্য তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে এ তত্ত্ববোধিনীর যুগে। আজ আমরা যে সমন্বিত আদর্শের বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—তার সূচনাও হয় এই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সমবেত প্রচেষ্টায়।

সজনীকান্ত দাস, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা

'সংঘমন' 'যুগমন' কথা দুটি—শ্রীযোগানন্দ দাস কর্তৃক ব্যবহৃত

প্রজ্ঞা ও প্রত্যয় ॥ ঐতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥

ভূদেব ও রাজনারায়ণ

মধুসূদন, ভূদেব ও রাজনারায়ণ—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে প্রতিভা ও মনীষার এক অপূর্ব সম্মেলন। জন্মলগ্নের দিক দিয়েও তিনজন নিকটবর্তী—১৮২৪, ১৮২৫, ১৮২৬; তিনজনেই এক কলেজের সহাধ্যায়ী উৎকৃষ্ট ছাত্র, আবার হৃদয়ের সান্নিধ্যের দিক দিয়েও তিনজনেই অন্তরঙ্গ—অবশ্য মধ্যমণি মধুসূদন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে মধুসূদন স্বতন্ত্র—আর ভূদেব ও রাজনারায়ণ যেন একবৃন্তে দুটি ফুল। মধুসূদনের প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল—বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্ত; আর ভূদেব-রাজনারায়ণের মনীষা সংযত-গম্ভীর—rational. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের ভূমিকা তাই নবস্রষ্টার, আর ভূদেব-রাজনারায়ণের ভূমিকা বাংলাদেশের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমে হুঁশিয়ার কাণ্ডারীর। একজন যা কিছু পুরাতন তা ভেঙে নবসৃষ্টির উল্লাসে বিভোর। অপর দুজন যা চিরন্তন, জাতির জীবনে যা শ্রেয়, সে আদর্শকে দিক্‌ভ্রান্ত জাতির সামনে উপস্থাপিত করবার জন্য তৎপর। সেজন্য মধুসূদন এবং ভূদেব-রাজনারায়ণের জীবন ও কৃতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনায় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য।

মধুসূদন ও ভূদেবের জীবনাদর্শের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের বাল্যস্বপ্নে। একদিন কথোপকথন প্রসঙ্গে মধুসূদন বলেছিলেন তিনি একজন 'বড় কবি' হবেন; ভূদেব ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ভবিষ্যতে "যেন অনুমাত্রও দেশের কোন কাজে লাগিতে পারি।"[১] আর রাজনারায়ণের জীবনাদর্শ অনুস্যূত হয়ে আছে তাঁর পরিণত বয়সের বক্তৃতায়: "প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।"

১ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব চরিত, পৃঃ ৮৫

"স্বদেশী লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য জাতি সমূহের মধ্যে গণজাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সে ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।" [১]

এ স্বপ্নপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই একজন নব্যবঙ্গে যুগস্রষ্টা কবি, একজন আদর্শ লোকশিক্ষক, আর একজন আত্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞান ও কর্মযোগী,—ঋষিপ্রতিম শ্রদ্ধেয় মানুষ। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা মুক্ত করে বাংলা কাব্যকে আধুনিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসে মধুসূদনের যে স্থান, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘাতমুখর বাঙালী সংস্কৃতিকে সমন্বয়ী আদর্শের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন প্রচেষ্টায় ভূদেব-রাজনারায়ণেরও সে স্থান। ভিন্নমুখী ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বে বর্তমান দিক্‌ভ্রান্ত বাঙালীর সামনে ভূদেব-রাজনারায়ণের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন প্রয়াস তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মধুসূদন, ভূদেব ও রাজনারায়ণ একই ভাববিপ্লব-বিক্ষুব্ধ যুগের মানুষ। গত শতাব্দীর নব্য সাহিত্য সৃষ্টির আকাশে মধুসূদনের দান বিদ্যুৎগর্ভ হলেও ক্লাসিকধর্মী গদ্য এবং নতুন সংস্কৃতি রচনার বিস্তৃত অবকাশে ভূদেব-রাজনারায়ণের দানও অনুল্লেখ্য নয়। অথচ মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-সৃষ্টি নিয়ে তাঁর সমসাময়িক যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাঙলা দেশে আলোচনা সমালোচনার ধারা অব্যাহত; কিন্তু নব্যবঙ্গের স্রষ্টাদের অন্যতম হলেও অপর দুই মনীষীর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের মূল্যনির্ধারণ-প্রচেষ্টা আজ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার স্তরে পর্যবসিত।

এর কারণ কি?

কারণ খুব সম্ভব এই যে, মধুসূদনের জীবনে এমন একটা বৈচিত্র্য ছিল, এবং তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে এমন একটা চমক ছিল যা এখনও আমাদের কল্পনাকে চকিত করে, আর কাব্যরসচেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। বিশেষ করে তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে

[১] রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত পৃঃ ১২৩-১২৪

এমন একটা রহস্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়েছিল যার মর্মোদ্‌ঘাটন করবার প্রয়াস এখনও সমাপ্ত হয়নি। সেজন্য দেখা যায় মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে যত জটিল আলোচনা হয় তাঁর কাব্যসৃষ্টি নিয়ে ততটা নয়। ভূদেব ও রাজনারায়ণের জীবনে মধুসূদনের জীবনবৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বে আছে হিমালয়ের অটল গাম্ভীর্য ও মৌন মহিমা। এ ছাড়া তাঁদের সাহিত্য রচনার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাতে এমন কোন চমক বা রহস্যময়তা নেই যা আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচকের জটিলতাসন্ধানী মনকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। তাঁদের রচনায় সূক্ষ্ম রোমাণ্টিক কল্পনার স্থান নেই (একমাত্র ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া) যা মধুসূদনের অধিকাংশ কাব্য-নাটকের অন্যতম প্রধান উপকরণ; আর তাঁদের দ্ব্যর্থহীন সরলতাগন্ধী রচনায় পড়েছে তাঁদের ঋজু মনের ছায়া যা নাকি আধুনিক জটিল মনন এবং তির্যক রচনাভঙ্গীর যুগে অপাংক্তেয়। কিন্তু আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় একথা স্বীকার করবেন, মননশীলতার সঙ্গে বক্তব্যের স্বচ্ছতা যদি উৎকৃষ্ট গদ্যরচনাভঙ্গীর আদর্শ হয়, তা হলে ভূদেব-রাজনারায়ণের রচনা নির্মাণ-যুগের বাংলা সাহিত্যে একটা অমূল্য সম্পদ। আর যে স্বচ্ছ ভাষা-মুকুরে তাঁদের বিচারসহ ও মননশীল ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে, সে ব্যক্তিত্ব-প্রসঙ্গও আজকের ধোঁয়াটে চিন্তার যুগে বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য।

ভূদেব ও রাজনারায়ণের চরিত্রে মধুসূদনের উচ্ছৃঙ্খল প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি ও প্রগল্‌ভতা ছিল না একথা সত্য, কিন্তু সে ঋজু-শুভ্র ব্যক্তিত্বে এমন একটা প্রবল সত্যনিষ্ঠা এবং সজীব দেশাত্মবোধের প্রেরণা ছিল যা তাঁদের জীবনকে সেই আত্মভ্রষ্টতার যুগে বনস্পতির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাহিত্য-স্রষ্টার রসবোধ যে উভয় মনীষীর মানসে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তা তাঁদের কোন কোন রচনা পড়লে বোঝা যায়, কিন্তু রসসৃষ্টির পিচ্ছিল পথে তাঁরা পরিক্রমণ করেন নি। সর্বপ্রকার আচারভ্রষ্টতা মুক্ত করে সে যুগের বাঙালীকে জাতীয়তার উদার ভূমিতে উত্তীর্ণ করবার সাধনায় জীবনের বন্ধুর পথে তাঁদের যাত্রা ছিল অব্যাহত। মহৎ জীবন সাধনায় একজন গ্রহণ করেছিলেন লোকশিক্ষকের ভূমিকা, আর একজন সংস্কারকের। সেই প্রথম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রভাবিত যুগে বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে

যে ভাঙন ধরেছিল, পরানুকরণ-স্পৃহার ফলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণে যে দোষ-দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, সমকালীন বাঙালী চরিত্রকে সে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত করবার জন্যে মনীষী ভূদেবের সাধনা ছিল সারাজীবন অতন্দ্র। আর ঋষি রাজনারায়ণের সাধনার লক্ষ্য ছিল সে যুগের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীকে সুরারূপ বিষপান-মুক্ত করা, জাতীয়তা-বোধহীন আত্মভ্রষ্ট স্বদেশবাসীকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা, আর আবেগধর্মী তরল ধর্মবোধকে ভাবাবেগহীন যুক্তিতর্কের কঠোর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। এ দুই মনীষীর অনির্বাণ জীবন-সাধনা অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যকে যে একটা নবজীবনের তোরণ-প্রান্তে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল, তা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই জানেন।

যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভূদেব ও রাজনারায়ণ সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্কার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন এ প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের "বাবু সংস্কৃতি" তখন অবসিতপ্রায়। সে ধ্বংসোন্মুখ বিকৃত সংস্কৃতি ক্রমশঃ নবতর রূপ লাভ করছে নতুন চিন্তার প্রভাবে। এ নতুন জীবন-চিন্তার ভিত্তিমূলে ছিল প্রধানতঃ হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা। ডাঃ সুকুমার সেন সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সে যুগের শিক্ষার্থীকে করেছিল সংস্কারকামী, আর হিন্দু কলেজের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের করে তুলেছিল বিপ্লবী। (দ্রষ্টব্য, লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯)। এ সংস্কার ও বিপ্লবী চিন্তা অনুভূত হয়েছিল প্রধানতঃ সাহিত্য, ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, ধর্মসংস্কারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আর নতুন সাহিত্য সৃষ্টি জগতে প্যারীচাঁদ-মধুসূদনের আবির্ভাব এ যুগের স্মরণীয় ঘটনা। এ ছাড়া আদালতের ভাষা হিসেবে ফারসীর স্থলে ইংরাজীর প্রবর্তন, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের প্রচলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সিপাহী বিদ্রোহ, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতি, বিজ্ঞানালোচনার আরম্ভ প্রভৃতি অনেক ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করেছে একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ। সে জগৎ নিত্য নতুন কৌতূহলের জগৎ—সে জগতের অধিবাসী নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী।

জীবিকার জন্য সরকারী ও বেসরকারী চাকরি গ্রহণ করে সে যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, আর সঙ্গে সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন একই সঙ্গে সমকালীন রাজধানীকেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবিত সভ্যতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্লেদাক্ত গ্লানি। এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে আধুনিক সংস্কৃতি বিবর্তন-সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠল। নব্য ।শক্ষিত অধিকাংশ ভাববিপ্লবীর প্রধান লক্ষ্য ছিল পুরাতন সব কিছু ভেঙে নতুনের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। আর প্রাচীনপন্থীরা সংস্কারকামী হলেও জাতীয় ভাবঐতিহ্য সংরক্ষণে হলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে সে এক বিরাট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (action and reaction) যুগ। ভাববিপ্লবীদের ভাঙন প্রবৃত্তির ফলে সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে একটা বিজাতীয় ভাব দেখা দিলেও সাহিত্য ও সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার জগতে যে অমৃত উত্থিত হয়েছিল ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিমাত্রই তা জানেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ভূদেব-রাজনারায়ণের স্থান নতুন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে। এ দুই মনীষী সেদিন উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন সে যুগের ভাববিপ্লবী বাঙালীর ভাঙন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে—অথচ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তাঁদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সৃজ্যমান নব্যযুগের স্পর্শকাতরতা হতে মুক্ত নয়। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাপ্রভাবিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার ফলে বাঙালী জীবনের সুমধুর পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, সামাজিক বন্ধনে চিড় ধরেছে, আর বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি শিক্ষিত বাঙালীকে শিখিয়েছে জাতীয় আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতিকে ঘৃণা করতে। বিচারসহ যুক্তিবাদী বক্তব্যের সাহায্যে এ ভাঙনপ্রবৃত্তিকে বাধা দিয়ে বাঙালীকে আত্মস্থ করবার উদ্দেশ্যে লোকহিতব্রতী ভূদেব রচনা করলেন পরিবারিক প্রবন্ধ (১২৮৮), সামাজিক প্রবন্ধ (১২৯৯), আচার প্রবন্ধ (১২৯৪ ', এবং দুইভাগে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রবন্ধ'। এ রচনাগুলি ঠিক রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কিম্বা অক্ষয় দত্তের জ্ঞান-বিদ্যাভূয়িষ্ঠ প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ কথা মাত্র নয়; তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যকে ভূদেব এখানে রূপ

দিয়াছেন 'প্রকৃষ্ট বন্ধনে' বদ্ধ করে—যা নাকি আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর রাজনারায়ণের সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কীয় ছোট ছোট গ্রন্থ ও রচনার সংকলনকেও রাজনারায়ণ নাম দিয়েছিলেন "বিবিধ প্রবন্ধ" বলে। বাস্তবিকপক্ষে সচেতনভাবে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস ভূদেব রাজনারায়ণের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় নি। সেদিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের এ ধরনের রচনারীতির পথিকৃৎ ভূদেব ও রাজনারায়ণ এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। তাঁদের প্রদর্শিত রচনারীতির ধারা গত শতাব্দীতে পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী লেখকদের প্রবন্ধসাহিত্যে।

স্বজীবনে ভূদেব ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ও সংযমব্রতী। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিতাচার ও সংযম, আর স্ব-ধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা মানুষকে সব রকমের বিরুদ্ধ প্রভাবমুক্ত করে অভ্যুদয়ের পথে চালিত করতে সক্ষম। এ সংযম ও নিষ্ঠা ভূদেবের পৈতৃক শিক্ষা হতে প্রাপ্ত। এ শিক্ষার প্রভাবেই ভূদেব তাঁর যুগের সর্ব প্রকার আচারভ্রষ্টতা হতে নিজেকে রক্ষা করে বিচারমূঢ় জাতির সামনে বিচার-সন্নদ্ধ আধুনিক আদর্শ জীবন-পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। ধর্মহীন শিক্ষা ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—অসংযত জীবন যাপন করার ফলে সে যুগের অনেক প্রতিভাবান বাঙালী যে শুধু পরধর্ম গ্রহণ কিংবা ধর্মসংস্পর্শহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা নয়, প্রবল অমিতাচারের ফলে ভূদেবের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে অনেকের অকালমৃত্যু হয়েছিল, ভূদেবের বন্ধু রাজনারায়ণের বর্ণনা হতে আমরা তা জানতে পারি। সে উন্মার্গগামিতার যুগেও প্রবল আদর্শপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্কম্প দীপশিখার মত ভূদেব কিরূপ অবিচলিত ছিলেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন রাজনারায়ণ। সে বর্ণনায় তিনি ভূদেবকে "সাগর মধ্যস্থিত অটল ভাবে দণ্ডায়মান" পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সংযম, মিতাচার ও আদর্শনিষ্ঠা রাজনারায়ণের জীবনে অভিজ্ঞতা-প্রসূত। তাঁর আত্মজীবনী পাঠে জানা যায়, হিন্দু কলেজে পাঠাভ্যাস-কালে তিনি তাঁর সহপাঠি বন্ধুদের সঙ্গে নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে অপরিমিত মদ্যপান করতেন, এমন কি হেডমাষ্টারের পদ গ্রহণ করে মেদিনীপুরে যাবার

পরও তিনি এ কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এ অমিতাচারের ফলে স্বাস্থ্যহানির পর থেকেই রাজনারায়ণের জীবনে গভীর পরিবর্তন আসে এবং মেদিনীপুরে তিনি "সুরাপান নিবারণী সভা" সংস্থাপন করে সমসাময়িক বাঙালীর এ পাপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। রাজনারায়ণ তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, 'উহা বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত সুরাপান নিবারণী সভা।' (আত্মচরিত, পৃঃ ৮২)। যখন অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী এ পানদোষের দ্বারা সংক্রামিত, তখন তার বিরুদ্ধে প্রায় একক সংগ্রাম ঘোষণা করা যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ আজ তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। বাস্তবিকই এ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের হাতে রাজনারায়ণকে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল প্রচুর। (দ্রষ্টব্য, আত্মচরিত ৮২ পৃঃ)।

প্রখর বাস্তবনিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা ছিল ভূদেব ও রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূলে। সে বিজাতীয় ভাবপ্রবণতার যুগে গভীর দেশাত্মবোধ, স্বজাতিপ্রীতি, স্ব-সাহিত্য, স্ব-ভাষা এবং স্ব-ধর্মপ্রীতি এই বাস্তব-নিষ্ঠা ও সমাজচেতনার অন্যতম লক্ষণ। স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে ভূদেব ও রাজনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন সে যুগের আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন পরানুকারী বাঙালীকে জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারচ্ছন্ন। তাই সরকারী চাকরী করেও ভূদেব মেতেছিলেন দেশের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রচারে, যে শিক্ষা শুধু মানুষের নীতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করে না, মানুষের ধর্মজ্ঞানকেও জাগ্রত করে। দেশের গৌরব-সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন প্রগতিপন্থী বাঙালীর পরিচয় সাধনের জন্য ভূদেব সেদিন একক যে চেষ্টা করেছিলেন তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। সমন্বয়ী আদর্শের শিক্ষা প্রচারে "এডুকেশন গেজেট" ও "শিক্ষা দর্পণের" সম্পাদকরূপে ভূদেব সে পরাশ্রয়ী বিদ্যা ও সংস্কৃতি চর্চার যুগে যে কঠোর শ্রম স্বীকার করেছিলেন তা এ যুগের বাঙালীর ইতিহাসে দুর্লভ। বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু জনৈক গ্রন্থকার সঙ্গতভাবেই ভূদেবকে শিক্ষাপ্রচারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী বলে বর্ণনা করেছেন:—"A more important writer than Devendranath and Rajnarayan was

Bhudev Mukhopadhaya who was···Vidyasagar's successor as an educationist."[১]

শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে ভূদেবের আগ্রহাতিশয্যের বিস্তৃত পরিচয় আছে বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তাঁর রিপোর্টগুলিতে। দেশের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন তিনি নিজের সামর্থ্যানুযায়ী স্কুল কলেজ এবং 'বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করে। সেকালে নবপ্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন সংস্কৃতকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থান দেন তখন ভূদেবের আনন্দের সীমা ছিল না ; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আর্যভাষার অনুশীলনের ফলে বাঙালীর মানসধর্ম পূর্ণতা লাভ করবে—এই হল ভূদেবের আনন্দের কারণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির চিত্তকে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে হলে যেমন স্বদেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন, তেমনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দোষমুক্ত হতে হলে সে বিদ্যার মর্মলোকে পৌঁছানো দরকার। 'আচার প্রবন্ধে'র উপক্রমণিকাধ্যায়ে তিনি লিখেছেন ঃ "যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সে বিজাতীয় শিক্ষার প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ কাটিয়া যায়।"

'ভূদেব চরিত' পাঠে জানা যায়, পিতৃদত্ত শিক্ষার প্রভাবে ভূদেব যেমন আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের অন্তর্লোকে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছিলেন, তেমনি ইউরোপীয় সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দর্শন (প্রাচীন এবং নব্য) প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও তাঁর চিত্তকে করে তুলেছিল আধুনিক জীবনমুখী। ভূদেব চরিতকার ভূদেবের পাঠ্যসীমার বিস্তৃতিবর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "ইংরাজীতে ইউরোপীয়দিগের সকল উৎকৃষ্ট পুস্তকের অনুবাদ পাঠে—সকল বিষয়ের শুষ্ক রিপোর্টের তথ্য সংকলনেও—তাঁহার আনন্দ হইত। স্পেনসার, সোপেনহয়ার, এমার্সন, ডারউইন, ইনটারনেশানেল সায়েন্টিফিক সিরিজ, কণ্টেম্পোরারি সায়ান্স সিরিজ প্রভৃতি শেষ বয়স পর্যন্ত বিষয় নির্বিশেষে সম্পূর্ণ পড়িতেন। দেশীয় 'পুরাণ' এবং দেশ বিদেশের ইতিহাস ধর্মসূত্রের উপর স্থির লক্ষ্য রাখিয়া এত অধিক পরিমাণে আর কেহ পড়িয়াছেন কিনা সন্দেহ।"

১ J. C. Ghosh, Bengali Literature, p. 126.

এ উদার শিক্ষার ফলেই ভূদেব রচনা করেছিলেন গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, আর 'রোমান্স অফ হিস্ট্রী' অবলম্বনে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। স্বদেশী ইতিহাস রচনা না করে বিদেশী ইতিহাস রচনার হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূদেব সক্ষোভে তৎকালীন ডেপুটি ইনেস্‌পেক্টর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন: "গ্রীক, রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটি সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখবার জিনিষ অনেক আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ত দুইটি প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।" [১]

স্বদেশীয় জীবন ও সাধনাকে সংস্কৃতির উদার ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে ভূদেব উত্তেজনাহীন অথচ নিরলস। তাঁর এ সংযত-গম্ভীর সংস্কারক মূর্তিকে লক্ষ্য করে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ভূদেবকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের 'বৈধ স্বদেশী যুগের প্রবর্তক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, উদার শিক্ষার আলোকে নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ—এই-ই হল ভূদেবের মতে আদর্শ জীবনের স্বরূপ। ভূদেবের এ জীবনাদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় ভূদেবের ব্যক্তিত্বের অনুরাগী ব্যক্তিরা তাঁকে "বৈধ স্বদেশী যুগের প্রবর্তক" বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভূদেব-চরিত-কারও তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন: "তিনি স্বধর্মপালন, স্বদেশপ্রীতি, সহৃদয়তা, সমাচার, সৎকর্মে সম্মিলন, স্বাবলম্বন এবং সাত্ত্বিক উদ্যমের প্রচারক।" [২]

রাজনারায়ণের বাল্যশিক্ষায় হিন্দুধর্মপ্রীতির কোন পরিচয় নেই, যৌবনে তিনি স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রৌঢ়ত্বে সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বদা সজাগ। 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণ বলেছেন: "আমি আপনাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে করি।" ধর্ম সম্পর্কে এরকম উদারতা সে যুগে ছিল একান্ত দুর্লভ। ব্রাহ্মরা তাঁর পবিত্র চরিত্র ও উদার ধর্ম-বোধের জন্য তাঁকে 'সমাজে'র আচার্য পদে বরণ করেছিলেন, আর কোন

ভূদেব-চরিত—পৃঃ ১৮৪-১৮৫
ভূদেব-চরিত—অবতরণিকা

কোন হিন্দু তাঁকে 'কলির ব্যাসদেব' এবং 'হিন্দুকুলচূড়ামণি' আখ্যা দিয়েছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রাজনারায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "সে সময়ে হিন্দুসমাজ-ত্যাগীদের সম্পর্কে পুরাতন পন্থীরা অত্যন্ত সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু সম্পর্কে এ সাধারণ মনোবৃত্তির ব্যতিক্রম সকল সময় দেখা যাইত।"[১] শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত পুস্তক হতে আরো জানা যায়, গভীর ও উদার ধর্মবোধের জন্য দেওঘর বাসকালে সে অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করত। তাঁর উদার ব্যক্তিত্বে এমন একটা অবারিত প্রসন্নতা ছিল যে, যে কোন লোক তাঁর সান্নিধ্যে এলেই নিজের সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা না ভুলে পারত না। তাঁর চরিত্রের নিষ্কলুষ মাধুর্য তাঁর বন্ধু নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ভূদেবকে এতটা অভিভূত করেছিল যে তিনি একবার নিজের উপবীত রাজনারায়ণের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: 'রাজনারায়ণ, অব্রাহ্মণকুলে জন্মালেও তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, এ উপবীত তোমার গলাতেই শোভা পায়। তোমার অকৃত্রিম ব্রাহ্মণত্ব আমার ভিতরে সঞ্চারিত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"[২] ধর্মবোধের ক্ষেত্রে এ উদার বিস্তৃতি ও গভীরতার জন্য রাজনারায়ণের সমসাময়িকেরা তাঁকে 'ঋষি'-আখ্যায় সম্মানিত করেছিল।

বাস্তবিকই রাজনারায়ণের ঋষিজনোচিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনের বহু সুচিন্তিত কাজের মধ্যে। সমসাময়িক বাঙালীকে সুরাপানের উন্মত্ত নেশামুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষায় মেদিনীপুরে 'সুরাপান নিবারণী সভা' সংস্থাপনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ আন্দোলন সে কালের মোহগ্রস্ত বাঙালীকে মোহমুক্ত করতে যে সহায়তা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ঋষিদৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে মেদিনীপুরে "জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী" সভা প্রতিষ্ঠায়। এ উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার মাধ্যমে রাজনারায়ণ সচেতনভাবে সে যুগের পরানুকরণ-কারী বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করবার প্রয়াস পান। এ সভার কার্যবিবরণ হতে রাজনারায়ণ "Prospectus of a society for the promotion of national feeling among the educated natives

১ শিবনাথ শাস্ত্রীর Man I have seen-এর অনুবাদ, মায়া রায়, পৃঃ ১০০-১০১

২ ঐ ঐ পৃঃ ১০৩

of Bengal" নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। রাজনারায়ণ নিজেই বলেছেন,—'ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান।' (দ্রঃ রাজনারায়ণের আত্মচরিত—৮১ পৃঃ)। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিক রাজনারায়ণের দেশাত্মবোধের চেতনা ক্রমশঃ "হিন্দুমেলা" ও পরে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে শুধু বাঙালী নয়—সমগ্র ভারতীয় জাতিকে পরবর্তীকালে উন্মত্ত করে তোলে বিদেশী শাসনপাশ থেকে মুক্ত হতে। স্বদেশ-চেতনার ক্ষেত্রে এ দূরদৃষ্টির জন্য রাজনারায়ণকে সঙ্গতভাবেই বলা হয়ে থাকে— "Grandfather of Indian Nationalism."

সে যুগের স্বাতন্ত্র্যবর্জিত পরানুকারী বাঙালী জাতিকে অনুকরণস্পৃহা হতে মুক্ত করবার জন্যে রাজনারায়ণ আরো দুএক ক্ষেত্রে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন তা সে যুগে ছিল অকল্পনীয়। ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের ভাষণে সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষা ব্যবহার তার মধ্যে অন্যতম। সে যুগে শুধু প্রকাশ্য সভাসমিতিতে কেন, দুচারজন শিক্ষিত লোকের সামনেও মাতৃভাষায় কথা বলাকে চরম রুচিহীনতার পরিচয় বলে মনে করা হত। রাজনারায়ণ এ জাতীয়তাবোধহীন পরাণুকারীদের দাস্য প্রবৃত্তিকে তীব্র আঘাত করেন প্রকাশ্য সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে। ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও প্রকাশ্য সভায় মাতৃভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার প্রেরণা দিয়ে রাজনারায়ণ জাতীয়তাবোধহীন বাঙালীর সামনে বাঙালী সংস্কৃতির একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করেছিলেন সেদিন।

একমাত্র "আত্মচরিত" ও "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" ছাড়া রাজনারায়ণের সমস্ত রচনাই তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তৃতার সার সংগ্রহ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা তাঁর "আত্মচরিত" ও বক্তৃতার সারসংগ্রহ "সেকাল আর একাল" বাংলা গদ্যের ইতিহাসে classic সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। যে সমস্ত সমালোচক রাজনারায়ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে না পেরে শুধু তাঁকে ধর্মপ্রচারক হিসেবেই দেখতে পেয়েছেন, তাঁরাও "সেকাল আর একালে"র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।[১] Classic সাহিত্যের যা

[১] Rajnarayan Vasu too was a religious preacher rather than a man of letters, but will be always remembered for the "Sekal ar Ekal" (1874)

অন্যতম প্রধান ধর্ম—চিন্তার স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা (ইংরাজীতে যাকে বলা হয় clarity) তার সঙ্গে নির্মল রসবোধ যুক্ত হয়ে রাজনারায়ণের গদ্য ভঙ্গীকে আধুনিক পাঠকের নিকটও পরম আস্বাদ্য করে তুলেছে। ভূদেবের প্রবন্ধেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য clarity সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ভাষার সুর যেন একটু বেশী গম্ভীর—রাজনারায়ণের বক্তব্যের অন্তরঙ্গ সুর সেখানে নেই। সেজন্য রাজনারায়ণের রচিত উক্ত বই দুখানা এখনও সাহিত্যামোদীর প্রিয়, আর ভূদেবের বহু তথ্যপূর্ণ রচনাগুলি এখন শুধু শিক্ষার্থীর পাঠ্য সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত। রাজনারায়ণের রচনার হৃদ্য সুর বঙ্কিমের বহু প্রবন্ধে আরো যেন স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

ভূদেব ও রাজনারায়ণের আদর্শবোধ ও বাস্তবনিষ্ঠা প্রায় একমুখী হলেও তাঁদের মানসিকতার পরিণতি ছিল ভিন্নমুখী। সমস্ত কর্মজীবনে সমকালীন বাঙালীর পরিবর্তমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের হৃদস্পন্দন অনুভব করলেও শেষ জীবনে রাজনারায়ণ অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি মৃত্যুর পূর্বে দেওঘর বাসকালে "প্রায় সর্বদাই তিনি উপনিষদ, হাফিজ, মাদার গুইয়ান প্রভৃতি মরমিয়া সাধক-সাধিকার গ্রন্থ লইয়াই সময় কাটাইতেন।"[১] আর ভূদেব সমসাময়িক বাঙালীর বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করবার উদ্দেশ্যে বহুদিনের চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে পারিবারিক, সামাজিক, আচার প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেও শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক কল্পনার পাখায় ভর করে রচনা করেছিলেন "ঐতিহাসিক উপন্যাস"। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্গত "অঙ্গুরীয় বিনিময়" অংশে তিনি নারীপ্রেমের তির্যক গতির যে শৈল্পিক রূপ দেন তাই নাকি পরবর্তী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে অনুপ্রাণিত করেছিল ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায়। স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসেও ভূদেবের স্বাভাবিক বাস্তবমুখী দৃষ্টি যেন ধরণীর ধূলি ত্যাগ করে কল্পনার পাখায় ভর

an attractive little account of the changing Bengal of the nineteenth century. J. C. Ghosh, Bengali Literature, p 12.

১ Man I have seen এর অনুবাদ, মায়া রায়, পৃঃ ৯৯

করেছে। যে আত্যন্তিক রোমান্টিক কল্পনার বিস্তার বঙ্কিমের সৃষ্ট উপন্যাসকে অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে তার প্রাথমিক বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখি ভূদেবের কল্পনানির্ভর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে'। একজন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা ভাষায় টেকচাঁদ নয়, ভূদেবই প্রথম যথার্থনামা ঔপন্যাসিক'[১]। বাস্তবিকই টেকচাঁদের "আলালের ঘরের দুলালে" সমসাময়িক জীবন-চিত্রের পরিচয় থাকলেও বইখানিতে উপন্যাসোচিত জীবন-জটিলতার সন্ধান মেলে না; আর "অঙ্গুরীয় বিনিময়ের" ঘটনা সংস্থান খানিকটা ঐতিহাসিক খানিকটা কল্পনাশ্রয়ী হলেও উপন্যাসখানি চিরন্তন জীবন-বেদনায় স্পন্দমান। এখানেই ভূদেব আধুনিক রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত, আর এখানেই ভূদেবের মানসিকতা তাঁর সমধর্মী সুহৃদ রাজনারায়ণের মানসপ্রবৃত্তি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জাতি, ধর্ম, সাহিত্য, মানবতার আদর্শ ও পরিবর্তমান সংস্কৃতি-চেতনা সম্পর্কে ভূদেব-রাজনারায়ণের সুচিন্তিত চিন্তাধারা অনুস্যূত হয়ে আছে তাঁদের রচনার মধ্যে। গত শতাব্দীর এ দুই মনীষীর অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত চিন্তাধারা সংস্কৃতি-জগতে বর্তমান বিভ্রান্ত বাঙালীর সামনে দিক্‌-দর্শনী আলোকরেখার মত; সুতরাং সে চিন্তাধারার পুনরালোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

ভূদেবের জাতীয়তাবোধের তুলনায় রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধে একটা একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী ও সীমাবদ্ধতা ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিজাতীয় ভাবধারার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ জীবনের পট-ভূমিকায় তিনি যে জাতীয় উজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মৌল প্রেরণা ছিল সনাতন হিন্দুসংস্কৃতির জাগরণ। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা"য় (১৮৮৭) তিনি জাতির সর্বপ্রকার অভ্যুদয়ের জন্য যে সংহতি-শক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলে মনে করেছেন, সে হল বিভিন্ন আচারপরায়ণ, মতাবলম্বী এবং বিচিত্র বেশধারী হিন্দুজাতির সংহতি।

[১] ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০

অবশ্য হিন্দু বলতে রাজনারায়ণ বলেছেন : "আমি আমার প্রস্তাবে ব্রাহ্মদিগকে ও বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিয়াছি।" ব্রাহ্মদের মনে করা হত তখন হিন্দুধর্মচ্যুত, আর বিলাতফেরতদের মনে করা হত আচারভ্রষ্ট পতিত। সনাতন হিন্দুসমাজের এই ভাঙনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাজনারায়ণ তাই বৃদ্ধ হিন্দুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন এই বলে : "আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।"

জাতীয় সংহতির জন্য রাজনারায়ণ তাই দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন একটি হিন্দু জাতীয় সভা স্থাপনের জন্যে। "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" পুস্তিকার ভূমিকায় রাজনারায়ণের এ হিন্দু জাতীয়তার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে :

"…মুসলমানদের যেমন National Mahammedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদের Eurasian and Anglo-Indian Association নামক জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়।…হিন্দুদিগের ধর্মসম্বন্ধ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।"[১]

আবেগধর্মী ভাষায় রাজনারায়ণ হিন্দুদের মিলিত হবার জন্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তার ভেতর আমরা বঙ্কিমের হিন্দু রেনেসাঁস-এর দূরাগত ধ্বনি শুনতে পাই :—

"হে হিন্দু মহোদয়গণ! আপনারা এই দারুণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি কোন চেষ্টা করিবেন না?…পুরাকালে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে হিন্দুজাতির যে অগ্রণী পদ ছিল, সে অগ্রণী পদে তাহাকে পুনঃস্থাপিত করিতে কি আপনারা সচেষ্ট হইবে না?"[২]

"আশ্চর্য স্বপ্নে" রাজনারায়ণ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতেও দেখি হিন্দুধর্ম

১ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড, রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৮৭

২ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৮৯

প্রসারের কথা ;—"দেখিলাম অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছে, এবং পল্লীগ্রামের যে সকল চয্য তাহা অবলম্বন করে না তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা গ্রাম্য (pagan) এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন।"[১] তাঁর "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক বক্তৃতারও মূল বক্তব্য ছিল যে "ঋগ্‌বেদের সময়ের হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মণাধিকারে পরিণত হইয়াছে" সে হিন্দুধর্মের গৌরব ব্যাখ্যান। জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় করবার জন্যে রাজনারায়ণ যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন তাও সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দুদের মিলনে একটা অখণ্ড হিন্দু সম্মেলন :

"……ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।"—(আত্মচরিত, পৃঃ ৯৪-৯৫)

রাজনারায়ণের সমকালেই বাঙালী হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মসভা যখন পশ্চিমের "ভারতধরম" মহামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটি অখণ্ড হিন্দু সমিতি গঠন করে তখন "বৃদ্ধ হিন্দু" রাজনারায়ণের আনন্দের সীমা ছিল না। স্বীয় আত্মচরিতের ৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "বাঙালী ও হিন্দুস্থানীদের সংযোগে সংরচিত অভিনব সভা আমার প্রস্তাবিত মহাহিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে।"

বলা বাহুল্য রাজনারায়ণের এ হিন্দুজাতীয়তাবোধ তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী হিন্দু-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে (Hindu Revival) যে গতিবেগের সঞ্চার করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর জাতীয়তাবোধের সীমাবদ্ধতার কথা বহু মনীষীর দ্বারা স্বীকৃত। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল এ সম্পর্কে লিখেছেন :—"এই সংকীর্ণ স্বদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়।[২]

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হলেও ভূদেবের জাতীয়তাবোধে ছিল একটা প্রসন্ন উদারতা

১ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড, রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৮৩

২ বিপিনচন্দ্র পাল, বাংলার নবযুগ, পৃঃ ১৪১

যা সে যুগের পক্ষে ছিল প্রায় অকল্পনীয়। বাঙালী বলতে তিনি বুঝতেন হিন্দু ও মুসলমানের সমবায়ে একটি মিশ্র জাতি—মুসলমানেরাও হিন্দুর মত সে জাতিদেহের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রত্যঙ্গ। তিনি বলতেন—"হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাই উভয়ে এখন একদেশবাসী, সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়েই পুষ্ট, ফলতঃ উহারা "দুধ ভাই"।[১]

পাঠ্যাবস্থায় মধুসূদনের মত মৌলভি আবদুল লতিফ খাঁ-ও (যিনি পরে নবাব বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধিধারী হয়েছিলেন) ছিলেন ভূদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উত্তরকালে কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা এবং স্কুল পরিদর্শকের কাজ করবার সময় ভূদেব অনেক উদারচেতা মুসলমানের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের অনেকের চরিত্রমাধুর্য দেখে মুসলমান সমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেন। এ শ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাঁর বাঙালী-জাতীয়তাবোধের ধারণার প্রসার। এ উদার ধারণাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল ভারতের মুসলমান অধিকারের ইতিবৃত্তের মর্মলোকে প্রবেশ করতে; আর এ গভীরতর প্রেরণার ফলেই তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন বাংলা দেশ তথা ভারতের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে। ভূদেবের এ ইতিহাস-চেতনা ও প্রতিবেশী অনগ্রসর মুসলমানদের প্রতি অতলস্পর্শ সহানুভূতির পরিচয় রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "সামাজিক প্রবন্ধের" বিভিন্ন স্থানে।

উদার মানসিকতার অধিকারী ভূদেব ভারতে মুসলমান অধিকারের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

"মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্বপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্যশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সংযত হইয়াছে এবং সৌজন্যনীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহাঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব সুবা এবং বাদশাহ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাহারা অন্যায়চারী ছিলেন তাহাদিগের

১ ভূদেব-চরিত, পৃঃ ১৪৪

অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটি ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।”

[সামাজিক প্রবন্ধ—ভারতবর্ষে মুসলমান]

মহম্মদ এবং আয়েসা অথবা আলি এবং ফতেমার চরিত্রের মাহাত্ম্য দেখে—"পাশ্চাত্ত্যভাব—উন্নতিশীলতা" নামক প্রবন্ধে ভূদেব লিখেছেন :—"ঐ আদর্শ চরিত্রের প্রতি মুসলমানদিগের প্রীতি ভক্তিও অতি তেজস্বিনী এবং তাহাদের চেষ্টা শক্তিও নিতান্ত অল্প নয়। এই সকল কারণে মুসলমানজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা পঞ্চম সূত্রের দ্বারা বিচার্য, উহা সজীব।"

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ভূদেব বর্ণভেদের সমর্থক হলেও তাঁর সহৃদয় অন্তরের উদার জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় ভিন্নধর্মী মুসলমানকে ভারতসমাজের অন্তর্গত একটি বর্ণ হিসাবে স্বীকার করতে ইচ্ছুক। "ভারতবর্ষে মুসলমান" প্রবন্ধে তিনি বলছেন,—"জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণভাবে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয় কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটা বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

বলা বাহুল্য ভারতীয় সমাজ গঠনে ভূদেবের এ স্বপ্ন সফল হয়নি, এবং সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ ভূদেবের উত্তরসূরী মনীষিদের অন্তরে এ উদার জাতীয়তাবোধের অভাব। মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর এ উদারতার অভাবই পরবর্তীকালে বাঙালী তথা ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানকে হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে—এ ত ঐতিহাসিক ঘটনা।

শুধু প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি নয়, ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও ভূদেব প্রশংসনীয় সমদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। "সামাজিক প্রবন্ধে"র অন্তর্গত 'কর্তব্য নির্ণয়—সূত্র নির্ধারণ' নামক প্রবন্ধে ভূদেব লিখছেন :

"প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদি ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতির

সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্মাবলম্বীদিগকে অতি অল্প আয়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।”

বৃহত্তর ভারতীয় জাতি গঠন স্বপ্নে এখানে ভূদেব আধুনিক দৃষ্টিস্নানে স্নাত রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী।

ভূদেব যে শুধু মুসলমানদের জীবনাদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন তা নয়, মুসলমানদের ব্যবহৃত বহুপ্রচলিত হিন্দু-হিন্দুস্থানী ভাষার বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কেও ছিলেন প্রবল আশাবাদী। সামাজিক প্রবন্ধের—“ভবিষ্যবিচার, ভারতবর্ষের কথা—ভাষা বিষয়ক” নামক প্রবন্ধে ভূদেব বলছেন :

“ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যৎকালে ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।”

বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূদেবের এ ভবিষ্যৎ বাণী যে আজ বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে চলেছে তা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। রাজনারায়ণ যেখানে ভারতীয় জাতির ঐক্যবিধানের জন্য স্বপ্ন দেখছিলেন একটা অখণ্ড হিন্দু সমিতির, ভূদেবের দূরাবগাহী চিন্তা সে যায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুসলমানদের ব্যবহৃত বহুপ্রচলিত হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা দানে। রাজনারায়ণের তুলনায় এখানে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিকতা আমাদের বিস্মিত করে।

কিন্তু সমাজসংস্কারের কোন কোন ক্ষেত্রে ভূদেবের দৃষ্টিকে আপাতঃদৃষ্টিতে রাজনারায়ণের দৃষ্টিবিচারে রক্ষণশীল বলেই মনে হবে। সমসাময়িক বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে এ উভয় মনীষীর দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রতি শুধু মৌখিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, সে যুগের এ প্রগতিশীল আন্দোলনে একটি সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছিলেন। এ সংস্কারমূলক আন্দোলনকে সার্থক করে তোলবার ঐকান্তিক অভিপ্রায়ে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের দু ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ

দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণের "আত্মচরিত" পাঠে জানা যায় এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি নিজের গ্রামবাসী ও শ্রদ্ধেয়া মাতা-ঠাকুরাণীর যথেষ্ট বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর গ্রামবাসীরা তাঁকে শাসিয়েছিল: "রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আইলে আমরা ইঁট মারিব।" উত্তরে দৃঢ়চেতা রাজনারায়ণ বলেছিলেন:—"তাহা হইলে আমি খুশী হইব, আমি বাঙালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদের বিধবা-বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবা-বিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ প্রবল হইবে।" (দ্রষ্টব্য, আত্মচরিত, ৯৮ পৃঃ)।

ভূদেবের সমগ্র জীবন ছিল সংযম-পূত ও নিয়মনিষ্ঠ। বিধাতা যাকে একবার স্বামী সুখে বঞ্চিত করেছেন সে নারীর পুনরায় বিবাহকে তিনি ভোগস্পৃহার নামান্তর বলে মনে করতেন। ভূদেব বলতেন, "নিবৃত্তি মার্গে এবং সংযমের পথেই ভারতবর্ষের সকল শ্রেণী উন্নত হইবে, অন্য পথে কতক লোককে লইয়া গেলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সমাজ আরো দুর্বল হইবে মাত্র।" (ভূদেব-চরিত, ১৮৬ পৃঃ)। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন-প্রচেষ্টার উৎসমূলে তিনি দেখতে পেতেন আন্দোলনকারীর কোমল হৃদয়ের প্রবল আবেগধর্ম, আর পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদী মতবাদের প্রভাব। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে স্বীয় মতকে তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন দৃঢ় যুক্তিবাদের ওপর। "পারিবারিক প্রবন্ধে—"দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ"—প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

—"যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয় তবে সে প্রকৃত আশ্রম-ভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার তাহা হইলে না পার কি?···একপক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। এ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাতেই কর্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে, পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোমতের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই

একাধিকবার বিবাহ করিবে না। আমাদিগের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না।"

স্বদেশানুরাগের দিক দিয়ে ভূদেব ও রাজনারায়ণ সমধর্মী। দেশসেবা ও লোকসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনারায়ণ লোভনীয় সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি, আর সরকারী চাকরি গ্রহণ করেও ভূদেব কখনও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান হারান নি। উভয় মনীষীর সুগভীর দেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন অনগ্রসর জাতির জন্য গঠনমূলক কর্মপন্থা (Constructive programme) প্রণয়নে—বিপ্লবের পথে দুজনের মধ্যে কেউ-ই অগ্রসর হননি। জাতির উদ্দেশ্যে এ গঠনমূলক কর্মপন্থা নির্ধারণের পরিচয় রয়েছে রাজনারায়ণের স্মরণীয় গ্রন্থ "সেকাল আর একালে", এবং ভূদেব-সম্পাদিত "শিক্ষা দর্পণ" ও "এডুকেশন গেজেটের" পাতায় পাতায়।

অনুকরণস্পৃহ সেকালের বাঙালীকে ইংরাজের হীন অনুকরণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে রাজনারায়ণ যে সমস্ত যুক্তিতর্ক ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন তা শুধু শিক্ষাপ্রদ নয়, পরম উপভোগ্য। এ গ্রন্থের প্রারম্ভেই রাজনারায়ণ বলছেন :—"কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।" স্বাতন্ত্র্যবোধহীন অন্তঃসারশূন্য বাঙালীর বাহ্যিক আড়ম্বরের বর্ণনা প্রসঙ্গে সুরসিক রাজনারায়ণ বলছেন :—"বাহিরে সেকস্‌পীয়ার, মিলটন ও ডিফারেনশিয়ল কেলকুলসের চাকচিক্য, ভিতরে সব ভুও।" আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগে বাঙালীর কর্মোদ্যমের অভাব দেখে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন: "শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে।" বাঙালীর পোষাক-পরিচ্ছদে সমতার অভাব দেখে রাজনারায়ণ সখেদে লিখেছিলেন: "প্রত্যেক জাতিরই একটা নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই।…বস্তুত ঐক্য না থাকিলে প্রকৃত জাতিত্ব কিরূপে সংগঠিত হইবে?" সমকালীন বিকৃত সভ্যতার রূপ দেখে একটা চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন রাজনারায়ণ :—"যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে

থাকে।” সমকালীন বাঙালী সভ্যতার এর চাইতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর কি হতে পারে? ধর্মহীন শিক্ষা ও সভ্যতার কুফল বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলেছেন : “ধর্ম সমাজরক্ষার পত্তনভূমি। যে সমাজে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে সমাজের কি উন্নতি আশা করা যাইতে পারে?” [উক্ত উদ্ধৃতিগুলি ‘সেকাল আর একাল’ হতে]।

ভূদেবের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংবাদিকের নানামুখী সচেতন বিষয়নিষ্ঠা ও সুগভীর ইতিহাস-চেতনা। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখবার সময় ও সুযোগ না থাকলেও দেশবাসীর স্বদেশপ্রেম উদ্দীপনার জন্যে এরূপ ইতিহাস রচনার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ভূদেব বলেছিলেন :—“ভারতবর্ষের রীতিমত ইতিহাস লেখা হওয়ার জন্য এখন স্বদেশভক্ত এবং স্বধর্মভক্ত লোকদিগের দ্বারা উপকরণ সংগ্রহ করার সময় আসিয়াছে। (দ্রষ্টব্য, ভূদেব চরিত, ১৮৩ পৃঃ)। ভূদেবের মতে জাতীয় উন্নতির সব চাইতে বড় অন্তরায় হল ‘স্বধর্মী বিদ্বেষ’ ও ‘স্বদেশী বিদ্বেষ’। “আধুনিক কালের ‘সাধারণ’ হিন্দু অন্ত্যজের সুখে দুঃখে, শিক্ষায় দীক্ষায় উদাসীন।” তিনি বিশ্বাস করতেন শিখ ও মারাঠারা “ভারতে একচ্ছত্র মহারাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশ-পীড়ন পাপ জন্য তাহা করিতে পারিল না।” (ভূদেব-চরিত ১৮৬ পৃঃ)। “অঙ্গুরী-বিনিময়ে” ভূদেব বলেছেন : “জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি—এ তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গো-বধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।” এখানে ভূদেবের স্বদেশ-প্রেম আবেগধর্মী। ভূদেবের প্রগাঢ় ‘স্বধর্মভক্তি ও স্বদেশভক্তি এবং সাধক-সুলভ ভবিষ্যদর্শন’ অনুস্যূত হয়ে আছে তাঁর “ঐতিহাসিক উপন্যাস” এবং “পুষ্পাঞ্জলি”তে। ভূদেব-চরিতকার লিখেছেন, “যখন অঙ্গুরী বিনিময় প্রকাশিত হইয়াছিল তখন ‘দেশের কথা’ অপর কেহই ভাবিতে পারে নাই।” (পৃঃ ১৯৬)। কথাটার মধ্যে একটু আতিশয্য আছে, বলা উচিত ছিল এত গভীর ভাবে কেউ ভাবে নি। ভূদেবের অনির্বাণ স্বদেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের আরো অনেক কথা ‘ভূদেব-চরিতে’র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

‘শিক্ষাদর্পণে’ ভূদেবের স্বদেশভাবনা বহুমুখী। দেশবাসীর তৎকালীন

ইতিহাস বিমুখতার কারণ নির্ণয়প্রসঙ্গে ভূদেব বলেন: "আমাদের দেশের প্রকৃত ঐতিবৃত্তিক বিবরণ এ পর্যন্ত কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। তাহা না হওয়ার কারণ দেশীয় লোকের কুসংস্কার এবং গভর্ণমেণ্টের ভয়।" মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে ভূদেব লিখেছিলেন :—"মনুষ্যের ধর্মকেই মনুষ্যত্ব বলে।...মনের জোরই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।...এই মনের জোরেই মনুষ্যেরা ঈপ্সিত লাভ করিতে পারে।"—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় উন্নতি বিষয়ে ভূদেবের মত এখনও গ্রহণযোগ্য: "বাংলা ভাষার এই প্রথম অভ্যুদয় কাল। কিন্তু ইহাতে সারল্য ও স্বভাবোক্তির প্রতি লক্ষ্য না হইয়া শব্দালঙ্কারের প্রতি সমধিক প্রীতি লক্ষ্য হইয়া থাকে।" [এক্ষণে সংস্কৃত হইতে শব্দাড়ম্বরের অনেকটা হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজী ধরণে এবং অবোধ্যভাবে পদবিন্যাসের আগ্রহ কাহারো কাহারো রচনায় অত্যধিক। মন্তব্য—ভূদেব চরিতকারের।] "ইংরাজের প্রাধান্যের হেতু বিদ্যাও নয়, বুদ্ধিও নয়, ধর্মশীলতাও নয়। ইহাদের প্রাধান্যের হেতু এই যে, উহারা ভাঙা মানুষ নহে—উহারা গোটা মানুষ।" ইংরেজের ব্যক্তিত্ব বিচারে ভূদেবের দৃষ্টি অভ্রান্ত।

"সাহেবদের স্থানে শিক্ষা করায় হানি নাই; অনেক উপকারই আছে; কিন্তু একেবারে সাহেব হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত আত্মগৌরববিহীন ব্যক্তির কার্য।" এখানে ভূদেব রাজনারায়ণের সেই 'গ্রহণে'র কথাই বলেছেন, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ নয়। "এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অনুচিকীর্ষার প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে তাহারও একটি কারণ স্বদেশ বিষয়ক অনভিজ্ঞতা।" —এখানেও ভূদেব ও রাজনারায়ণ একমত। "গভর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির উপায় না দেখিয়া ব্যয় লাঘব করিবার পথ দেখুন। সৈন্য সংখ্যা কিছু কম করুন।... বড় বড় কর্মচারীদের বেতন কিঞ্চিন্ন্যূন করুন—দরবারী এবং বারবরদারী খরচ যাহাতে কমে তাহা করুন...।" আদর্শ রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক উক্ত মন্তব্য এখনও সমভাবে প্রযোজ্য। "বিড়াল পাতের নিকট থাকুক—মেঁও মেঁও করুক—মাছের কাঁটা খাক—কিন্তু সিবিল সার্বিসের দিকে নুলো বাড়াইলেই চপেটাঘাত।"—তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনায় ভূদেব এখানে রাজনারায়ণকে অতিক্রম করে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন বঙ্কিমের কমলাকান্তের সঙ্গে।

৬

সাহিত্যে নবসৃষ্টি সূচনা ঃ নাটক ॥ সৃষ্টিবেদনা ॥

রামনারায়ণ

সেক্‌স্‌পীয়রের যুগের ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতে গিয়ে দুটি মৌল প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়েছেন একজন ইংরাজ লেখক। এ প্রবৃত্তির একটি হল Self-reliance অপরটি Self-expression. ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগ্রত বাঙালী চরিত্র-বিশ্লেষণেও এ দুটি বৈশিষ্ট্য সমভাবে আমাদের চোখে পড়ে। এ যুগের বাঙালীও ষোড়শ শতকের নবভাবে উদ্দীপ্ত ইংরাজের মত অধীর হয়ে উঠেছিল যা কিছু পুরাতন, যা কিছু সনাতন তাকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হতে বিদায় দিয়ে নতুন কিছুর সৃজন চেতনায়। ফলে য়ুরোপীয় প্রথায় সৃষ্টি হল জীবনসংস্পর্শহীন গীতপ্রধান যাত্রাপালার স্থলে জীবনাশ্রয়ী বাংলা নাট্যকলার। বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজিত হল। সেক্‌স্‌পীয়রের যুগের মত সাহিত্য ও সংস্কৃতির এ যুগকেও বলা চলে—"It was an age of intense curiosity and exuberant joy of life."

একটা প্রবল মানবতাবোধের (humanism) চেতনায় সনাতন ঘুন-ধরা হিন্দুসমাজের নিষ্ঠুর চক্রতলে নিষ্পেষিত মানুষের পুনর্মূল্য নির্ধারণ চেষ্টা চলছে তখন সে যুগে। এ প্রচেষ্টার প্রথম ফল আজীবন সংগ্রামী নারীদরদী রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিবারণ। তারপর আমরা দেখি একই মানবতাবোধের চেতনা চিরবিপ্লবী বিদ্যাসাগরকে মাতিয়ে তুলেছে কৌলিন্য-প্রথার মূলে আঘাত হানতে। এ প্রচেষ্টার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল কুলীন বিধবাকে পুনরায় বিবাহ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অক্লান্ত প্রয়াস। শুধু বিদ্রোহী কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে নয়, বিদ্যাসাগরের সবল লেখনীর মুখেও বেজে উঠেছে সংস্কারান্ধ হিন্দুসমাজের এ নির্মমতার

বিরুদ্ধে বিপ্লবের পাঞ্চজন্য শঙ্খ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আবেগপ্লুত হৃদয়ের ভাষা বড় গুরুগম্ভীর, আর যুক্তিতর্কে ভরা ;—সে সাড়ম্বর হৃদয়াবেগ সমকালীন শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্পর্শ করলেও তা ছিল অশিক্ষিত জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে। তাঁর অনুভূতিগভীর অন্তরের বেদনার বাণীকে জনচিত্তের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে সে যুগে প্রয়োজন ছিল একজন দরদী জীবনশিল্পীর। রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা সাহিত্যের সে জীবনশিল্পী যিনি বিদ্যাসাগরের অন্তরপ্রবাহিত সে বেদনার ফল্গুধারাকে আরো মুখর করে তুলেছেন আপন হৃদয়ের সহানুভূতির স্পর্শে। শুধু মুখর বললে বোধ হয় বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না, বলা উচিত নিজের স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য দিয়ে সে আবেগগভীর হৃদয়ানুভূতিকে রসাপ্লুত করে তুলেছেন। সেজন্যে রামনারায়ণের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পূর্বে অনুবাদাশ্রিত বাংলা নাটক রচিত হলেও মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত হতে পরবর্তী প্রায় সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাসকার তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকখানিকে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক বলে অভিহিত করেছেন।[১] কালানুক্রমের দিক দিয়ে প্রথম না হলেও জীবনাশ্রয়ী মৌলিক নাটক হিসেবে নাটকখানি যে পূর্বসূরীত্বের দাবী করতে পারে তা নিঃসন্দেহ [রচনাকাল ১৮৫৪]।

নাট্যসাহিত্য বিচারে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' মূল্যহীন বলে মনে হবে নিশ্চয়ই, কারণ নাটকে সুসবদ্ধ কোন প্লট নেই, ঘটনাপ্রবাহকে একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত করাও হয়নি, চরিত্রের বিকাশও স্বাভাবিক নয়, এবং নাটকে চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যে গতিশীল সংলাপের প্রয়োজন তারও অভাব দেখা যায় নাটকখানিতে। এসব দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা চলে, এ নাটকখানি আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আলোকস্তম্ভ—যুগান্তরকারী (epoch-making) নাটক। বহুযুগসঞ্চিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমকালীন বাংলা দেশের জনচিত্তে যে বিক্ষোভের তরঙ্গ উঠেছিল তার বাণীরূপ হল এ নাটকখানি—একটা যুগ-

১ The Kulin Kulsarvaswa Natak written by Ramnarayan Tarkaratna in 1854 may be considered as the first dramatic work in the Bengali Language.—R. C. Dutt, Bengali Literature.

চেতনার পরিচয়বাহী বলে নাটকখানিকে বলা চলে আলোকস্তম্ভ; আর দ্বিতীয়তঃ, নাট্যকারের সুস্পষ্ট সমাজচেতনা সে যুগের বহু নাট্যকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জীবনসচেতন নাটক রচনায় ;—সে হিসেবে নাটকখানি নিঃসন্দেহে যুগান্তরকারী।

সে যুগের নাট্যান্দোলন ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পাঠে জানা যায় নাটকখানি বারে বারে অভিনীত হয়েছে কলকাতা এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন নাট্যামোদী বিত্তবান ব্যক্তির গৃহে, আর এই নাটকের সজীব অভিনয় সৃষ্টি করেছে দর্শকদের মনে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার। ১৮৫৮ সনের ২২শে মার্চ বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাড়ীতে নাটকখানির যে অভিনয় হয়, তাতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির মত সে যুগের গণ্যমান্য বাঙালী। কলকাতায় এ অভিনয় হল নাটকটির তৃতীয় অভিনয়। নাটকীয় গুণের অভাব সত্ত্বেও সে যুগের প্রগতিশীল বাঙালীর নিকট নাটকখানি যে কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তার পুনঃ পুনঃ অভিনয়ই তার প্রমাণ। আর মফঃস্বল অঞ্চলে (চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ীতে ১৮৫৮ সালের ৩রা জুলাই অভিনীত) এ সংস্কারধর্মী নাটকখানির অভিনয় যে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় সে বছরের ১৫ই জুলাইয়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় :—

"The acting of the Kulinkulasarvaswa at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Kulins of the locality......The acting took place in the house of a gentleman of the Baniya caste, and Kulin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind."

নাটকখানির আলোচনাপ্রসঙ্গে আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : নাটকে পুরুষ চরিত্রের সংলাপ অত্যন্ত গুরুভার; সে সংলাপের ওপর সে যুগের উচ্চ কোটির গদ্য রচনারীতির প্রভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ নারী চরিত্রের মুখে যে সংলাপ যোজনা করেছিলেন তা নিখুঁত কথ্যভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক—লেখকের অকৃত্রিম বেদনার শোণিতরাগে রঞ্জিত। মানবজীবনের প্রতি

যে বেদনাবোধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার স্তরে উন্নীত করেছে তার সর্বপ্রথম বাণীকার হলেন রামনারায়ণ। রামনারায়ণের কল্পনার মানসী কুলীন কন্যা যখন বলে ;—

'যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।
একে ত অবলা বালা তাহে কুলনারী॥
বিফল বিফলে যায় যৌবন বাহিয়ে।
কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে॥

* * *

জর জর হলো তনু কোকিলের রবে।
কেমনে এমন কালে জাতিকুল রবে॥

কু. কু. সর্বস্ব, পৃ, ৪১, ৪২

কিংবা স্বামীসোহাগবঞ্চিতা কুলীনপত্নী ফুলকুমারীর মর্মভেদী হাহাকার যখন ধ্বনিত হয় লেখকের বেদনারঞ্জিত ভাষায় :

একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়া।
নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

তখন কামিনী বা ফুলকুমারীর যৌবন-বেদনাও সহৃদয় পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। যে অপূর্ব শিল্পকৌশলে স্বল্প রেখায় শিল্পী বঙ্কিম স্বামীসোহাগ-বঞ্চিতা শ্যামাসুন্দরীর জীবন্ত আলেখ্যখানি অঙ্কিত করেছিলেন সে শিল্প-কৌশল হয়ত রামনারায়ণের আয়ত্তে ছিল না; কিন্তু উভয় লেখকের শিল্পরচনার উৎস বেদনাহত একই নারী-অন্তর। বঞ্চিতা নারী-অন্তরের এ বেদনা যখন আমাদের অন্তরে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দেয় তখন আমরা যেন ক্ষণিকের জন্য ভুলে যাই আঙ্গিকের দিক দিয়ে নাটকখানি নিখুঁত কি না, কিংবা শুধুমাত্র পুরস্কার পাওয়ার লোভে লেখক নাটক রচনায় উদ্যত হয়েছিলেন কি না। বরং আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে আজন্মবর্ধিত পণ্ডিতের সমকালীন জীবন-সমস্যার প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং স্বীয় সৃষ্টির সঙ্গে নাট্যকারের সহমর্মিতা দেখে।

রামনারায়ণের নাট্যাঙ্গিকের বিবর্তন রেখা খুবই স্পষ্ট। ১৮৬৬ সনে

প্রকাশিত তাঁর "বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটকে" যে টেকনিক অনুসৃত হয়েছে তার সঙ্গে 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র ব্যবধান প্রচুর। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' বিষয়গৌরবে গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার ছায়াপাতে উজ্জ্বল হলেও আসলে প্রকৃতিবিচারে বইখানিকে ব্যঙ্গ জাতীয় নকসা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু নবনাটকে তিনি যে গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তাতে নাটকখানিকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে বোধ হয় বাধা নেই। এ নাটকখানি প্রকাশের আগেই মধুসূদনের সমস্ত নাটক এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী'ও প্রকাশিত হয়েছে। এ অবস্থায় রামনারায়ণ সমসাময়িক নাটকের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য কি তা লক্ষ্য করেছিলেন, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। শুধু লক্ষ্য করা নয়, নিজের অলক্ষ্যে হয়ত বা তিনি সমকালীন সার্থক নাট্যকারের নাট্যকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও থাকবেন। নবনাটকের পরিসমাপ্তিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রামনারায়ণ যে ট্র্যাজিক রস সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন তা খুব সম্ভব দীনবন্ধুর নীলদর্পণের অনুসরণে। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এ যুগ-স্বীকৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

সংলাপ রচনার দিক দিয়েও এ নাটকে উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রামনারায়ণ। এ নাটকের সংলাপ পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় অনেক বেশী লঘু ও গতিশীল। এ ছাড়া স্ত্রী চরিত্রের উক্তিগুলি যেন আরও বেশী সজীব ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে নাটকের প্রথম অঙ্কের ভগি নামক একটি চরিত্রের স্বগতোক্তি উদ্ধারযোগ্য :

ভগি (স্বগত)—বাসনগুলো ধোয়া হলো—আবার যাই, অনেক কাজ গলায়, আর পারিও না—একজনে কি এতো পারে? বামন বাড়ীর চাকরী—এট্টি পয়সাওতো উপরি পাবার যো নাই! কেবল খেটেই মরো, ভাল চাকরি পেয়েছি। (আগমন করত দেখিয়া) ও কেও দাঁড়িয়ে, সারি না? (প্রকাশ্যে) ও সাবি, সাবি, মর্—কথা কস্ না, অহঙ্কারেই গ্যালেন, এত ডাক্‌চি উত্তর নেই। ও সাবি—সাবি—মর্, ডাক্‌চি শোন্।

সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিতন্মন্য নগরবাসী বাঙালীর পরানুকরণ স্পৃহার প্রতি রামনারায়ণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও নাটকের মধ্যে কম উপভোগ্য হয়নি। এ সমস্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক সংলাপের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি রামনারায়ণের অকুণ্ঠ প্রীতি লেখকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তৃতীয় অঙ্কের এ ধরণের সংলাপ উদ্ধার যোগ্য :

নাগর :—হ্যাঁ,—এখন আমার হেল্‌থ মাচ্‌ ইম্প্রুভ্‌ড্‌ বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার কলকাতায় ছিলাম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি, তাই ষ্ট্রং ফিল্‌ কচ্চিনে। তা' ভাই তুমি একটু ওয়েট কর; আমার একটি ফ্রেণ্ড্‌ আসবে, দেখি আসছে কি না (পশ্চাদবর্তনে প্রস্থান)।

গ্রাম্য :—(স্বগত) হরি বোল হরি! ওর সে পীড়া সাল্যে কি হবে! মাতৃভাষায় অরুচি, এই একটি মহৎ পীড়ান্তর উপস্থিত ;.........

গ্রাম্য :—ঐ আবার হলো—তাই বাঙালী ধুতি চাদর পর্যে একটি টুপি মাথায় দিলে যেমন হাস্যস্পদ হয় বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরাজী কথা দু' একটা প্রবেশ করলেও সেরূপ হয়ে ওঠে, ও বড় খারাপ।

সে যুগের স্বল্প ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী বাবুদের পরানুকরণ স্পৃহার প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীর ছুঁড়ে তাদের আত্মস্থ করবার চেষ্টায় রামনারায়ণ এখানে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমগোত্রীয়—যেমন সমাজ-সংস্কার চেতনায় তিনি সমগোত্রীয় বিদ্যাসাগরের। যে প্রবল জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে ভূদেব-রাজনারায়ণ-শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষী সচেতনভাবে মাতৃভাষা ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার পুনরুজ্জীবনের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সে আদর্শের প্রতি উন্মুখতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণের লেখনীকেও যে উদ্যত করেছিল তা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। শুধু নাটকের মাধ্যমে নয়, জীবনাশ্রয়ী নাটক রচনার পূর্বেও দেখা যায় পণ্ডিত রামনারায়ণ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন ইংরাজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চা করতে :—

"তোমরা যেমন মনযোগপূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাংলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাংলার প্রতি কদাচ অনাস্থা রাখিবে না। বাংলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।" [১]

মাতৃভাষার প্রতি এ সশ্রদ্ধ মনোভাবই রসরূপ পেয়েছে রামনারায়ণের নবনাটকে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নব নাট্যপরিকল্পনা—ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ নাটকের প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নব নাটকের প্রস্তাবনায় যেমন সূত্রধার, নটি প্রভৃতিকে উপস্থিত করা হয়েছে, তেমনি সমাপ্তিতেও দেখি সূত্রধারের জবানীতে নাটকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে :

সূত্র : সভ্য মহোদয়বর্গ, আপনারা গুণগ্রাহী, এ নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথার অনুমোদন করবেন? ও দুষ্প্রথা আর রাখতে যাবেন? যাতে ওই নানা দোষকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হইতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না? যদি করেন আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকর্তা কৃতার্থ হন, এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলো তাঁরাও কৃতার্থ হন।"

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সত্বেও সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ এখানে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন। যে সংস্কারপ্রবৃত্তি ও প্রচারধর্মিতা বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রবন্ধকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, রামনারায়ণের সৃষ্টিমূলক রচনায়ও সে প্রচারধর্মের প্রাধান্য। তবে রামনারায়ণের শিল্পসৃষ্টির অপূর্ণতার স্বপক্ষে শুধু একথা বলা যায় যে, সংস্কার-যুগে প্রচারধর্মিতাই ছিল লেখকের একটি বিশেষ প্রবৃত্তি। এমন কি রামনারায়ণ হতে অধিকতর শক্তিশালী শিল্পী দীনবন্ধুর নাটক ও বঙ্কিমের বহু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসও এ প্রচারধর্মিতা হতে মুক্ত নয়।

১ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, পৃঃ ৮

নবনাটকও কুলীনকুলসর্বস্বের মত ফরমায়েসি রচনা সন্দেহ নেই ; কিন্তু ফরমায়েসি রচনা হলেও এ নাটকে নাট্যকারের কৃতিত্ব অনেকটা অব্যাহত। সমসাময়িক জীবনসমস্যার প্রতি লেখকের আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শে নাট্যপরিবেশটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাটকটি পড়তে পড়তে আমাদের মনেই থাকে না যে সেটি একটি ফরমায়েসি রচনা। তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য, লেখকের সচেতন প্রচারধর্মিতা নাট্যরস সৃষ্টিতে বহুস্থানে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম শিল্পী রামনারায়ণ ; অতএব তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে ত্রুটি বিচ্যুতি অপরিহার্য। মাইকেল বা দীনবন্ধুর মত ইংরাজী নাট্যসাহিত্য ও নাট্যোন্দোলনের সঙ্গে রামনারায়ণের পরিচয় ছিল না ; হাতের কাছে যে উপাদান তিনি পেয়েছিলেন, স্বাভাবিক নাট্যপ্রতিভার সাহায্যে সে উপাদান নিয়ে শিল্পী নবসৃষ্টির আনন্দে মেতেছিলেন। সেকালের নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাবার জন্যে অতি দ্রুত তাঁকে রচনাকার্য সমাপ্ত করতে হত। এ অবস্থায় নাটকের উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখা সব সময় সম্ভব হত না। জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে কোন গভীর চিন্তা বা অনুধ্যান নেই, শুধু মাত্র রঙ্গভরেই তিনি যেন একটির পর একটি নাটক রচনা করে চলেছেন। রামনারায়ণের এ স্বাভাবিক নাট্যপ্রতিভাকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী সকৌতুকে তাঁকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' আখ্যা দিয়েছিল।

ক্ষুদ্র প্রহসন 'উভয় সংকটে'-ও রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সমসাময়িক হিন্দুর বহুবিধবাপ্রথাকে আক্রমণ করেছেন রামনারায়ণ। আর দুখানি প্রহসন—'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এবং 'চক্ষুদান' পুরুষের লাম্পট্যব্যাধিকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ডাঃ সুকুমার সেন মনে করেন 'যেমন কর্ম তেমনি ফলে'র ওপর দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'র প্রভাব আছে। সাহিত্য বিচারে এ প্রহসনগুলির মূল্য যাই থাক না কেন, সে যুগের সামাজিক কুপ্রথা দূর করবার মাধ্যম হিসেবে এ সমস্ত সরস নাট্য প্রচেষ্টার যে একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে তা অনস্বীকার্য। তাঁর নাটক প্রহসনে সে যুগের সংস্কারকামী বাঙালী-মন যেন কথা কয়ে উঠেছে—যেমন বাণীরূপ লাভ করেছে বিভিন্ন যুগের বাঙালী-মন বিচিত্রধর্মী বাংলা সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে মনীষী রমেশচন্দ্রের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

"The literature of Bengal reflects the national mind through successive ages and is the only real index to the history of the people." ১

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রাম-নারায়ণ স্মরণীয় মুখ্যতঃ তাঁর সামাজিক নাটক-নক্সা ও প্রহসনের জন্যে। অতএব তাঁর অনুবাদাশ্রিত বা পৌরাণিক নাটকগুলি আমাদের এ আলোচনার বহির্ভূত রাখা হল। তাঁর অনুবাদাশ্রিত নাটকের মধ্যে রত্নাবলীর অভিনয় কি করে মধুসূদনকে নব-নাট্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিল তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়বস্তু।

১ R. C Dutt. Literature of Bengal, P. 7.

৭

সাহিত্যে নবসৃষ্টি সূচনা ঃ নাটক ॥ সৃষ্টির উল্লাস ॥

মাইকেল

ভাবধর্ম ও রূপকর্মের (matter and form) দিক দিয়ে মধুসূদন বাংলা কাব্যকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন, বাংলা কাব্যের সমতল ভূমি হতে কাব্য সাহিত্যকে উত্তীর্ণ করেছিলেন শিল্পলোকের উচ্চভূমিতে, সেজন্য মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যামোদীর নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অভিনব কাব্যসৃষ্টি না করলেও মধুসূদন চিরকাল বাঙালীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন আধুনিক নাটক সৃষ্টির জন্যে। মধুসূদনের কাব্যে ছিল খর বিদ্যুতের চমক, তাঁর কল্পনার উত্তুঙ্গতা সে যুগের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়, আর তাঁর কাব্যের ক্লাসিক গাম্ভীর্য ও রোমান্টিক সৌন্দর্য এ যুগের পাঠককেও চমকিত করে—সেজন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন সাধারণতঃ কবি হিসেবেই বন্দিত।

মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা মুক্ত করে বাংলা কাব্যে নতুন প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করে দিয়েছিলেন বলে মধুসূদন অবশ্যই বাঙালী পাঠকের কাছে স্মরণীয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের অনুসরণে অভিনব নাটক রচনা করে তিনি আমাদের সামনে আধুনিক নাট্যকলা সৃষ্টির পথ নির্দেশ করে গেছেন। মধুসূদনের নাট্যকৃতি বিচারে একজন সাহিত্যের ঐতিহাসিক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন :—"Madhusudan is rightly regarded as the father of Bengali drama." ১

মধুসূদনের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে বহু নাটক রচিত হয়েছে; কলকাতার ও মফঃস্বলের বহু সৌখীন রঙ্গমঞ্চে সে নাটক সাড়ম্বরে অভিনীতও হয়েছে। তথাপি মধুসূদনকে বাংলা নাটকের জনক বলা হয়েছে—এর কারণটি অনুধাবন

১ J. C. Ghosh, Bengali Literature, 150

যোগ্য। নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক; রামনারায়ণের কোন কোন নাটক মধুসূদনের নাটকের পরেও রচিত হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু নাট্যকৃতির দিক দিয়ে রামনারায়ণ-দীনবন্ধুর সঙ্গে মধুসূদনের ব্যবধান প্রচুর।

কী সে ব্যবধান? কোথায় সে ব্যবধান?

সমসাময়িক অপর দুই নাট্যকারের সঙ্গে মধুসূদনের নাট্যকৃতির মৌল ব্যবধান য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে নাট্যাঙ্গিক পরিকল্পনায়, কল্পনা বিস্তারে আর রুচির পরিচ্ছন্নতায়। সমসাময়িক যুগের পক্ষে মধুসূদনের কাব্য যেমন ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল, তেমনি নাটকও ছিল প্রাগ্রসর। কাব্যসৃষ্টিতে অভিনব রূপাঙ্গিক ও ভাবধারার জন্যে বহু স্বদেশবাসীর নিকট হতে মধুসূদনের ভাগ্যে জুটেছিল যেমন হাসি বিদ্রূপ ও টিটকারি, তেমনি অভিনব পদ্ধতিতে নাটক রচনার ফলেই মধুসূদনের নাট্যশিল্পীর জীবনেও ঘটে আকস্মিক পরিসমাপ্তি। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি "কৃষ্ণকুমারীর" অভিনয় হল না দেখে মধুসূদন সখেদে বলেছিলেন: "Alas! born an age to soon!" "অকালে অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়া গেলাম! আমার স্থিতি হইল না—দেশের লোক আমায় পোষণ করিল না—দেখিল না—বুঝিল না! কি করিতাম, কত করিতে পারিতাম!"

মধুসূদনের নাট্যজীবনের প্রারম্ভ ছিল প্রচুর সম্ভাবনাময়, কিন্তু সমাপ্তি করুণ! নাটক লিখে রঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় না দেখলে বা দর্শকের সোৎসাহ অভিনন্দন না পেলে মধুসূদন নতুন নাটক সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেতেন না। নাটক অভিনয়ের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হত সে যুগের নাট্যামোদী বিত্তবান ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের খেয়াল-খুশীর উপর—আধুনিক যুগের উচ্চতর নাট্যকলার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল না। মধুসূদন সেজন্য বারে বারে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন সে যুগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভাবের জন্যে। সে যুগে যদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হত, আর মধুসূদনের নাটকগুলি যদি সে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে দর্শকের সাদর অভিনন্দন লাভ করত, তা হলে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার বিকাশ যে কতখানি হতে পারত তা শুধু আমাদের কল্পনার বিষয় হয়েই রইল। সুসাহিত্যিক• প্রমথনাথ বিশী

মধুসূদনের শিল্পবোধের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনভাষ্য রচনায়। তৃতীয় স্তরে "তাঁহার অধিদেবতা—সেক্স্‌পীয়র।" নিজের রচিত ট্র্যাজেডির ধর্ম আলোচনায় তিনি কেশব গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন: "আমি যে দৃষ্টিতে এ ব্যাপারকে দেখিয়াছি, খুব সম্ভব সেক্স্‌পীয়রও সে দৃষ্টিতে ইহা দেখিতেন।" (প্রমথনাথ বিশী, 'মাইকেল মধুসূদন')

তাঁর নাট্যপ্রতিভায় সে সেক্সপীয়রীয় দৃষ্টির সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নাট্যজীবনের সমাপ্তি হল আকস্মিক ভাবে—এ ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকমাত্রই জানেন। দৃষ্টির গভীরতা আছে অথচ সৃষ্টির পূর্ণতা নেই, সেজন্যে চিন্তাশীল লেখক প্রমথনাথ বিশী মধুসূদনকে বলেছেন —"বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ণ সম্ভাবনার মহাকবি।" সেক্সপীয়রীয় দৃষ্টিপ্রভাবে "কৃষ্ণকুমারী" ট্র্যাজেডি রচনার পরও মধুসূদন 'রিজিয়া' নাটক রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু প্রবল নৈরাশ্যের ফলে সে নাটকও সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। অতএব বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় মধুসূদনের স্থান নির্নীত হবে তাঁর লেখনী হতে আমরা যে নাটকগুলি পেয়েছি তার আলোচনা দিয়ে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১৮৫৯ সনটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। স্মরণীয় এজন্য, এ বৎসরেই প্রাচীনাদর্শের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্য জগত থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন, আর সাহিত্যে নবীনাদর্শের পূজারী মধুসূদন নবযুগের শঙ্খধ্বনি করেছেন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশ করে।

মনে রাখা দরকার, বাংলা নাট্যজগতে রামনারায়ণ তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট, আর নাটক রচনায় তাঁর সুচিহ্নিত পথ হল সংস্কৃত আলংকারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটঘাট বাঁধা সংস্কৃত নাট্যাঙ্গিকের পথ। নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে মধুসূদন প্রথমেই সে যুগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলেন।

"মনে রাখিও, তোমার সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথকে ভুলিতে না পারিলে বাংলা নাটকের উদ্‌গতি নাই"।

সমসাময়িক নাট্যমোদীর কাছে এ উক্তি কত দুঃসাহসিক আজ তা ধারণা

করা একটু কষ্টসাধ্য সন্দেহ নেই। আজন্ম বিদ্রোহী মধুসূদন সচেতন ভাবেই নাটক রচনায় এ বিদ্রোহিতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি ও উৎকৃষ্ট নাট্যকারগণ যে দেশে কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে একটা উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের উত্তরসাধকেরা অকিঞ্চিৎকর নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয় করে যে প্রভূত অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করছিলেন তা উচ্চতর নাট্যরসের রসিক মধুসূদনের অন্তরকে পীড়িত করেছিল সেদিন। তাই আবাল্য পাশ্চাত্ত্য সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও এবং বাংলা সাহিত্য ও বাংলা রচনারীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অভাব সত্ত্বেও সাহিত্যপ্রাণ মধুসূদন সবলে এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যের এ অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার দৈন্য ঘুচাতে।

সংস্কৃত নাটকের পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন, 'শর্মিষ্ঠা'র আদি ও অন্তে প্রস্তাবনা ও উপসংহার জাতীয় দুটি রচনা থাকলেও আসলে তা সংস্কৃত নাট্যনিয়মের অনুযায়ী নয়; বরং বিদ্রোহী মধুসূদন যেন একটা প্রচণ্ড 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছিলেন প্রাচীনপন্থী বাংলা নাট্যকারদের সে কবিতার মাধ্যমে :—

উঠ ত্যজ ঘুমঘোর হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
অলীক কুনাট্যে রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সমসাময়িক নাট্যান্দোলনকে মধুসূদন অভিহিত করেছিলেন 'অলীক কুনাট্য' বলে ; আর তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'শর্মিষ্ঠা' সম্পর্কে সদম্ভে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, 'এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পণ্ডিতসংঘকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিব। তবে, বলিয়া রাখি, বেশী আশঙ্কারও কারণ নাই।" "মনে রাখিও, আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্যই লিখিয়াছি, যাহারা আমার ভাবেই ভাবুক ; যাহারা ন্যূনাধিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্ত্য নিয়মেই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের দাস্যশীল অনুসরণ হইতে আমাদের চিন্তাশক্তির চরণে যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, উহাকে সর্বপ্রথম দূর করাই আমার উদ্দেশ্য।"

বাস্তবিক পক্ষে ভাষারীতির ক্ষেত্রে বিদ্রোহিতার জন্যে মধুসূদনকে প্রাচীন-পন্থীদের কাছে কম নাকাল হতে হয়নি। পাইকপাড়ার সভাপণ্ডিত প্রেম-চাঁদ তর্কবাগীশ ত শর্মিষ্ঠার দোষত্রুটি সংশোধন প্রসঙ্গে সোজাই বলেছিলেন —"দাগ দিতে গেলে আর কিছুই থাকবে না।" আর নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রধান অভিযোগ এনেছিলেন মধুসূদনের রচনারীতির বিরুদ্ধে—যে রচনারীতির উপর পড়েছিল মধুসূদনের নবনির্মিত সাহিত্যপ্রতিমার প্রতি-বিম্ব। মধুসূদনের ভাষাতেই বলি :—

"আমি রামনারায়ণকে কেবল লেখায় কোন ব্যাকরণ ভুল থাকিলে ঐ সমস্ত সংশোধন করিতেই চাহিয়াছিলাম। আমার কথাকে কথা বদলাইয়া ফেলিতে চাহি নাই। তুমি জান—মানুষের রচনারীতির মধ্যে তাহার প্রাণ-মনের প্রতিবিম্বটাই পড়ে। তোমাকে বলিতে কি, উক্ত মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই অধমের কোনদিকে কোন 'মিলতি' নাই। তবে, আমি তাঁহার কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করিব।"

শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন দাবী করেছিলেন, সে নাটক সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত জনসাধারণের সাহিত্যিক রুচিকে পরিতৃপ্ত করবে ; দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের 'দাস্যশীল অনুসরণ প্রয়াস' মুক্ত করবে। দেখা যাক, শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদনের এ দাবী কতটা ফলবান হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা নাটকে মহাভারতীয় কাহিনী অনুসরণ করা সত্ত্বেও সমস্ত নাটকে কল্পনার যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে বাংলা নাটক তথা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও তা অভিনব। প্রাচীনপন্থিগণ যাই বলুন না কেন, সে যুগের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী নাট্যকারের কল্পনামুক্তির উল্লাস দেখে নাটকটিকে সাদর অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেননি। "তাঁহারা 'কুলীন কুলসর্বস্ব' ও 'রত্নাবলীর" অন্ধকূপ হইতে বাহিরে আসিয়া 'শর্মিষ্ঠার' কল্পনামুখী মুক্ত বাতায়নে হাঁফ ছাড়িবার সুযোগ পাইলেন।" [প্রমথনাথ বিশী, 'মাইকেল মধুসূদন']

নাটকে যযাতির পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে। তারপর রোমান্টিক ভাবকল্পনা ও পরিস্থিতি রচনায় নাটকটি হয়ে উঠেছে পরম

আস্বাদ্য—সে যুগের বাংলা নাটকের পক্ষে যা সম্পূর্ণ অভিনব। সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের মতে এ রোমান্টিক ভাবাদর্শের জন্যে মধুসূদন প্রধানতঃ ঋণী প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারদের কাছে। এ রোমান্টিক আদর্শ প্রাচ্যই হোক আর প্রতীচ্যই হোক, সে যুগের নাট্যামোদী পাঠক ও নাট্যশিল্পীর সামনে মধুসূদনের এ নতুন ভাবগন্ধী নাটক যে আনন্দ ও সৌন্দর্যময় জগতের সন্ধান দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

শর্মিষ্ঠা নাটকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল নির্যাতিত নারীজীবনের প্রতি মধুসূদনের যুগোচিত সহানুভূতি। এ নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে অনুপ্রাণিত করেছিল সমাজের বহু যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের অন্ধতামস দূরীভূত করে একটা নতুন সমাজ গড়তে, আর সে একই প্রেরণা মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করেছিল অন্তর-বেদনায় সিঞ্চিত অভিনব শিল্পমূর্তি রচনায়। শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তির বন্ধনমুক্তি কামনায় মধুসূদন এখানে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পী ও মনীষীদের সঙ্গে। সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী তাঁর উজ্জ্বল ভঙ্গীতে মধুসূদন-প্রতিভার এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :—

"মাইকেলের সব কাব্যই বন্দিনী নারীর বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ।

"শর্মিষ্ঠা দাসত্বে বন্দিনী, কৃষ্ণকুমারী রাজকন্যা, কিন্তু সে রাজনীতির পাশে বন্দিনী। পদ্মাবতী শচী ও মুরজার ঈর্ষাচক্রে বন্দিনী—

"মধুসূদনের সময় হইতেই সাহিত্যে এই ব্যক্তিত্বের বন্ধনমোচনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার নারীচরিত্রগুলিতে এই বন্ধনমোচনের প্রয়াস, এই বন্ধনেই তাহারা বন্দিনী ; এই বন্ধনের বিলাপেই মধুসূদনীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ।" [প্রমথনাথ বিশী, 'মাইকেল মধুসূদন']

শর্মিষ্ঠা নাটকের নাট্যাঙ্গিকের আধুনিকতা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য, এ নাটকে সচেতন ভাবেই মধুসূদন সূত্রধর নটী সমন্বিত প্রস্তাবনা-রীতিকে বর্জন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত নাট্যরীতি লঙ্ঘন করে তিনি একটি অঙ্ককে বিভিন্ন গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করেছেন, ফলে অংশবিশেষে স্থান্-কালের ঐক্য রক্ষিত হয়নি। এখানেও মধুসূদন সেক্সপীয়রের অনুগামী। সেক্সপীয়র যেমন আরিস্টতল-নির্দিষ্ট গ্রীক-নাট্যশাস্ত্রের স্থান• কালের ঐক্য-

আদর্শকে সচেতন ভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন, মধুসূদনও তেমনি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের আদর্শকে অস্বীকার করে বাংলা নাট্যরীতিতে নতুন আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরুদ্ধে এ সচেতন বিদ্রোহ সে যুগের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের যে ক্ষুব্ধ করবে এ ত খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু মধুসূদনের এ বিদ্রোহিতা প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য,—শর্মিষ্ঠা নাটক-এ বিদ্রোহ প্রধানতঃ সংস্কৃত নাট্যাদর্শের বহিরঙ্গের বিরুদ্ধে। নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য বিচারে শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাট্যাদর্শ হতে খুব বড় রকমের ব্যবধান লক্ষ্য করা যাবে না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'শর্মিষ্ঠা' কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত, আর সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন শর্মিষ্ঠা নাটকের মধুসূদনকে শ্রীহর্ষেরই আত্মজ বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য বিচারে দেখা যাবে, শর্মিষ্ঠা নাটকে দীর্ঘ প্রকৃতি-বর্ণনা এবং সালঙ্কার বাক্যরীতি নাটকীয় গতিকে ব্যাহত করেছে। সংলাপে নাট্যধর্ম অপেক্ষা কাব্যধর্মের প্রকাশই বেশী। এ ছাড়া স্বগত-উক্তির মধ্য দিয়ে নাটকীয় পাত্রগণের আত্মপরিচয় এবং অদৃশ্য ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের প্রাচীন নাট্যকারদের নাট্যরীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধুসূদন মুখ্যতঃ কবি। কথাকে অলংকৃত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা আর কল্পনা বিস্তারের সাহায্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর সকল সৃষ্টির মূলে। এ সৌন্দর্যচেতনা তাঁর কাব্যকে মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটক সৃষ্টিতে সে চেতনা যথেষ্ট দুর্বলতারও সঞ্চার করেছে। সমালোচক শশাঙ্কমোহন সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: "They have the fatal gift of beauty! উহাদের মধ্যে কবিত্বময়তা ও সৌন্দর্যরূপী অভিসম্পাত আছে।" (শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন)

নাট্যশিল্প হিসাবে শর্মিষ্ঠার অপূর্ণতার কারণ নির্ণয়ে শুধু এ কথা বলা চলে: মধুসূদনের সময় নাটক লিখবার উপযুক্ত গদ্য ভাষা তখনও সৃষ্ট হয়নি, উৎকৃষ্ট নাটক রচনার কোন আদর্শও তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল না। নেহাৎ একটা জেদের বশে অতিক্রুত তাঁকে শর্মিষ্ঠার শিল্প-কাঠামো তৈরী করতে হয়েছিল। নাটকের রূপাঙ্গিকে শিল্পোৎকর্ষ ঘটাতে হলে যে সময় সুযোগ ও সাধনার প্রয়োজন তা তখন নাট্যকারের ছিল না। এ ছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজাদের

এবং সে যুগের অভিনেতা ও সম্ভাব্য দর্শকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকখানি রচনা করতে হয়েছিল বলে মধুসূদন এ নাটক রচনায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি।

শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে এ সমস্ত অপূর্ণতা সত্ত্বেও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস শর্মিষ্ঠা ; এবং প্রথম প্রয়াস হলেও প্রথম ব্রতীর সংশয়কে অতিক্রম করেছেন নাট্যকার এ অভিনব নাটক রচনায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ভাবগভীর ও বিচিত্রধর্মী করেছে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও সাহিত্যাদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা স্বাঙ্গীকরণের যুগ। বিদেশী ভাবধারার বিদ্যুৎস্পর্শে এ যুগে সৃষ্টি হয়েছে কল্পনামুখর রোমান্টিক সাহিত্য। মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' বিদেশী ভাব স্বীকরণের প্রত্যক্ষ ফল। এ নাটকে মধুকবির রোমান্টিক মন কল্পনার পাখায় ভর করে সুদূর শূন্যে বিচরণ করেছে। সেই রোমান্টিক কল্পনা-প্রবৃত্তি পরবর্তী বহু লেখকের কাব্য নাটক ও উপন্যাসে নভোচারী বিহঙ্গের মত নিঃসীম নীলিমার রহস্য এবং সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের মৌল সূত্র সন্ধানে তাই পদ্মাবতী নাটকের রোমান্টিক সৌন্দর্যসৃষ্টি উপেক্ষনীয় নয়।

শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদনের সুদূরপ্রসারী কল্পনা বিচ্ছুরিত হয়েছে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে। আর পরবর্তী নাটক পদ্মাবতীতে সে কল্পনা শিল্পায়িত হয়েছে গ্রীক পুরাণের কাহিনী (Apple of Discord) রূপাঙ্কনে। রামনারায়ণের মত মধুসূদন শুধু কল্পনাহীন অনুবাদ নিয়েই তৃপ্ত নন; পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সার্থক অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারই এখানে নাট্যকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য নিয়ে মধুসূদন অভ্রান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন বিদেশী কাহিনীকে ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক নাটক রচনায়। বিদেশী আবহাওয়াপূর্ণ এ নাটক সে যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করলেও প্রাচীনপন্থী সাধারণ পাঠক ও অভিনয়দর্শক হয়ত এ নাটকের বিজাতীয়

পরিবেশ দেখে ক্ষুব্ধ হতে পারেন—এ আশঙ্কায় মধুসূদন এ অভিনব নাট্য-পরিকল্পনার কৈফিয়ৎ স্বরূপ লিখেছিলেন—

"আমার এ নাটকে কিছু না কিছু বিদেশী আবহাওয়া থাকিবেই। কিন্তু, ভাষা যদি বিশুদ্ধ হয়, ভাব যদি অব্যর্থ এবং প্রাঞ্জল হয়, উহার ঘটনা-চক্র যদি চিত্তাকর্ষক হয়, চরিত্রাঙ্কন যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যে বিদেশী ভাব থাকিলেই বা কি যায় আসে?"

মধুসূদনের অননুকরণীয় ভাষায় বলা যায় এ নাটকে তিনি "borrowed a necktie or a waist-coat, but not the whole suit"। তথাপি মধুসূদনের এ দ্বিধা সে যুগের নাট্যামোদী জনসাধারণের সংস্কারাচ্ছন্ন রুচিকে লক্ষ্য করে।

গ্রীক অদৃষ্টবাদের সঙ্গে ভারতীয় অদৃষ্টবাদের সংমিশ্রণে রচিত হয় 'পদ্মাবতী' নাটক। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে এ সমন্বয়প্রচেষ্টা মধুসূদনের কাব্যে যেমন নাটকেও তেমনি সমভাবেই অনুসৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে কল্পনামুখিতা 'পদ্মাবতী' নাটককে রোমান্টিক রসব্যঞ্জনায় মূল্যবান করেছে, সে আত্যন্তিক ভাবকল্পনা সুষ্ঠু চরিত্র সৃষ্টি এবং সংঘাত সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও গঠননৈপুণ্যের দিক দিয়ে 'পদ্মাবতী' সে যুগের বৈচিত্র্যহীন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যে একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল তা নিঃসন্দেহ। 'পদ্মাবতী' নাটক প্রসঙ্গে আরও একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য।—সচেতনভাবে নাট্যকার এ নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকৌশল অবলম্বন করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যাদর্শকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত নাটকের মতই শুভ পরিণতি ঘটিয়ে নাট্যকার এ নাটকে ভারতীয় নাট্যাদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন।

'পদ্মাবতী' নাটকে গদ্য সংলাপ 'শর্মিষ্ঠা' হতে আর একটু গতিশীল। এ নাটকের সংলাপ সৃষ্টিতে মধুসূদন সেক্সপীয়রীয় কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন শুধু এক স্থানে ভঙ্গ ও অভঙ্গ অমিত্রাক্ষরছন্দ সৃষ্টি করে। সে যুগের অভিনেতা ও দর্শক হয়ত এ গতিশীল সংলাপের মর্ম্মগ্রহণ করতে পারবে না, এ দ্বিধার ফলে মধুসূদন তাঁর নাটকে অমিত্রচ্ছন্দের ব্যাপক ব্যবহারে সাহসী হননি। কিন্তু পদ্মাবতী নাটকের অমিত্রাক্ষর

ছন্দে রচিত ক্ষুদ্র একটি সংলাপ পড়ে এ যুগের পাঠকের সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, গদ্যকে নাটকীয় সংলাপের বাহন না করে মধুসূদন যদি অমিত্রচ্ছন্দের মাধ্যমে সংলাপ রচনা করতেন, তা হলে অমর নাট্যগৌরবের অধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হত।

কল্পনার পাখায় ভর করে রোমান্টিক সৌন্দর্যের সন্ধানই মধুসূদনের নাট্যপরিকল্পনার একমাত্র নিদর্শন নয়; সমসাময়িক জীবনের প্রতি তাঁর নাট্যচেতনাও যে ছিল সদাজাগ্রত সে পরিচয় বহন করে শর্মিষ্ঠা প্রকাশের পর এবং তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশের পূর্বে তাঁর রচিত দুখানি প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ')। ব্যঙ্গাত্মক নকসার একটা ঐতিহ্য গদ্য ও নাটকে ইতিপূর্বে গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু এ-জাতীয় রচনাও যে শুধু ভাঁড়ামিতে পূর্ণ না হয়ে সংস্কৃত রুচির পরিচয়বাহী হতে পারে, বিদগ্ধ লেখকের শক্তিমান লেখনীর স্পর্শে সংলাপও যে দীপ্তিময় হয়ে উঠতে পারে, প্রকাশভঙ্গীর ঔজ্জ্বল্য ও ঔচিত্যবোধের স্পর্শে মধুসূদন তা প্রমাণ করলেন এ প্রসহন দুখানি রচনা করে। কথ্যভাষাকে বাহন করে তাঁর পূর্বসূরীরা যে প্রহসন রচনা করেন তা ছিল গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট; আর Standard Colloquialএর উপর ভিত্তি করে সংলাপ রচনায় একটা আদর্শ রীতি গড়ে তোলার কৃতিত্ব শিল্পী মধুসূদনের। মধুসূদনের নাট্যজীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি না ঘটলে বাস্তবধর্মী নাটক প্রহসন রচনায় তিনি যে আরও বেশী কৃতিত্বের অধিকারী হতেন তা অনুমান করা অহেতুক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেক সাহিত্যিক মধুসূদনের এ প্রহসন দুখানির উৎকর্ষ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, নব্য ও প্রাচীন উভয়পন্থী সমসাময়িক বাঙালীর দোষ-দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করায় প্রহসন দুখানি অভিনয়-সৌভাগ্যবঞ্চিত হল। প্রিয় প্রহসন দুখানির এ নৈরাশ্যজনক পরিণতি দেখে মধুসূদন দুঃখ করে বলেছিলেন—"I have half regret having published those two things"। নাটক অভিনয়ের জন্যে ব্যক্তিগত

খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করতে হত বলে মধুসূদন এ সময় জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাবের কথা বিশেষ করে অনুভব করতে থাকেন, রাজনারায়ণের নিকট লিখিত একখানা পত্রে একথার উল্লেখ আছে। নাট্যকলার উৎকর্ষ বিধানের জন্য তাঁর এ অতন্দ্র চিন্তা মধুসূদনকে নব্য বঙ্গসংস্কৃতিস্রষ্টাদের সমশ্রেণীভুক্ত করবে—সন্দেহ নেই।

অতঃপর মধুসূদনের নাট্যকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন "কৃষ্ণকুমারী"। এ নাটকে মধুসূদন সচেতন ভাবে বিদ্রোহ করেছেন চিরপ্রচলিত ভারতীয় নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে এবং এ বিদ্রোহই এ নাটককে উন্নীত করেছে আধুনিকতার স্তরে। অশুভজনক পরিণতির মধ্য দিয়ে নাট্যরসসৃষ্টি-প্রচেষ্টা সে যুগের পক্ষে কতটা দুঃসাহসিকতার কাজ ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বসে আজ আমাদের পক্ষে তা ধারণা করা কতকটা অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীন ধ্যান-ধারণা হতে সকল প্রকার বন্ধনমুক্তির উল্লাসেই মধুসূদন এ অসম্ভবকেও সম্ভব করেছিলেন। প্রবল বিদ্রোহিতার ফলে মধুসূদনের এ নবসৃষ্টি সে যুগের বাংলা নাট্যসাহিত্যকে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল। মধুসূদনের পৃষ্ঠপোষক বেলগাছিয়ার রাজারা এ অশুভ আদর্শের 'অমঙ্গল্য' নাটকের অভিনয় করতে রাজী না হলেও কৃষ্ণকুমারী প্রকাশের ছয় বছর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিচালকেরা এ দ্বন্দ্বপ্রধান নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে দ্বিধা করেননি। "Alas born an age too soon!" এ সক্ষোভ আর্তনাদের মধ্যে মধুসূদন যেন ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন।

'কৃষ্ণকুমারী'তে মধুসূদন তাঁর স্বাভাবিক কবিকল্পনার উচ্চভূমি ত্যাগ করে অবতরণ করেছেন ধরার ধূলিতে; এ নাটকে অদৃষ্টতাড়িত নায়িকার চরম বিষাদান্ত পরিণতি অশ্রুসজল। স্বাতন্ত্র্যহীনা নারীর চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনায় মধুসূদন এ নাটকে যুগসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে নাট্যাঙ্গিকের পরিকল্পনা ও নাটকীয় সংলাপের বিবর্তনও লক্ষণীয়। সর্বপ্রকার অভিনেয় গুণের জন্যে এ নাটকখানি মধুসূদনের নাটকগুলির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। অভিনেয় গুণের

দিকে বিশেষ করে মনোযোগী হয়েছিলেন বলে এ নাটকের বাক্যযোজনায় অযথা কবিত্বের স্ফুরণ সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে ; আর নাটকের ভাষায় মধুসূদন বঙ্গভাষার যে "গার্হস্থ্য শক্তি, যে গ্রাম্যতাবর্জিত অথচ আটপৌরে সামর্থ্য আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাও সর্বতোভাবে অপূর্ব।'[১] সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মনে করেন, "এইরূপ শিল্পদৃষ্টি, বিদ্যাসাগর কিংবা হুতোম, প্যারীচাঁদ বা রামনারায়ণের মধ্যে নাই!"

'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা সাহিত্যে একটা দিক্‌নির্দেশক চিহ্ন, য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের অনুসরণে সার্থক ট্র্যাজেডি সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের এ যুগান্তরকারী নাটক সমাপ্ত করেছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু রচনাকার্যের এ দ্রুত গতি তৎকালোচিত হাস্য বা অন্যান্য রসকে অযথা প্রশ্রয় দিয়ে ট্র্যাজিক রসকে ক্ষুণ্ন করেনি কোথাও। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির প্রভাবে ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় আদর্শের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়েছেন নাট্যকার এ নাটকখানিতে।

কৃষ্ণকুমারী শুধু মধুসূদনের একখানি স্মরণীয় নাটক নয়, সমগ্র বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি মহৎ সৃষ্টি। এ নাটকের উৎকর্ষ বিচারে সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন উচ্ছ্বসিত ভাবে মন্তব্য করেছেন—"এখন যাবৎ কোন নাটক উহাকে শিল্পতাবিষয়ে অতিক্রম করিতে পারে নাই।" এ উক্তির মধ্যে কিছুটা আতিশয্য থাকলেও শিল্পবিচারে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকখানি যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী তাতে সন্দেহ নেই। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, মধুসূদনের নাট্যকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এ নাটকখানি সেকালে অভিনয়সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মর্মাহত মধুসূদন এ নাটকখানির বিরূপ সমালোচনায় তাঁর পরিকল্পিত আরো তিন চারখানা নাটক রচনা হতে বিরত হন। মধুসূদনের সকল সমালোচকই এ ঘটনাকে বাংলা সাহিত্যের একটি চরম দুর্ঘটনা বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ জন্যে দুঃখ করে লাভ কি? মধুসূদনের এ প্রবল নৈরাশ্যবোধ বাংলা নাটকের পক্ষে একটা দুর্ঘটনা বলে বিবেচিত হলেও বাংলা কাব্যের পক্ষে পরম লাভজনক পরিণতিবাহী হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের পরবর্তী নাটকগুলি অমরশিল্পীর নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষরহীন।

১ শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, পৃঃ ১৬১

৮

সাহিত্যে নবসৃষ্টিসূচনা ঃ নাটক ॥ সৃষ্টিতে সহমর্মিতা ॥

দীনবন্ধু

নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রায় সমসাময়িক হলেও মানসধর্মের দিক দিয়ে উভয় শিল্পীর ব্যবধান প্রচুর। একজনের মানসপ্রবৃত্তি প্রধানতঃ রোমান্সধর্মী, আর একজনের বাস্তবধর্মী। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে একজনের মানস-সান্নিধ্য প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকার কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ এবং গ্রীক নাট্যকার গোষ্ঠী ও ইংরাজ নাট্যকার সেক্স্‌পীয়রের সঙ্গে; আর এক জনের মানসিক নৈকট্যবোধ বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং সমসাময়িক তরঙ্গিত সামাজিক জীবন ও বিক্ষুব্ধ গণজীবনের সঙ্গে। একজন সে যুগের বিদগ্ধ নাগরিকের প্রিয় নাট্যকার, আর একজন সর্বযুগের নির্যাতিত জীবনের সহানুভূতিশীল বাণীকার। মধুসূদনের নাট্যশিল্পের আবেদন তাই এযুগের নাট্যামোদীর অন্তরকে আন্দোলিত না করলেও দীনবন্ধুর কোন কোন নাটকের (যেমন নীলদর্পণ) আবেদন এখনও অনুভূতিশীল বাঙালীর অন্তরে সক্রিয়।

মধুসূদনের নাটক রচনার একটা প্রস্তুতিপর্ব ছিল, আর প্রথম নাটক রচনা করেই দীনবন্ধু রাতারাতি খ্যাতিমান। মধুসূদনের নাটকে ক্রমবিকাশের ধাপ আছে, আর দীনবন্ধুর প্রথম নাটকই তাঁর নাট্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মধুসূদনের নাটক প্রধানতঃ কল্পনানির্ভর, আর দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটক বাস্তবনির্ভর। নাটক রচনার অনুপ্রেরণার জন্যে মধুসূদন রঙ্গমঞ্চের আনুকূল্যপ্রত্যাশী, আর দীনবন্ধু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরোক্ষ স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত (গিরিশচন্দ্র ঘোষের "শাস্তি কি শান্তি" নাটকের উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য)।

দীনবন্ধুর নাট্যসাফল্যের মূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা আর সংবেদনশীল অন্তরের ব্যাপক সহানুভূতি। দীনবন্ধুর কল্পনায় মধুসূদনের

সুদূর বিস্তার ছিল না। কিন্তু ছিল সার্থক নাট্যকারের দৃষ্টির objectivity। "যাহা অস্ফুট, যাহা অতীন্দ্রিয়, যাহা আত্মগত কল্পনায় সুন্দর, তাহাতে তাঁহার তেমন দখল ছিল না ; কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাতে যে রস ও যে সৌন্দর্য, দীনবন্ধু সে রসের রসিক, সে সৌন্দর্যের কবি"— দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা নির্ণয়ে চিন্তাশীল সমালোচক ডঃ সুশীলকুমার দে-র উক্ত মন্তব্য অভ্রান্ত।

দীনবন্ধু জীবনরস-রসিক। একমাত্র "কমলে কামিনী"তে যখনই তিনি রোমান্টিক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তখনি তাঁর শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে। জীবনরসসৃষ্টিতে কোথাও তিনি মাত্রাতিরিক্ত করুণ, কোথাও হাস্যরসাশ্রয়ী। তাঁর হাস্যরসে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে, কিন্তু জ্বালা নেই। হাস্যরসসৃষ্টিতে তিনি তাঁর গুরু ঈশ্বর গুপ্তের স্থূল হাস্যরসের দ্বারা প্রভাবান্বিত ; কিন্তু হাস্য-রসের স্থূলতা সে যুগের রসরসিকতার পরিচয়বাহী। দীনবন্ধুর হাস্যরস স্থূলতাধর্মী হলেও ভাঁড়ামিমুক্ত।

বহু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক নীলদর্পণের (প্রকাশকাল ১৮৬০) জন্যে চিরকাল বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এ স্মরণীয় কীর্তির সৃষ্টিমূলে আছে সার্বজনীন ও সার্বকালিক মানবিক আবেদন। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার মানবসভ্যতার আদি হতে যুগে যুগে চলে আসছে ; সে নির্যাতনের পরিসমাপ্তি কোনদিন হবে কিনা, হলেও কবে হবে, কেউ বলতে পারে না। যুগে যুগে এ নির্যাতন বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে— কখনও রাজনৈতিক, কখনও সামাজিক, কখনও অর্থনৈতিক। নির্যাতনের প্রকৃতি যাই হোক, সবলের এ অত্যাচার মানবতাবিরোধী। বিভিন্নযুগে, বিভিন্ন দেশে মানবতার শত্রু এ সমস্ত অত্যাচারীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী শিল্পীর লেখনী উদ্যত হয়েছে, তাদের বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের উত্তাপ দেশের জন-সাধারণকে বিক্ষুব্ধ করেছে, আর তাদের উন্মত্ত করে তুলেছে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অত্যাচারীর অত্যাচার দূরীভূত করতে। মানবদরদী শিল্পী মিসেস্ স্টো-র Uncle Tom's Cabin এভাবে একদিন আমেরিকার অত্যাচারী ধনী সম্প্রদায়ের মানব-নির্যাতনে বাধা দিয়েছিল, আর জীবনশিল্পী ডিকেন্সের Nicholas Nickleby এবং Oliver Twist বিলাতের শিশু-

নিপীড়নের বিপক্ষে একটা প্রবল গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল। জীবন-শিল্পী হিসেবে দীনবন্ধু মিসেস্ স্টো বা ডিকেন্সের সমগোত্রীয়,—শিল্পরচনার উৎকর্ষে না হোক, নির্যাতিত মানবতার প্রতি সহানুভূতির গভীরতায়। নাট্যশিল্প বিচারে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ good art-এর পর্যায়ে না পড়লেও, যে মহৎ উদ্দেশ্যে এ নাটকখানি রচিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বিচারে নাটকখানিকে great art বা মহৎ শিল্প বলতে বাধা নেই। প্রবীণ সাহিত্যিক ডঃ সুকুমার সেন সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন—"দেশ বিদেশের অল্প সংখ্যক যথার্থ পুণ্যবান সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধু অন্যতম।" [১]

পরাধীন দেশের সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের কারণ—বিদেশী শাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত করবার জন্য জাতীয়তার প্রেরণা তখনও দেশের ভিতর সচেতনভাবে জাগ্রত হয়নি। তাই "নীলদর্পণে" দীনবন্ধুর ভূমিকা জাতীয়তাবাদী স্বদেশ-প্রেমিকের নয়,—মানবতাবাদী হৃদয়বান শিল্পীর। অসহায় বাংলা ও বিহারের গ্রামবাসীর উপর সেকালের রাজানুগৃহীত নীলকর সাহেবেরা অত্যাচারের যে স্টীম-রোলার চালিয়েছিল তার স্বরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল সহৃদয় নাট্যশিল্পী দীনবন্ধুর, আর সে অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রবর্তনা দিয়েছিল নিষ্কম্প হস্তে সে প্রজা-পীড়নের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করতে। অত্যাচারী নীলকরদের হাতে অসহায়পল্লীবাসীর সে লাঞ্ছনার চিত্র যে অতিরঞ্জিত নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় তথাকথিত Black Acts (বেথুন সাহেবের খসড়া, ১৮৪৯)-এর সমর্থনে প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বিবৃতি পড়ে :—

"I have constantly heard of complaints of the forcible seizure of crops, of unauthorized ploughing of lands escorted by lathials. I have heard of ryots with their unoffending families being summoned and imprisoned at the pleasure of the planter. I have heard also of beating and maltreatment even unto death, yea of house erased, village burned and lives taken in cold blood with bullet and shot. In innumerable instances it would pay the poor cultivator

১ ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮

far better to sow many other crops than the indigo plant, but he is bound hand and foot till he receives a money advance and signs a contract to cultivate the planter's favourite crop.

And I am equally satisfied that investigation will prove that to a large extent the immunity arises from Europeans not being amenable in serious offences to the jurisdiction of the moffusil courts."

নীলদর্পণ নাটকের পরিণতি ট্র্যাজিক হলেও নাট্যধর্ম বিচারে নাটকটিকে ট্র্যাজেডি বলা চলে না। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে একের পর এক মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা, ভোগলোলুপ পুরুষের অত্যাচার প্রভৃতি বীভৎস চিত্র নাটকের ট্র্যাজিক রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আধুনিক নাটক পরিসমাপ্তিতে ব্যঞ্জনাময়। এ প্রসঙ্গে জনৈক সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"In modern plays, as in modern novels, we have often indeed "a conclusion in which nothing is concluded," in which we are left, as Tennyson once complained, poised on the crest of a wave which does not break."

এ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাসৃষ্টির নৈপুণ্য দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভায় ছিল না। "নীলদর্পণে" শুধু ঝড়ের সংকেত নেই, প্রবল ঝড়ের আঘাতে বনস্পতির মৃত্যু ঘোষণাই যেন এখানে নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির চেয়ে করুণ রসের উদ্বোধনেই নাট্যকার প্রথমাবধি সচেতন।

নীলদর্পণ নাটকে সূক্ষ্ম ভাবসংঘাত-সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম করেছে নাট্যকারের চিত্রধর্মিতা—তাই কোন কোন সমালোচক নীলদর্পণকে পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে 'নাট্যচিত্র' আর দীনবন্ধুকে নাট্যকার না বলে "কেবলই-চিত্রকর—photographer" বলে অভিহিত করেছেন। আবার কোন কোন সমালোচক 'নীলদর্পণের' সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির একটা নিকট-সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

নাটকীয় চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে নাট্যকারের সংলাপ রচনার শক্তির স্পর্শে। কালিদাস বা সেক্স্‌পীয়র এখনও নাট্যামোদী পাঠক সমাজে আদৃত; এ জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তাঁদের নাটকীয় চরিত্রের সজীবতা, বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে নাটকীয় চরিত্রগুলির মুখে যদি সে ভাষা দেওয়া যায় তা হলে সে চরিত্রসৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, চরিত্রবিকাশেও আসে সাবলীলতা, আর পাঠক বা দর্শকের মনেও নাট্যরস সহজেই জমে উঠে। নীলদর্পণ নাটকে দরদী নাট্যকার দীনবন্ধু ভদ্রেতর শ্রেণীর সংলাপ তাদের স্বাভাবিক কথিত ভাষায় যোজনা করেছেন, তাই সে চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নাট্যরসসৃষ্টির সহায়তা করেছে। আর ভদ্রশ্রেণীর সংলাপ রচনায় যখনই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সে যুগের সাহিত্যে প্রচলিত উচ্চকোটির সাধু-ভাষার, তখনি সে চরিত্র হয়ে উঠেছে আড়ষ্ট, প্রাণহীন। এ মন্তব্য শুধু তাঁর নীলদর্পণের ভদ্রশ্রেণীর চরিত্র প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয়, লীলাবতী ও নবীন-তপস্বিনীর সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি যশোর-নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীর অমার্জিত মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করে এত জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি করতে পারেন, ভদ্রশ্রেণীর সংলাপ রচনায় তিনি এত হাস্যকর সাধুভাষা প্রয়োগ করতে গেলেন কেন সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। এখানেও তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যরচনার প্রভাবটাই বিশেষ করে স্মরণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য ছিল যেমন হাল্‌কা চালের, তেমনি তাঁর গদ্য ছিল গুরুভার আড়ষ্ট ও গতিহীন। ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রের মুখে সে ভাষা ব্যবহার করায় সে চরিত্রগুলিও যে আড়ষ্ট হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ কি? উক্ত নাটক তিনটির বৈশিষ্ট্যবিচার প্রসঙ্গে সমালোচক যখন মন্তব্য করেন—"Their plots are muddled, their characters are unreal and their dialogue is lifeless and unnatural"[১] —তখন এ মত আংশিক সত্য বলেই মনে হয়। দীনবন্ধুর ভদ্রশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে সত্য হলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর চরিত্রকে অবাস্তব কিংবা তাদের সংলাপকে প্রাণহীন বা অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাকে বাস্তবজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বলেই মনে হয়।

---

১ J. C. Ghosh, Bengali Literature, p. 150

বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক দিয়ে বিচার করলে দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে সে যুগের পক্ষে অগ্রগামী সাহিত্যসৃষ্টি বলে স্বীকার না করে উপায় থাকেনা। সে ভাবসবস্বতার যুগে যুগন্ধর সাহিত্যিকেরা (যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম) যখন মুখ্যতঃ পুরাণ ও ইতিহাসের সুদূর কাহিনী অবলম্বনে রোমাণ্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে নিমগ্ন, তখন দরদী নাট্যকার দীনবন্ধু বাংলা দেশের কৃষক সমাজের বেদনার শোণিতরাগরঞ্জিত কাহিনীকে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে জীবন্ত রূপ দেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দীনবন্ধুর শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ প্রশ্নাধীন হতে পারে, কিন্তু এ দরদী স্রষ্টাকে শুধুমাত্র নাট্যকার আখ্যা না দিয়ে সমসাময়িক বাংলাদেশের নবজাগ্রত জীবনবোধের চারণ-কবি বলাই বোধ হয় সমীচীন। গত শতাব্দীর বাস্তবধর্মী রচনার ক্ষেত্রে নীলদর্পণ পতাকীস্থানীয়। সে যুগের নিছক কল্পনাপ্রধান রচনাদর্শের সামনে নীলদর্পণ স্থাপন করেছিল বাস্তবমুখী নাটকের এক মহৎ আদর্শ। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে শ্রেয়োবোধের আদর্শ শুধু সে যুগের কেন, এ যুগের নাট্যপ্রচেষ্টায়ও খুব কমই অনুসৃত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে দীনবন্ধু-প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্র ছিল হাস্যরস-সৃষ্টিতে। এ হাস্যরস সহানুভূতিশীল জীবনদ্রষ্টার। হাস্যরসিকের বস্তুদৃষ্টি জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে করেছিল উদার ও নিরপেক্ষ। এ দৃষ্টি-প্রভাবেই দীনবন্ধু জীবনের সকল প্রকার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যকে হাস্যালোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে দীনবন্ধুর সহমর্মিতা ছিল অপরিসীম ; তাই নিজে পুণ্যাত্মা হয়েও উচ্ছৃঙ্খল ও পাপপ্রবৃত্তির চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি সে চরিত্রগুলিকে জীবনধর্মী করে তুলেছেন। যেখানেই তিনি একটু গুরুগম্ভীর হবার চেষ্টা করেছেন বা রোমাণ্টিক কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করেছেন সেখানে তিনি ব্যর্থ ; আর যেখানে তিনি সমসাময়িক জীবনের সর্বপ্রকার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যকে কেন্দ্র করে চরিত্রসৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন, সেখানে তাঁর নাট্যপ্রতিভা দ্যুতিমান্ হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নীলদর্পণ নাটকে একের পর এক করুণ ও বীভৎস ঘটনা যখন পাঠকের রসপ্রবৃত্তিকে পীড়িত করে, তখন নিরক্ষর চাষীদের কৌতুককর কথাবার্তা সে করুণরসের পীড়ন থেকে পাঠককে মুক্তি দেয়। কিন্তু নীলদর্পণ নাটকের ভাবগাম্ভীর্য হাস্যরসের অনুকূল নয় বলে

এ নাটকে হাস্যরসের সাহায্যে চরিত্রসৃষ্টি-প্রচেষ্টা তেমন স্ফূর্তি পায়নি, যেমন পেয়েছে দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক প্রহসনগুলিতে। নীলদর্পণের পরবর্তী 'নবীনতপস্বিনী' নাটকে (১৮৬৩) মূল রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী থেকে বেশী উপভোগ্য হয়েছে জলধর-জগদম্বা ও মালতী-মল্লিকার হাস্যাত্মক ও কৌতুককর উপাখ্যান। 'লীলাবতী' নাটকের (১৮৬৭) হেমচাঁদ নদেরচাঁদের হাসি-ঠাট্টা বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেছে। 'কমলে কামিনী' নাটকটি নেহাৎ বস্তুসম্পর্কহীন হয়ে পড়ত যদি না তার মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা থাকত।

দীনবন্ধু যুগসচেতন নাট্যকার। তাঁর যুগসচেতনতা একদিকে আত্মপ্রকাশ করেছে মানবতার লাঞ্ছনার চিত্র নীলদর্পণে, আর একদিকে সামাজিক অসঙ্গতির পরিচায়ক প্রহসনগুলিতে। সে যুগটাই ছিল গদ্য, পদ্য ও নাটকের মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও নক্সা-জাতীয় রচনার যুগ। সে যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করা দীনবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রহসনত্রয়ী (জামাই-বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী) এ যুগচেতনারই প্রত্যক্ষ ফল। এ প্রহসনগুলিতে দীনবন্ধু তাঁর সমসাময়িক সমাজজীবনের সকল প্রকার অসঙ্গতিকে সকৌতুকে ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যঙ্গপ্রবণ হলেও দীনবন্ধু কিন্তু সত্যিকারের satirist নন, তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যেও মানবজীবনের স্খলন, পতন ও অসঙ্গতির জন্য বেদনা আছে। সেজন্য দীনবন্ধুকে বলা চলে হাস্যরসিক জীবন-শিল্পী—humorist। তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে সমসাময়িক জীবন নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ। এখানেই হাস্যরসশিল্পী হিসেবে গুরুশিষ্যের মৌলিক পার্থক্য। দীনবন্ধুর হাস্যরস করুণরসের স্পর্শে উজ্জ্বল।

'জামাইবারিক' প্রহসন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। রামনারায়ণের নাটকে কৌলীন্য প্রথার বিষময় প্রভাবজনিত কুলীন কন্যাদের দুরবস্থার বেদনাময় কাহিনী, আর দীনবন্ধুর প্রহসনে কুলীন কন্যাদের হস্তে কুলীনপুরুষদের অবস্থা-বিপর্যয়ের কাহিনী। পরিকল্পনার অভিনবত্ব পরম উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিনবত্বটাই এখানে বড় কথা নয়, লঘু কৌতুক সৃষ্টির সঙ্গে শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত ঘর-

জামাইদের জীবনের যে কারুণ্যের দিকটা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা মর্মস্পর্শী। এখানে নাট্যকার নিছক কৌতুক সৃষ্টির পর্যায় অতিক্রম করে জীবনশিল্পীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ। অবিমিশ্র প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে হাস্যরসসৃষ্টি প্রচেষ্টা মুখ্য হলেও নারীদেহলোলুপ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের আশাহত জীবন-পরিণতিকে নাট্যকার করুণ-মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে প্রাচীনপন্থী গ্রাম্য বাঙালী-জীবনের প্রতি হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা; আবার 'সধবার একাদশী'তে সে যুগের উচ্ছৃঙ্খল, আত্মভ্রষ্ট, পরানুকরণকারী ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী তরুণের জীবনের ট্র্যাজেডিকে নিয়ে নাট্যরস সৃষ্টির চেষ্টা। উভয় ক্ষেত্রেই দরদী শিল্পী দীনবন্ধু সে যুগের বাঙালী-জীবনের মর্মে পৌঁছাবার প্রয়াস পেয়েছেন। হাস্য-রসের সাহায্যে সে যুগের নব্যশিক্ষিত সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টায় দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে মধুসূদনের সমগোত্রীয়। বিশেষ করে যে ফোটোগ্রাফার-সুলভ নিপুণতার সঙ্গে দীনবন্ধু সে যুগের নব্যতন্ত্রী যুবক সমাজের বিনষ্টির চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাতে তাঁর প্রেরণার উৎস কোথায় তা খুঁজে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। যুগধর্ম ও যুগশিক্ষার প্রভাবে সে যুগের বাঙালী-জীবনে যে প্রবল ভাঙ্গন এসেছিল, স্বজাতিপ্রেমিক দীনবন্ধু হাস্যরসের আলোকে তার উপভোগ্য বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন সধবার একাদশী নাটকে। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে দীনবন্ধুর স্বাজাত্যবোধের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন—"দীনবন্ধুর স্বজাতিবাৎসল্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতই আন্তরিক ছিল। বাঙালীর বাঙালীত্বকে তিনি সকলের উপরেই স্থান দিতেন। তাই পরিবর্তন-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর এই জাতিধর্মচ্যুত অনুকরণের মোহ তাঁহার মনকে ব্যথিত ও প্রতিভাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।"[১]

সধবার একাদশী নাটকে লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এ নাটকে তিনি তাঁর সৎ-উদ্দেশ্যকে শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন কিনা? এ প্রসঙ্গে একাধিক সমালোচক দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে রুচিহীনতার অভি-যোগ আনয়ন করেছেন এবং এ মন্তব্য করেছেন, প্রকাশভঙ্গী যেখানে রুচিহীন সেখানে রসসৃষ্টির প্রশ্ন অবান্তর। এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার

১ ডঃ সুশীলকুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র, পৃঃ ৮৯

উপায় নেই ; কিন্তু দীনবন্ধুর হাস্যরস স্থষ্টিতে যে রুচির পরিচয় আছে তাকে এ যুগের মানদণ্ডে বিচার করলে দীনবন্ধুর প্রতি অবিচারই করা হবে। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বাঙালী তখনও মার্জিতরুচির নামে রুচিবাগীশ হয়ে ওঠেনি। অসঙ্গত বা হাস্যকর বস্তু দেখলে বাঙালী তখন প্রাণখুলে হাসতে জানত। সে হাসি আধুনিক দৃষ্টিতে স্থূলরুচি হতে পারে ; কিন্তু সে হাসির ভিতর সে যুগের বাঙালীর অন্তর্লোক যেন অনাবৃত হয়ে আছে। দীনবন্ধুর প্রহসনের ভাষাও সে হাসির আলোকে উজ্জ্বল। বাঙালীর সে প্রাণের ভাষার স্পর্শেই সধবার একাদশীর সৃষ্ট চরিত্রগুলি, বিশেষ করে নিমচাঁদ দত্তের চরিত্র এত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সে যুগের নীতিবাদী সাহিত্যিক রামগতি ন্যায়রত্ন দীনবন্ধুর নিমচাঁদ দত্তের চরিত্রে প্রবল দুর্নীতির আভাস দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যে সহজাত সহানুভূতি দিয়ে জীবনশিল্পী দীনবন্ধু এ মদ্যপের চরিত্র এঁকেছিলেন সে সহমর্মিতার অভাবের জন্যই নীতিবাদী সমালোচকের পক্ষে এ দুর্নীতির অভিযোগ আনা সম্ভব হয়েছে। নিমচাঁদ দত্ত নব্যবঙ্গের প্রতীক। উদার পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সংস্পর্শে এসেও সে যুগের নব্যতন্ত্রী বাঙালী ব্যক্তিগত জীবনে প্রগতিশীলতার নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমকে প্রশ্রয় দিত সে আত্মভ্রষ্টতা দীনবন্ধুর স্বাজাত্য-প্রীতিকে পীড়িত করেছিল। সে হৃদয়ের বেদনাকে তিনি করুণ মাধুর্য দান করেছেন তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি নিমচাঁদ দত্তের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। স্বীয় সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীচিত্তের এ একাত্মতা মানবাত্মার অবতরণকে ট্র্যাজেডির করুণ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। সম্ভাবনাপূর্ণ একটা তরুণ জীবনের পতনের চিত্র অনুভূতিশীল পাঠক মাত্রেরই অন্তরকে আলোড়িত করে। এখানেই নাট্যকারের রসসৃষ্টিপ্রচেষ্টা সার্থক—সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর।

দীনবন্ধু ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণের নাট্য-কার। সে কারণে তাঁর নাটক সে যুগের দোষগুণ-মিশ্রিত। দীনবন্ধুর নাট্য-শিল্পের বিচার করতে হবে তাই সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। না হলে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা নির্ণয়ে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

৯

গদ্যে সৃষ্টিবেদনা ॥ লোকায়ত সাহিত্যপ্রয়াস ॥ সংস্কৃতিপ্রসার

প্যারীচাঁদ মিত্র

সাম্প্রতিক কালে বাঙালী শিক্ষিত ও সাহিত্যিক মহলে প্যারীচাঁদ মিত্র শুধু মাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু এই অক্লান্তকর্মী পুরুষসিংহ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যজগতে যে আরো অনেক অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন তার খবর আজ অনেকেই রাখেন না। সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা বর্তমান অধ্যায়ের প্রধান লক্ষ্য।

ইংরাজীতে যাকে বলে 'dynamic personality', প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন সেরকম একটা 'dynamic personality'-র অধিকারী। এমন প্রকৃতিচঞ্চল প্রদীপ্ত প্রতিভা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। প্রতিভার ধর্মই হল জগৎ ও জীবনের অভিনব ও অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে সার্থকভাবে পদচারণা। সেজন্য প্রতিভাবান ব্যক্তি জীবনে যা পেয়েছেন তাকে পশ্চাতে ফেলে জীবনে যা অপ্রাপ্য, যা সুদূর তার পশ্চাতে চিরকাল ধাবিত হয়েছেন। আবার সুদূর যখন নিকটবর্তী হয়েছে, তখন আবার তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে—'to fresh woods and pastures new'। প্যারীচাঁদের জীবনে এ সত্য কিভাবে বাস্তব রূপ পেয়েছিল এখন তাই আমাদের আলোচ্য।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—দিনটা কেমন যাবে সকালবেলাতেই তা টের পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ যখন হিন্দুকলেজের ছাত্র (১৮২৭)[১] তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম লক্ষণ দেখা গেল। অঙ্কশাস্ত্রে যেমন তাঁর অপারদর্শিতা, সাহিত্যে তেমনি গভীর

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীচাঁদ মিত্র, পৃঃ ৫

অনুরাগ তাঁর শিক্ষকদের বিস্মিত করল। অঙ্কের শিক্ষক টাইট্‌লর-সাহেব অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অনগ্রসরতা দেখেও তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালবাসলেন এবং উৎসাহিত করলেন[১]। এ উৎসাহ প্যারীচাঁদের শিক্ষা-জীবনে ফলপ্রসূ হল। প্যারীচাঁদ যখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র তখন সুপ্রিম-কোর্টের জজ গ্রাণ্ট-সাহেব প্রতিযোগিতামূলক একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য ছাত্রদের মধ্য হতে একটি লেখা আহ্বান করেন। "প্যারীচাঁদ এই প্রবন্ধ লেখেন, রাজা দিগম্বর মিত্রও প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ জয়লাভ করেন, পুরস্কার পান[২]।" প্যারীচাঁদের রচনাশক্তি ও পাণ্ডিত্য ছাত্র এবং শিক্ষক মহলে স্বীকৃত হল।

হিন্দু-কলেজে প্যারীচাঁদ কত বৎসর পড়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে মনীষী ডিরোজিও প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকদের অধ্যাপনা যে তাঁর মানস-বিকাশে সহায়তা করেছিল তা খুবই সম্ভব[৩]।

প্যারীচাঁদ যখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র তখন তিনি জনসাধারণের ইংরেজি শিক্ষার জন্য নিজ বাড়ীতে একটি অবৈতনিক স্কুল খোলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রের *On the Progress of Education in Bengal —Transaction of the Bengal Social Science Association, Vol. I. 1867*-এ এ কথার উল্লেখ আছে। প্যারীচাঁদের মন ছাত্রাবস্থাতেই কিভাবে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছিল এ ঘটনাই তার প্রমাণ।

এর পর আরম্ভ হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের কর্মজীবন। ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারীচাঁদ কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন। গ্রন্থাগারে চাকরি তাঁর জ্ঞানানুশীলনের পক্ষে খুবই সহায়ক হল। অল্প সময়ের মধ্যেই অক্লান্ত কর্মতৎপরতা ও সততা গুণে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সে-গ্রন্থাগারের সেক্রেটারি ও লাইব্রেরিয়ানের পদে উন্নীত হলেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন হল একশো টাকা। তৎকালে যে-কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এ মাসিক আয় উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু

---

১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ২৭৭

২ ,, ,, পৃঃ ২৭৭

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীচাঁদ মিত্র, পৃঃ ৬

উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্যারীচাঁদ এ ধরাবাঁধা আয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। শীঘ্রই চাকুরি ছেড়ে তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গ্রন্থাগারের কর্ম ত্যাগ করলেও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁর অকৃত্রিম গ্রন্থাগার-সেবার জন্য তাঁকে অবৈতনিক কিউরেটার এবং লাইব্রেরি-কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করেন। এ সম্মান চাকুরি-জীবনে প্যারীচাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর সন্দেহ নেই।

ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যিকের জীবনে বিফলতা এনেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু প্যারীচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত বাস্তব। সেজন্য স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নেমেও জীবনে তিনি সফলতা অর্জন করলেন। লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য তাঁর জীবনে এনে দিল প্রাচুর্য। ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরির সহকারী-লাইব্রেরিয়ান থাকা অবস্থায়ও তিনি তারাচাঁদ শেঠ ও কালাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে অংশীদার রূপে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। চাকুরি ছাড়ার পরে তাঁর অংশীদারের মৃত্যু হলে প্যারীচাঁদ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে থাকেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততাগুণে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হন। সমসাময়িক ইংরাজ ব্যবসায়ীরাও তাঁর সততার জন্য তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেল কোম্পানি প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত বিলাতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি চা-কোম্পানি তাঁকে বোর্ডের সদস্যরূপে মনোনীত করেন।

এ অক্লান্তকর্মী পুরুষের অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও সততার কথা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি পুলিশ-সংস্কার উদ্দেশ্যে যে কমিশন বসান—বহু ইংরাজ ও দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সে কমিশনে সাক্ষ্য দেন। সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমৃদ্ধির যুগে সরকারী পুলিশের অপরাধ বর্ণনা করে প্যারীচাঁদ নির্ভীকচিত্তে যে সাক্ষ্য দেন তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর এই সত্য-উদ্ঘাটনের ফলে অনেক পুলিশের চাকরি পর্যন্ত যায়।

প্যারীচাঁদের বুদ্ধি কত ক্ষুরধার ছিল, নিষ্ঠা কত গভীর ছিল, এবং ব্যক্তিত্ব কত প্রখর ছিল তা বোঝাবার জন্যই তাঁর এইনাতি বিস্তৃত কর্মজীবনের

কাহিনীর অবতারণা। তাঁর প্রতিভায় ছিল পরশপাথরের অলৌকিক শক্তি — যা স্পর্শ করেছেন, তাই সোনা হয়ে গেছে।

জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ছাত্রজীবনে নিজ গৃহে প্যারীচাঁদ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে যে সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সমাজচেতনা নানা ধারায় বিকশিত হয়ে উঠল তাঁর পরিণত যৌবনে। তৎকালে কলকাতায় যে সমস্ত সামাজিক সংস্থা ছিল তাদের সঙ্গে প্যারীচাঁদের কোন-না-কোন রকম যোগাযোগ ছিল:

"প্যারীচাঁদ বেথুন সোসাইটির সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ জীব-নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সদস্য, প্যারীচাঁদ বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এশোশিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ কৃষি-সভার সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এশোশিয়েশনের আদি সদস্য।"[১] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যখন ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি তখন প্যারীচাঁদ ছিলেন তার সেক্রেটারি। প্যারীচাঁদ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যুগ্ম-সম্পাদক, এবং তত্ত্ববোধিনী-সভার সদস্য। "এ ছাড়া প্যারীচাঁদ হেয়ার প্রাইজ-ফাণ্ড-কমিটির সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ ডিষ্ট্রিক্ট্ চেরিটেবল সোসাইটির এবং কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর সদস্য। ১৮৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী হইতে ১৮৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্যারীচাঁদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় জীব-নিষ্ঠুরতা নিবারণ উদ্দেশ্যে দুইখানি বিল পেশ করেন। ইহা এক্ষণে ১৮৭৮ সালের প্রথম এবং তৃতীয় আইন নামে অভিহিত। প্যারীচাঁদ অনারারি মেজিষ্টর, প্যারীচাঁদ জাষ্টিস অব্ দি পিস্;—প্যারীচাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।"[২]

শুধু সামাজিক সংস্থা পরিচালনা বা সামাজিক উন্নতিমূলক বক্তৃতা দেওয়া প্যারীচাঁদের সমাজচেতনার একমাত্র পরিচয় বলা চলে না। সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা ও আন্দোলন করে চলেছিলেন এ সময়ে। 'কলিকাতা রিভিউ'-নামক সে-সময়কার

১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ২৭৮
২ ঐ ঐ পৃঃ ২৬৯

বিখ্যাত ইংরাজী পত্রে প্যারীচাঁদ জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধে জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ নিয়ে তিনি যে কত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন তার প্রমাণ হল—"বিলাতে এ প্রবন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্লামেণ্টের কমন্স সভাতেও এই প্রবন্ধের কথা উঠে।"[১] 'কলিকাতা রিভিউ'তে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি গভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

প্যারীচাঁদের মানসপ্রবণতা কত বহুমুখী ছিল, তাঁর কৃষি-সম্পর্কীয় জ্ঞানের পরিচয় হতেই তা আমরা জানতে পারি। ১৮৪৭ সালে তিনি এগ্রিকালচারেল ও হর্টিকালচারেল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য নির্বাচিত হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দেশীয় লোকের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছয় খণ্ডে 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' সম্পাদনা করেন (১৮৫৩-৫৬ সনে প্রকাশিত)। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ 'কৃষিপাঠ' নামক পুস্তকখানি এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে *Agriculture in Bengal* নামক তাঁর বিখ্যাত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। কৃষি সম্বন্ধে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্যারীচাঁদকে ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত Agriculture and Horticultural Society-র সহকারী সভাপতির সম্মানজনক পদে নির্বাচিত করা হয়। "১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অনারারি মেম্বার নিযুক্ত হন। এ সম্মান বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম লাভ করেন।"[২]

প্যারীচাঁদের জীবনের এই বিস্তৃত পরিচয় থেকে এ-কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্যারীচাঁদ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন যেন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান (institution)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী সংস্কৃতি কত বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে বিচিত্র ধারায় আত্মপ্রকাশোন্মুখ হয়েছিল—চিন্তা ও কর্মবীর প্যারীচাঁদের জীবন-সাধনার ইতিবৃত্ত হতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টি প্রয়াসও তাঁর বিচিত্রধর্মী কর্মধারার মত

১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ২৭৯

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীচাঁদ মিত্র, পৃঃ ১৬

বহুমুখী। তাঁর একশ্রেণীর রচনায় সৃষ্টিপ্রয়াস মুখ্য, আর এক শ্রেণীর রচনাতে সে যুগের সংস্কারপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর মত তিনি সমসাময়িক সংবাদপত্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহ-যোগিতায় তিনি জনসাধারণ ও মহিলাদের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা সম্পাদনা করেন। নানা কারণে এই পত্রিকাখানি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়—সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এ মাসিকপত্র প্রকাশের পূর্বেই প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকার পরিচালন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই উভয় পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদের জ্ঞানগর্ভ বহু রচনা প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের বিশিষ্ট কীর্তি কিন্তু 'মাসিক পত্র'-সম্পাদনা। এ ক্ষুদ্রকায় পত্রিকাখানির সম্পাদনায় প্যারীচাঁদ যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন তা ছিল সেকালে একান্ত দুর্লভ। ইতিপূর্বে মনীষী বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষাবিস্তারে যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, প্যারীচাঁদের প্রয়াস তার থেকেও দুঃসাহসিক। এর কারণ, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ছিল বিদ্যাসাগরের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য, আর অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও জনসাধাণের মধ্যে সাহিত্যপাঠের অনুরাগ-সঞ্চারই ছিল প্যারীচাঁদের 'মাসিক পত্র'-প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। সে যুগের উচ্চকোটির সংস্কৃত ভাষারীতিকে বর্জন করে এ অভিনব পত্রিকার বিষয়বস্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই রচিত হত। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রই জানেন প্যারীচাঁদের এই জীবন্ত ও গতিশীল ভাষাসৃষ্টি-প্রচেষ্টা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী ফলপ্রসূ হয়েছিল। 'মাসিক পত্রের' প্রত্যেক সংখ্যার প্রারম্ভেই এ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য মুদ্রিত থাকত এভাবে :

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচিত হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত

এ পত্রিকা লেখা হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা।"

এই 'মাসিক পত্রের' আয়ু ছিল খুব স্বল্পকাল—কেউ কেউ মনে করেন তিন বৎসর [১]। ব্রজেনবাবুর মতে চার বৎসর (১৮৫৪-১৮৫৮)। কিন্তু কালটাই সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের পক্ষে বড় কথা নয়। যদি দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য থাকে তা হলে স্বল্পকালের মধ্যেও কোন বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্র সাহিত্যজগতে বিপ্লব ঘটাতে পারে—যেমন ঘটিয়েছিল পরবর্তীকালে 'সবুজ পত্র'। 'মাসিক পত্রিকা' পাঠে দেখা যায়, শুধু এ পত্রিকার কথ্য প্রকাশরীতি নয়, তথায় প্রকাশিত সম্পাদকের সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীও সমসাময়িক রক্ষণশীল সাহিত্যিকদের কঠোর সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সমসাময়িক অন্যতম সাহিত্যসেবী ঈশ্বর গুপ্ত যদিও প্যারীচাঁদের প্রগতিশীল মতবাদকে সমর্থন করতেন না, তথাপি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্যারীচাঁদের প্রতি 'মুদ্গরে'-প্রকাশিত রুচিহীন সমালোচনাকে ধিক্কৃত করেন :

"...মাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রচলিত প্রথার প্রতিকূলে অনেক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন; ঐ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ ও মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ হইতেছে, তখন তাহাতে একেবারে সাহেবী অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় না একথা অতিশয় যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেই সাহেবী মেজাজ ও তাঁহাদিগের লেখাতেও সাহেবী গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে 'মুগ্দর' প্রকাশকের একেবারে কটূক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া বসা উচিত হয় না...।"

'মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্যারীচাঁদের মতামতের বিরুদ্ধে 'মুগ্দর'-সম্পাদক ও 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান অভিযোগ এই যে —এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও অন্যান্য রচনা পাশ্চাত্ত্য-ভাবগন্ধী, অতএব 'সাধারণ বালক ও মহিলাগণে'র পাঠের অনুপযুক্ত। প্যারীচাঁদের মানসপ্রবৃত্তি

[১] He (Radhanath Sikdar) conducted with me a monthly magazine called "Masik Patrika" for about three years. Peary Chand Mitra, A Biographical Sketch of David Hare, p. 32

যুগবিচারে কতটা প্রগতিশীল ছিল উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য হতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাস্তবিকই 'মাসিক পত্রিকা'র সংখ্যাগুলি পড়লে দেখা যায়, এ পত্রিকার সরস ও স্নিগ্ধ রচনার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ভাবপ্রবাহ যেন বাঙালীর অর্গলবদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার জন্য লুটোপুটি খাচ্ছে। সে ভাবের মধ্যে সোজাসুজি উপদেশ দেবার স্থূলতা নেই, আছে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে গল্পকারের অন্তরঙ্গ আনন্দের যোগ। সংস্কারান্ধ বাঙালী নারীর মনে যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তি জাগাবার জন্য কথাকার প্যারীচাঁদ আশ্রয় নিয়েছেন মনোময় গল্পের। এ অধ্যায়ের গোড়াতেই মন্তব্য করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠক প্যারীচাঁদকে কেবলমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক বলেই জানেন ; কিন্তু অন্তঃপুরের নারীর উদ্দেশ্যে লিখিত এবং 'মাসিক পত্রে' প্রকাশিত ছোট ছোট কাহিনীগুলি পড়লে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না যে, প্যারীচাঁদ তাঁর সাহিত্য রচনার সর্বত্রই অল্পবিস্তর শিল্পচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সে শিল্প অত্যন্ত অপরিণত—বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রথম ব্রতীর শিল্পরচনা-প্রয়াস—এ কথাও আমাদের ভোলা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৫৫ সনের ১৫ই মে 'মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত—'শ্রীমতী মনমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি ঘুচিয়া যায়' নামক প্রথম প্রস্তাব পঠনীয়।

এ কাহিনীতে দেখা যায়, বিধবা মনমোহিনী তার প্রেমিক ব্রজনাথ চক্রবর্তীর নিকট থেকে বিবাহের প্রস্তাবযুক্ত একখানি পত্র পেয়েছে : সেই "পত্র পাঠ করিয়া মনমোহিনীর সকল শরীর শিহরিয়া উঠে, পরে স্থির হইলে মনে ভাবেন—আমি কি বিপদে পড়িলাম। ব্রজনাথ কেন আমাকে এমন পত্র লিখিলেন, তাঁর তো ইচ্ছা নয় আমার মন্দ হয়, অথচ বিবাহ করিলে আমি তো শাপগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইব, ইহা অপেক্ষা মন্দ আর কি হইতে পারে।"

এর পরে দেখা যায় প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে মনমোহিনীর অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে। একদিকে তার বর্তমান প্রেমিক ব্রজনাথের আকর্ষণ, আর একদিকে তার মৃত স্বামী ভোলানাথের স্মৃতি ও হিন্দু-বিধবার

সংস্কার। এই টানাপোড়েনে মনমোহিনীর চিত্তে যে দ্বিধা জেগেছে তার চিত্র শিল্পী প্যারীচাঁদ অঙ্কিত করেছেন উজ্জ্বল রেখায় :

"এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মনমোহিনী ক্ষণেক কাল মৌনভাবে থাকেন। পরে ব্রজনাথের পত্রখানি পড়েন, পড়িয়া আবার বিবাহের দিকে মন যায়। এইরূপে দুমনা হইয়া কখন কাঁদেন, কখন গম্ভীর হইয়া থাকেন, কখন বা কাষ্ঠ-হাসি হাসেন, কখন বলেন, বিবাহ করিব, কখন বলেন, না, বিবাহ করিব না, দ্বিতীয় বিবাহে মহা পাপ। এই প্রকারে বিবাহের কথা উলটু পালট্ করিয়া দেখিতে দেখিতে রাত্রি দুইপ্রহর দুইটা বাজে···বিনা আহারে মনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে শয়ন করিতে যান, শুইয়া জোড় হাতে পরমেশ্বরের নিকট আরাধনা করেন—'পরমেশ্বর, আমি অবলা নারী, আমার ধর্মাধর্ম বোধ নাই, আমার সুখ দুঃখ তোমায় হাতে, তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবেক, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কেবল আমার ধর্ম বজায় রাখিও। দেখিও যেন পরকাল নষ্ট না হয়।"

এ পর্যন্ত মনমোহিনীর কাহিনী খুবই বাস্তবানুগ—জীবন্ত ; মনমোহিনীর অন্তরের দ্বিধার বেদনা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে ; কিন্তু কাহিনীর শেষে প্যারীচাঁদ স্বপ্ন ও আলৌকিকের সমাবেশ করে মনমোহিনীর জীবন-সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়, মনমোহিনীর লোকান্তরিতা মাতা নিদ্রিতা মনমোহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ব্রজনাথকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যে। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর পক্ষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা পাপের কাজ নয়। পাপের কাজ না হবার কারণ, স্বামী বর্তমান থাকতে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হবে না বলেই সকল স্ত্রী অঙ্গীকারবদ্ধা হয় ; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে এ অঙ্গীকার আর পালনীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী তার অভিরুচিমত দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে তাতে মৃত স্বামী ক্ষুব্ধ হতে পারে না, কারণ মৃত্যুর পরে মানুষ ছায়াশরীরী হয়ে যায়—তার ঈর্ষা হিংসা ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম প্রভৃতি কোন প্রবৃত্তিই থাকে না।

এ কাহিনীতে প্যারীচাঁদের বাণীভঙ্গী ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এ গল্পের ভাষা পড়ে মনে হয়, বাংলা ভাষা ক্রমশঃ সজীব প্রাণের স্পর্শে গতিশীল হয়ে উঠেছে, যে গতিশীলতা ইতিপূর্বে কোন

গল্প-লেখকের লেখায় দেখা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী হিন্দু-বিধবার জীবন-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেবার জন্য প্যারীচাঁদ কাহিনীর সাহায্যে যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙালী বিধবার জীবন-সমস্যা আলোচনায় যুক্তিবাদ অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনাতেও ছিল; কিন্তু সে আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ—শিক্ষিত লোকের উদ্দেশ্যেই লিখিত। আর সরস-সুন্দর কাহিনীর মাধ্যমে প্যারীচাঁদের যুক্তিবাদের আবেদন অর্ধশিক্ষিতা নারীর মনেও। এ কাহিনী পড়ে একজন অল্পশিক্ষিতা বিধবা নারীও অতি সহজে তার জীবন-দ্বন্দ্বের সমাধানের ইঙ্গিত দেখতে পায়। হিন্দু বিধবার প্রতি সহানুভূতিতে বিদ্যাসাগর যদি শ্রদ্ধেয় হন, প্যারীচাঁদ অন্তরঙ্গ—যদিও সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার দিক দিয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই প্রগতিশীল।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ সনের 'মাসিক পত্রিকা'য় দেখা যায়, প্যারীচাঁদ আর একটি কাহিনীর আশ্রয়ে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কাহিনীটির নাম 'হিন্দুদিগের বিধবা-বিবাহের কথা শুনিয়া ইংরাজদিগের বিবীরা যাহা বলে'। এ কাহিনীটি 'বীরহরি' ও 'বিবী হাকিম' নামক দুটি কাল্পনিক চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে। এ কাহিনীতেও দেখা যায়, কাল্পনিক 'বিবী হাকিম' স্ত্রীলোকের বিধবা-বিবাহ সমর্থন করছেন নিম্নলিখিত যুক্তিতে :

"ইহকালে বিবাহ হইলে যে স্ত্রী-স্বামী সম্পর্ক হয়, তাহা পরকালে থাকে না, তাহার কারণ সেখানে আমরা এ দেহ লইয়া যাইনে। যেখানে এ দেহ নাই, সেখানে স্ত্রী-পুরুষেরও প্রভেদ নাই, সুতরাং এমন স্থানে বিবাহ দেওয়া থোওয়া হয় না। এইজন্য ইহকালে স্ত্রীলোকের দুই তিনবার বিবাহ হইলে তাহার পরকালের ক্ষতি হয় না।" [১]

এ সমস্ত কাহিনীতে দেখা যায় গল্পকার প্যারীচাঁদ সুকৌশলে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী মতবাদ সমকালীন বাঙালী নারীর মনে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করছেন।

শুধুমাত্র সমকালীন সমাজের বহুআলোচিত বিধবা-বিবাহ সমস্যা নিয়ে নয়, প্যারীচাঁদ পাশ্চাত্ত্য বিবাহিত নারীর পত্নীত্বের আদর্শ (দ্রষ্টব্য : 'স্বামী কয়েদ

১ মাসিক পত্রিকা ॥ বালম ২ ॥ নং ৭ ॥ ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ ॥ পৃঃ ৭৭

হইয়া দেশান্তর হইলে ভদ্র পত্নীও দুঃখ স্বীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে যান'—'মাসিক পত্রিকা', ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। নং ৭। পৃঃ ৭৯; 'পাশ্চাত্ত্য মাতার বুদ্ধিমত্তা'—'মাসিক পত্রিকা',—ঐ, পৃঃ ৭৭; 'পাশ্চাত্ত্য মেয়েদের সাহসিকতা—স্পার্টা দেশের মেয়েরা বড় সাহসী,—'মাসিক পত্রিকা', বালম ৩। নং ১১। ১৪ই জুন, ১৮৫৭ সাল) প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী 'মাসিক পত্রে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করে বহুকালের অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মোহাচ্ছন্ন বাঙালী নারীকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবন-চেতনায় উদ্‌বোধিত করবার চেষ্টা করেন।

কেবল স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী নারীকে নয়, সমসাময়িক স্বল্পশিক্ষিত পুরুষকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাত্মক কাহিনীর আশ্রয়ে প্যারীচাঁদ পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নির্ভীক ও কর্মচঞ্চল জীবনাদর্শের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেন।

পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের পরিচয় দেবার অভিপ্রায়ে ১৮৫৭ সালের 'মাসিক পত্রিকার' পৃষ্ঠায় প্যারীচাঁদ যে একটি কৌতুককর কাহিনীর অবতারণা করেছেন তা এখানে উদ্ধার করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না:

"একজন জাহাজি গোরার কথা

একবার একজন ভদ্রলোক একজন জাহাজি গোরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন; বল দেখি তোর বাপ কোথায় মরে?

জাহাজি গোরা উত্তর দেয়। মহাশয়, তিনি আমার মতন জাহাজের কর্ম করিতেন, সমুদ্রে জাহাজ ডোবাতে মরিয়া যান।

ভদ্রলোক। তোর ঠাকুরদা কি করিয়া মরে।

জাহাজি গোরা। মহাশয়, তিনিও জাহাজে কর্ম করিতেন, তিনি জাহাজে করে সমুদ্রে গিয়েছেন, এমন সময়ে সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যান।

জাহাজি গোরার কথা শুনিয়া ভদ্রলোক বলেন,—তোর দুই পুরুষ সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে, তোর কি জাহাজের কর্ম করিতে ভয় হয় না।

জাহাজি গোরা। মহাশয়, ভয় করে কি করিব। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মহাশয় আপনার ঠাকুরের কোথায় কাল হয়।

ভদ্রলোক। তিনি ঘরে থাকেন, ব্যারাম হয়, বিছানায় শুইয়া মরেন।

জাহাজি গোরা। মহাশয়, আপনার পিতামহ কোথায় মরেন।

ভদ্রলোক। তিনিও বাড়ীতে থাকেন, পীড়া হয়, বিছানায় শুইয়া মরেন।

এই সকল কথা শুনিয়া জাহাজি গোরা কহে,—মহাশয়, আপনার দুই পুরুষ বিছানায় শুইয়া মরেন, আপনার কি বিছানায় শুইতে ভয় করে না"।[১]

এ সমস্ত ছোটখাট ও সরস কাহিনীর সাহায্যে প্যারীচাঁদ তাঁর কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য জীবনের আদর্শ বাঙালীর অন্তঃপুরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে যে অক্লান্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন তা ভাবতেও আজ আমাদের বিস্ময় লাগে। সংস্কার-প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করায় প্যারীচাঁদের এ সমস্ত রচনা তেমন সৃষ্টি-ধর্মী হয়ে ওঠেনি, সে কথা অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্যারীচাঁদের যুগান্তরকারী উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'ও এ 'মাসিক পত্রিকার' পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকখানি বহু-আলোচিত বলে বর্তমান আলোচনার অংশীভূত করা হল না।

সমসাময়িক রুদ্ধদ্বার বাঙালী জীবনে পাশ্চাত্ত্য মনের মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দেবার চেষ্টা করলেও জীবন ও সাহিত্য—এই উভয় ক্ষেত্রেই প্যারীচাঁদ সামঞ্জস্যের সাধনা করে গেছেন। যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আমাদের কুসংস্কারান্ধ বাঙালী জীবনে ভাবমুক্তি ঘটাতে পারে, সাহিত্যের মাধ্যমে সে ভাবস্রোত বাঙালীর মৃতপ্রায় জীবনে প্রবাহিত করে দেবার জন্যে প্যারীচাঁদের চেষ্টা ছিল অক্লান্ত; আবার পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের অন্ধ অনুকৃতির ফলে সমসাময়িক বাঙালী জীবনে যে সমস্ত গ্লানি এসেছিল, বাঙালীকে সে গ্লানিমুক্ত করতেও তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না।

প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাতি রাখার কি উপায়' (প্রকাশ—ইং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। "পরস্পর অসম্বদ্ধ কয়েকটি গল্পের সাহায্যে ইহাতে মাতলামি ও মাতলামি সঞ্জাত 'বখামি'র স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে"।[২] এ গ্রন্থ প্রধানতঃ সংস্কারমূলক।

১ মাসিক পত্রিকা, ১লা আষাঢ়, ১২৬৪ ॥ ১৪ই জুন, ১৮৫৭

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, প্যারীচাঁদ মিত্র, ২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা

'মাসিক পত্রিকার' পৃষ্ঠায় প্যারীচাঁদ বাঙালী নারীকে যেমন পাশ্চাত্ত্য জীবনের সংস্কারমুক্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, আবার শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির সংস্কৃত বচন উদ্ধার করে এবং পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের জীবন-কাহিনী আলোচনা করে আদর্শ জীবন সম্বন্ধে অবহিত করবার চেষ্টাও করেছিলেন।

এ ছাড়া বাঙালী নারীর সম্মুখে সর্বাত্মক জীবনের আদর্শ স্থাপন করবার জন্য প্যারীচাঁদ 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (ইং ১৮৭৮); 'আধ্যাত্মিকা (ইং ১৮৮০) ; 'বামাতোষিণী' (ইং ১৮৮১) এবং আরো কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এদেশীয় মানুষের সামনে সেবাময় মহৎ জীবনের আদর্শ স্থাপন করবার জন্য প্যারীচাঁদ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ডেভিড্ হেয়ারের জীবনচরিত' নামক সুবিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

প্যারীচাঁদের জীবন যে শুধুমাত্র ইহলোকের চিন্তায় বিব্রত ছিল তা কোন-মতে বলা চলে না। তাঁর জীবনের গতি ধরার ধূলিতে যেমন আবর্তিত হয়েছে, তেমনি আবার ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে অবস্থিত রহস্যময় জগতেরও সন্ধান করেছে। তাঁর 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬২) এবং 'অভেদী' (১৮৭১) সেই অধ্যাত্মজগতে মানস-ভ্রমণেরই ইতিহাস। এ গ্রন্থগুলি সাক্ষ্য দেয় যে, প্যারীচাঁদ ছিলেন একটি সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের (complete personality) অধিকারী। তাঁর চিন্তাধারা প্রধানতঃ ইহমুখী হলেও অধ্যাত্মজগৎ-বিমুখ ছিল না।

এ সমস্ত আলোচনা থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হবে যে, বাঙালী সংস্কৃতির যে বিচিত্রধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিভিন্ন দিকে প্রবহমান হয়েছিল, প্যারীচাঁদের অসামান্য প্রতিভাস্পর্শে তা স্রোতোমুখর হয়ে উঠল। অথচ তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বে এমন একটা স্নিগ্ধ সরসতা ছিল যা তাঁকে সকলের নিকট প্রিয় করে তুলত। তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন—"প্যারীচাঁদ যেমন রসিক তেমনি ভাবুক। তিনি হাসিতেন, হাসাইতেন ; ভাবিতেন,

ভাবাইতেন। শক্তি বস্তুতই অপরিমেয়। সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ খুবই ছিল।"[১]

এ অধ্যায়ের প্রথমেই মন্তব্য করা হয়েছে—প্যারীচাঁদ ছিলেন dynamic personality-র অধিকারী। তাঁর বিচিত্র জীবন কর্ম হতে কর্মান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে নিত্য নিয়ত পরিক্রমণ করে সত্যের অনুসন্ধান করেছে। যে কর্মজীবনের প্রারম্ভ গ্রন্থাগারে এবং ক্রমবিকাশ দেশের জনসাধারণের শিক্ষাদানে ও আনন্দ-বিধানে, সে জীবনের পরিণতিতে যে অদ্ভুত কিছু সংঘটিত হবে তা অনুমান করা একেবারে অহেতুক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে হয়েওছিল তাই। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। বামাকালী শুধু যে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন তা নয়, তাঁর সাহিত্য-সঙ্গিনীও ছিলেন। "প্রকাশ—তাঁহারই যত্নে প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন।"[২] এই প্রিয়তমা পত্নী-বিয়োগে প্যারীচাঁদ অন্তরে খুবই আঘাত পান এবং তখন থেকে প্রেততত্ত্ব (Spiritualism)-আলোচনায় তিনি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু সংবাদপত্রে তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।[৩] প্রথম জীবনের মূর্তিপূজার বিশ্বাসকে ত্যাগ করে তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মবাদী হয়ে ওঠেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ ইয়র্কের থিয়সফিক্যাল-সোসাইটির করেস্‌পণ্ডিং ফেলো নির্বাচিত হন। বোম্বাইতেও এ সোসাইটির একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেই কেন্দ্র থেকে *Theosophist* নামক যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ সেই পত্রিকায় ভগবৎতত্ত্ব নিয়ে অনেক রচনা প্রকাশিত করেন। তারপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় Theosophical

---

১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ২৭৯

২ ঐ ঐ পৃঃ ২৮০

৩ যেমন—লণ্ডনের Spiritualist, বোস্টনের Banner of Light, বোম্বাইয়ের Theosophist। এই সকল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁর The Spiritual Stray Leaves গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, প্যারীচাঁদ মিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯

Society গঠিত হলে প্যারীচাঁদ তার সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এ সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

প্রেততত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করে প্যারীচাঁদ তাঁর পত্নীবিয়োগ-দুঃখ কিছুটা ভুলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নিরন্তর পরিশ্রম ও শোকের বেদনায় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর বাঙলাদেশের এই প্রতিভাবান পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য, বাঙালীর ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করে বাঙালী সংস্কৃতি কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছিল, তার মূলসূত্র অনুসন্ধান-প্রয়াসেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্যারীচাঁদের বিস্তৃত জীবন-কাহিনীর অবতারণা। এ আলোচনা আলোচ্য বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করবে বলেই বর্তমান লেখকের বিশ্বাস।

১০

কাব্যে হৃদয়মুক্তি ॥ সচেতন শিল্পপ্রয়াস

মধুসূদন

মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম সচেতন শিল্পী। কল্পনার দুরাবগাহিতা মধুসূদনের অনুগামী হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রেরও কম ছিল না; সেই দিক থেকে মধুসূদন বাংলা কাব্যে ততটা স্মরণীয় নন যতটা স্মরণীয় কাব্যাঙ্গিকের নিপুণ স্থপতি হিসাবে। বাংলা কাব্যকে গতানুগতিক ললিত-মাধুর্য মুক্ত করে ধ্বনিগম্ভীর দৃঢ়পিনদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠাই মধুসূদনের কাব্যসাধনার অন্যতম ফলশ্রুতি। তাঁর পূর্বসূরী 'বুড়ো ঈশ্বরগুপ্ত' কিংবা রঙ্গলালের সঙ্গে মধুসূদনের কবিকর্মের ব্যবধান আকাশপাতাল; এমনকি মধুসূদন-অভিহিত 'কৃষ্ণনগরের সে লোকটা'র কবিপ্রতিভাকেও অতিক্রম করেছিলেন নবীন বাংলার এ কবি-বিহঙ্গ। বাংলা কাব্যে মধুসূদনের অনন্যতার প্রধান কারণ তাঁর অভূতপূর্ব শব্দমন্ত্র।

সংস্কৃত ভাষার মেঘমন্দ্রধ্বনিময় শব্দের প্রয়োগে বাংলা কাব্যে Miltonic grandeur আনবেন—এই ছিল মধুসূদনের বহুদিনের সাধনা। সে সাধনার প্রারম্ভ সুদূর মাদ্রাজে—সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশে, আর পরিণতি নিতান্ত bravadoর বশে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনায় (১৮৫৯)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই যেন বাংলা কাব্যে একটা যুগান্তর ঘটে গেল—ওজগুণসম্পন্ন ভাষা আর ভাবমুক্তির বাহন অমিত্রচ্ছন্দের অবতারণায়; কিন্তু মধুসূদনের জীবনী-পাঠকেরা জানেন এ যুগান্তর সৃষ্টির জন্য কবি-পণ্ডিত মধুসূদনের অক্লান্ত প্রয়াস ছিল কতখানি। দুর্লভ কবিত্বের সঙ্গে এমন গভীর পাণ্ডিত্য এবং উত্তুঙ্গ কবিকল্পনার সম্মেলন বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি। তাঁর প্রথম অভিযান ছিল

বাংলা কাব্যের প্রায় নয়শো বছরের গতিমন্থরতা ও পেলবতার বিরুদ্ধে। কত বড় প্রতিভা ও দুঃসাহসিকতা থাকলে এত প্রাচীন এবং মজ্জাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যায়, আজ আমরা তা অনুমান করতে পারি মাত্র। বীরাচারী মধুসূদন সে দুঃসাহসিক কাজে শুধু যে ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়; প্রথম ব্রতীর সমস্ত সংশয়কে অতিক্রম করে সে অভিযানে সফলতা লাভ করেছিলেন। আকস্মিক ধূমকেতুর মত বাংলা কাব্যের সমতল ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে তিনি অবস্থাটা একবার যেন দেখলেন; তারপর এক আঘাতেই সে জীর্ণ পুরনো দুর্গকে ধূলিস্মাৎ করে সে যায়গায় গড়ে তুললেন নিজ কাব্যকীর্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ। সে দুর্গে প্রবেশাধিকার সমকালীন কাব্যসংস্কারহীন শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত বাঙালীর ত ছিলই না, এমন কি কাব্য ও সাহিত্যরসিক বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিও সে পাষাণ-কঠোর দুর্গে প্রবেশ করতে না পেরে নিস্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়েছেন, আর নিক্ষেপ করেছেন অনেক চোখা চোখা বাণ সে দুর্গম দুর্গকে লক্ষ্য করে। শুধু সে যুগের কেন এ যুগের কোন কোন কবি-সৈনিকও শক্ত ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী মধুসূদনের কাব্যদুর্গের প্রতি আঘাত হানতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু সে যুগের আক্রমণে যেমন এ যুগের আক্রমণেও তেমনি মধুসূদনের সেই দুর্গপ্রাকারের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়ে নি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রদীপ্ত সূর্যালোকে সেই সুগঠিত দুর্গ সেদিনও যেমন আজো তেমনি বিরাজ করছে অম্লান মহিমায়; আর আশা করা যায় কাব্যামোদীর কাছে সে মহৎ সৃষ্টির গৌরব কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না।

এ ভাবাতিশয়ী উক্তি ছেড়ে দিলে প্রশ্ন ওঠে, যুগে যুগে মধুসূদনের কাব্যাঙ্গিকের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর কাব্যামোদীর কেন এ বিরূপতা? তাঁর নিজের যুগে না হয় অভূতপূর্ব মেজাজের জন্যে তাঁর নবসৃষ্টি সমালোচনার বিষয় হয়েছিল: কিন্তু বহু আলোচনা গবেষণায় আজ যখন তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এখনও তাঁর বলিষ্ঠ কবিকর্মের প্রতি কেন এ প্রতিকূল মনোভাব?

এ প্রতিকূলতার প্রধান কারণ মধুসূদনের কাব্যের ভাষা। মধুসূদনের প্রকাশভঙ্গী তাঁর ভাবধর্মের তুলনায় অনাধুনিক, দাঁতভাঙা অপ্রচলিত অভিধানিক শব্দে পূর্ণ। একখানা ভাল অভিধান কাছে না থাকলে মধুসূদনের

কাব্যের ভাষা-রাজ্যে প্রবেশ করা দুরূহ; অতএব কবি হিসাবে মধুসূদন এ যুগে অপাংক্তেয়…… ..

মধুসূদনের কাব্যের এ ধরনের সমালোচনার উত্তর কবি নিজেই স্ব-লিখিত পত্রগুলির মধ্যে রেখে গেছেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিলে তিনি এ সম্পর্কে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন—

"I am afraid you think my style hard, but believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good blank verse should be sonorous and the best writer of blank verse in English is toughest of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are nothing but easy."

মধুসূদনের স্বীকারোক্তিতেই দেখা যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ধ্বনি-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দগুলি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তাঁর বাণীবদ্ধ হয়ে গেছে।

প্রাকৃত বাংলা শব্দে লঘু-গুরু ভেদ নেই, উচ্চারণরীতিও প্রায় স্থিরতাহীন, আর সংস্কৃত শব্দগুলি আর্য শব্দ, লঘুগুরু ভেদে স্পষ্ট—ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ। ছন্দোকবি মধুসূদন উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা কাব্যে শক্তি ও বেগের সঞ্চার করতে হলে চাই 'হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের স্থানিক বিনিয়োগ এবং বিরাম যতির প্রয়োগ' (শশাঙ্কমোহন সেন)। হ্রস্বদীর্ঘধ্বনিময় শব্দের সাহায্যে বাংলা কাব্যের ভাষায় শক্তিসঞ্চারের অভিপ্রায়ে মধুসূদনকে গ্রহণ করতে হয়েছিল অতিরিক্ত পরিমানে তৎসম শব্দ। মাইকেলের কাব্যভাষার শক্তিরহস্যও নিহিত আছে ঐখানে। এই রহস্যটির মর্মমূলে প্রবেশ করতে না পারায় মধুসূদনের অনুগামী হেমচন্দ্র থেকে শুরু করে বহু কবি-সমালোচক মধুসূদনের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনয়ন করেছেন।

মধুসূদনের কাব্যভাষা সমালোচনার সময় সমকালীন বাংলা-ভাষাধর্মের প্রতিও সমালোচকের দৃষ্টি থাকা উচিত। মধুসূদন কাব্যরচনায় যখন হাত দেন

তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কতখানি? মধুসূদনের নিজের ত বাংলা ভাষার অনুশীলন তখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে, সে অবস্থায় কাব্যভাষা নির্মাণে তাঁর সংস্কৃতনির্ভরতা যে প্রাধান্য লাভ করবে তাতে আর বিচিত্র কী? এ ছাড়া সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্যের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধা ছিল পর্বতপ্রমাণ। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনায় মধুসূদন সদম্ভে একথা বলেছিলেন যে, বাংলা যখন ঐশ্বর্যশালিনী সংস্কৃত ভাষার দুহিতা তখন বাংলা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রচলন মোটেই দুরূহ হবে না। প্যারীচাঁদের কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত 'আলালী ভাষা'র প্রতি মধুসূদনের ঘৃণা ছিল বিজাতীয়। লোকপ্রচলিত সে হাল্‌কা ধরনের ভাষা বাংলা ভাষার মহিমা ক্ষুণ্ণ করবে এই আশঙ্কায় মধুসূদন সেই অভিনব ভাষাকে 'মেছুনীর ভাষা' বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেননি। ধ্বনিমুখর সংস্কৃতভাষার প্রতি আত্যন্তিক প্রীতিই মধুসূদনকে খুব বেশী সংস্কৃতশব্দনির্ভর হতে প্রণোদিত করে থাকবে—এও খুব বিচিত্র নয়।

বাংলা কাব্যে অমিত্রচ্ছন্দের অবতারণা মেরু আবিষ্কার বা হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ আবিষ্কারের মত গভীর তাৎপর্যময়। এতকাল প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর সীমাবদ্ধ প্রকাশক্ষেত্রে কবির ভাবব্যঞ্জনা পদে পদে হোঁচট খেয়েছে; মধুসূদন দৈব প্রতিভাবলে সে খঞ্জভারতীর দুর্বল পদযুগলকে সচল করেছেন, এবং এনে দিয়েছেন সে অস্থির পদচারণায় দৃঢ় সবল গতি,—'পক্ষবান অশ্বরাজের' মত সে গতি উদ্দাম-সুন্দর! পদ্মাবতী নাটক রচনা করতে গিয়ে সব রকম ভাবপ্রকাশের বাহন এ নতুন ছন্দ আবিষ্কারে মধুসূদনের অন্তরে সে কী উদ্বেল উল্লাস! বিচিত্র রসপ্রবর্তনায় পল্বলবদ্ধ বাংলা কাব্যে সমুদ্রের কলকল্লোল প্রবাহিত করে দেবেন, সে সবল ছন্দে প্রাচীন 'বীরযুগ'কে সমকালীন নবজাগ্রত বাঙালীর সামনে স্থাপন করে তাদের রসচেতনায়ও বলিষ্ঠতার সঞ্চার করবেন, এই বিপুল উল্লাসে মধুসূদনের চিত্ত হয়েছিল সেদিন অধীর। সৃষ্টিবেদনায় অস্থির হৃদয়াবর্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নবাবিষ্কৃত ছন্দে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। সে স্মরণীয় বৎসরে এ কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রীয় যুগের অবসান হল, আর বাংলা কাব্যের জীবনমুক্তি ঘোষণায় জেগে উঠল একটি নতুন যুগ—নতুন সম্ভাবনা নিয়ে, নতুন দীপ্তি নিয়ে, প্রকাশের সীমাহীন ঐশ্বর্য নিয়ে। বাংলা কাব্যের সে নতুন রাজ্যজয়ী সেনাপতির সঙ্গে আমরা স্মরণ করি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে যিনি অসামান্য রসচেতনার সাহায্যে সে নতুন সম্ভাবনাকে যে শুধু স্বাগত জানিয়েছিলেন তা নয়, নিজ ব্যয়ে সে নবসৃষ্টিকে প্রকাশিত করে সে যুগের কাব্যামোদী পাঠক সমাজে লেখককে পরিচিত করিয়েছিলেন এবং কাব্যজগতে আরো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন। সেদিন এ কাব্য প্রকাশে বিলম্ব ঘটলে মধুসূদনের আকস্মিক জাগ্রত উদ্দীপনা এ অভিনব ধারার কাব্য রচনায় কতদিন অনির্বাণ থাকত তা বলা খুবই শক্ত।

নতুন রাজ্যজয়ের আনন্দে কবি-সেনাপতি মধুসূদনের চিত্ত উদ্বেলিত কিন্তু দেশবাসী এ বিজয়োৎসবকে অভ্যর্থনা জানালেন কি ভাবে? না,—নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বিরূপ সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যের বিষয় জাগ্রত সিংহ মধুসূদনের পৌরুষ তাঁর সমকালীন হৃদয়হীন অপক্ক সমালোচনায় স্তিমিত হয়নি, বরং জেগে উঠেছিল দ্বিগুণিত উৎসাহে এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ে। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের সবল মনোভাব রাজনারায়ণের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল অহংকৃত বাক্যের মধ্যে: "আমি জন্মযোদ্ধা; যুদ্ধ করিতেই আনন্দ। •আমার দেশের সাহিত্য উন্নত করিতে পারিলে আমি তাহার পরিবর্তে সমগ্র রুশিয়ার রাজমুকুটও চাহি না।—আমি জানি, ভবিষ্যৎ বংশ আমাকে বঙ্গভাষার উদ্ধার কর্তা এবং বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই পূজা করিবে।"

রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্বদেশচেতনার বাহন ধর্ম-সংস্কার এবং শিক্ষা-সংস্কার; আর সাহিত্যশিল্পী মধুসূদনের অনির্বাণ স্বদেশপ্রেম রূপলাভ করেছে প্রাচীনপন্থী বাংলা কাব্য-সংস্কার ও নাটক-সংস্কারে। সে যুগের ক্ষয়িষ্ণু বাংলা কাব্যের ক্ষীণ স্রোতধারাকে বিশ্ব-সাহিত্যের উদার সাগর-সঙ্গমে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে এমন সচেতন অথচ উন্মত্ত প্রয়াস সর্বযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিহৃদয়ের সর্বপ্রথম আলাপন। কোন তত্ত্ব নয়, দার্শনিকতা নয়, শুধু মাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণাতেই এ মহাকাব্যের উদ্বোধন। ভাবতন্ময় রোমান্টিক কবি বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে নিজের মাতৃভাষায় এ সৌন্দর্যমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে হিসাবে এ কাব্যখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'আদ্যাসৃষ্টি। ভারতচন্দ্রের ভোগমূলক জীবনবোধে এ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা ছিল না, রঙ্গলালের ভাবোচ্ছ্বাসময় স্থূল হৃদয়াবেগে এ সৌন্দর্যবোধ অনুপস্থিত—ভগীরথের মত সৌন্দর্যের প্রাণগঙ্গা প্রবাহিত করে সমকালীন বাঙালীর রসচেতনাহীন মুমূর্ষু চিত্তকে সজীব ও শ্যামল করে তুলেছিলেন অমর শিল্পী মধুসূদন। নিছক সৌন্দর্যস্রষ্টা হিসাবে মধুসূদন এ কাব্যে রোমান্টিক কবি কীট্‌স ও কালিদাসের সমগোত্রীয়। "A thing of beauty is a joy for ever !"—রূপমুগ্ধ কবি কীট্‌সের মতই সৌন্দর্যচেতনার হৃদয়োল্লাসে মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যে শুধু রূপান্তর ঘটাননি, যুগান্তরেরও সৃষ্টি করলেন। এই সৌন্দর্যচেতনার পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রকাব্যে। সৌন্দর্যস্রষ্টা কবি হিসাবে আধুনিক বাংলা কাব্যে মধুসূদনের পূর্বসূরী নেই কিন্তু উত্তরসূরী আছেন। নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির যে প্রেরণা রবীন্দ্রযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে, তার প্রথম শিল্পী মধুসূদন—আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথাটা স্মরণযোগ্য।

তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের সার্থকতম কাব্য না হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন মেজাজের কাব্য। কবির পরবর্তী রচনার ঔজ্জ্বল্যে ও ঐশ্বর্যে এ কাব্যখানির তাৎপর্য ঢাকা পড়ে গেছে। সমসাময়িক ভাবাতিশায়ী সমাজচেতনার স্থলে এ কাব্য বাঙালী-চিত্তে এনে দিল নতুন সৌন্দর্যচেতনা। মধুসূদনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি এ কাব্যে রূপ লাভ করেছে বিদেশী গ্রীক ও প্রাচীন ভারতীয় সৌন্দর্যবাদের সম্মিলিত আদর্শে। বহু-অধীত ও আলৌকিক প্রতিভার অধিকারী মধুসূদন ছাড়া এ সমন্বিত ভাবাদর্শে কাব্য রচনা করবার শক্তি সে যুগে আর কোন কবির ছিল না। তিলোত্তমাসম্ভবে সৌন্দর্যসৃষ্টির মাদকতা আছে, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের মত সচেতনতা নেই। সে জন্য এ কাব্যে মধুসূদনের সৌন্দর্যবোধ কোন তাত্ত্বিকতার স্তরে পরিণতি লাভ করেনি।

আরো একটা বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিলোত্তমাসম্ভব বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। এ কাব্যই বাঙালী পাঠক ও কবির ভাবকল্পনাকে সর্বপ্রথম সবলে আকর্ষণ করেছে সমসাময়িক সংকীর্ণ সমাজজীবন অথবা শৌর্যময় ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে পৌরাণিক কাহিনীর উন্মুক্ত পরিবেশে। রোমান্টিক ভাবকল্পনার অন্যতম প্রধান ধর্মও হল সৌন্দর্যসন্ধানী কবিচিত্তের অতীতচারণ। এ কাব্যে কবির আত্যন্তিক রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালী পাঠকের সামনে একটি সৌন্দর্যময় জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তাও প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক কবির উপযুক্ত। এ কাব্যের কল্পনাসমৃদ্ধ নিসর্গসৌন্দর্যের উদ্দাম বর্ণনা অনেকস্থানে কাহিনীর গতিশীলতায় বাধা সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ সমস্ত বর্ণানাকে কাব্যাঙ্গ হতে বিশ্লিষ্ট করতে গেলে সামগ্রিক কাব্যরস উপলব্ধিতে বাধা ঘটে। কবিকল্পনার সৌন্দর্যপ্রতিমা তিলোত্তমা-সৃষ্টি কখনই সম্ভব হত না, যদি তার পটভূমিকায় স্থাপিত না হত বিচিত্রসুন্দর নিসর্গ-প্রকৃতি। এখানেও মধুসূদনের উচ্চশ্রেণীর রোমান্টিক কবিদৃষ্টির পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

'মেঘনাদবধকাব্য' জাগ্রত কবির প্রথম হৃদয়োল্লাসের কাব্য। মহাকাব্যের বাহন অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি সম্পর্কে কবি এখানে আরো সচেতন, শব্দ যোজনায় কবির নিপুণতা আরো লক্ষণীয়। মেঘনাদবধের কবিভাষা পূর্ববর্তী কাব্য হতে আরো দৃঢ়পিনদ্ধ, দীপ্ত, ভাবৈশ্বর্যময়। কাব্য প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমানতা কবি-অন্তরের বিচিত্র ভাবরাশিকে সবলে আকর্ষণ করেছে অনিবার্য পরিণতির দিকে। সংস্কৃত Erotic Similie ব্যবহারের ফলে তিলোত্তমাসম্ভবের রূপসৃষ্টিতে যে কৃত্রিমতা এসেছিল, বন্ধু রাজনারায়ণের সহৃদয় সমালোচনায় মেঘনাদবধকে সে কৃত্রিমতা মুক্ত করতে প্রয়াস পেলেন মধুসূদন; ফলে প্রকাশভঙ্গীতে এল মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য। মৃদঙ্গ ধ্বনির স্থলে বাংলা কাব্যে শোনা গেল মেঘমন্দ্রধ্বনি। সে ধ্বনিগৌরবে উচ্চকিত সে যুগের কোন কোন পাঠক মাইকেলের ছন্দ প্রতিভাকে মিল্টনের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করলেন। বাংলা উচ্চারণ রীতির সমতল ভূমিতে মিল্টনের

ছন্দোরীতির গাম্ভীর্য আশা করা প্রায় অসম্ভব। তাই মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন,—কালিদাস, ভার্জিল বা টাসোর রীতির সঙ্গে বরং মেঘনাদবধের ভাষারীতির তুলনা চলে, কিন্তু মিল্টনের রীতির সঙ্গে কখনও নয়। কারণ—'মিল্টন দেবতা'।

রসসৃষ্টির দিক থেকেও তিলোত্তমাসম্ভবের সঙ্গে মেঘনাদবধের রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। তিলোত্তমায় কবির নিছক সৌন্দর্যচেতনা সাধারণ পাঠকের অনুভূতিশীল চিত্তকে স্পর্শ করে না, কারণ সে কাব্যে ছিল 'মনুষ্যরসে'র অভাব। মেঘনাদবধ বাংলা সাহিত্য সর্বপ্রথম 'মনুষ্যরসে'র কাব্য। কবি অন্তরের বেদনা-রাগ-শোণিতে মেঘনাদবধের প্রকৃত নায়ক রাবণের চরিত্র সৃষ্টি। মেঘনাদ প্রেমময় স্বামী, প্রমীলা প্রেমময়ী পত্নী, আর সীতা ও সরমা চিরন্তন বাঙালী নারী। মেঘনাদবধে কবি প্রথম আত্মীয়তা স্থাপন করলেন বাঙালী-হৃদয়ের সঙ্গে।

হৃদয়ধর্মের দিক দিয়ে বাঙালী হলেও শিল্পধর্মের দিক দিয়ে মধুসূদন এ কাব্যে পাশ্চাত্ত্য কবি শিল্পীর সমগোত্রীয়। এত সচেতন ভাবে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির অনুসরণে কাব্য রচনা মাইকেলের পূর্বে কোন বাঙালী কবি করেন-নি। শিল্পরচনার আদর্শ অনুসন্ধানে মধুসূদনের দৃষ্টি বিশ্বমুখী, আর বিশ্বমুখীন দৃষ্টিভঙ্গী হল উন্নত সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ। বাঙালী সংস্কৃতি রচনায় শিল্পী মধুসূদনের দান হল এখানে। সমকালীন শিক্ষিত বাঙালী কবির শিল্পভাবনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্যাঙ্গিকের আদর্শে অভিনব কাব্য রচনা করে। বিহারীলালের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সে পাশ্চাত্ত্যাদর্শে মহাকাব্য রচনার ধারা প্রস্তুত। নবতর ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত সে কাব্যান্দোলনের স্রষ্টা কবিশিল্পী মধুসূদন।

শিল্পসৃষ্টি বিচারে বিষয়বস্তুর থেকে টেকনিকের গুরুত্ব সর্বকালে স্বীকৃত। যুগে যুগে টেকনিক্ পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। মেঘনাদবধের বিষয়বস্তু সুপরিচিত; কিন্তু নতুন টেকনিকের সাহায্যে এ পুরনো কাহিনীর গায়ে নতুন রঙ্ দিয়ে কবিশিল্পী মধুসূদন সে যুগের পাঠকের চিত্তকে চমকিত করে দিলেন। রামায়ণের সমগ্র কাহিনীকে অবলম্বন না করে মধুসূদন গ্রহণ করলেন রাম ও রাবণের যুদ্ধের সংঘাতময় অংশটি—

যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাম-লক্ষ্মণের হাতে দৈববিড়ম্বিত অমিতবীর্য রাবণ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কাহিনী রচনায় এ নাটকীয় রীতির প্রবর্তন করেন মধুসূদন হোমারের 'ইলিয়াড্' কাব্যের অনুসরণে। শিল্প রচনায় টেক্‌নিকের এ অভিনবত্ব মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টিকে আদ্যন্ত জীবনকাহিনীপূর্ণ মঙ্গলকাব্য থেকে বা সমসাময়িক রঙ্গলালের আখ্যায়িকা কাব্য থেকে পৃথক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করল। আবার মানব-মূল্যবোধের একটুখানি রকমফেরের ফলে রাম-লক্ষ্মণ থেকে রাবণ বা ইন্দ্রজিত পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি অধিকার করল। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের অমর নীতিসৌধের ওপর নতুন টেক্‌নিকের সাহায্যে মানবরসসমৃদ্ধ শিল্পকীর্তির বিজয়-ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন বিদ্রোহী মধুসূদন। নবযুগের শিল্পীর নতুন শিল্পরচনার পথরেখা হল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

মেঘনাদবধের রসনিষ্পত্তির অন্যতম প্রধান কৌশল গ্রীক নিয়তিবাদের সাহায্যে ট্র্যাজিক্ রসসৃষ্টি। ভারতীয় অদৃষ্টবাদের সঙ্গে গ্রীক অদৃষ্টবাদের পার্থক্য মৌলিক। ভারতীয় জীবনে নিয়তি কর্মফলনির্ভর, আর গ্রীক নিয়তি দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসে রাবণের করুণতম পরিণতি তাঁর দুষ্কৃতির ফলে, আর মধুসূদনের কাব্যে রাবণের ট্র্যাজিক পরিণতি অলঙ্ঘনীয় ও দুর্জ্ঞেয় নিয়তির প্রভাবে—কোন দুষ্কৃতির জন্য নয়। সেজন্যে বিধিবিড়ম্বিত রাবণের মর্মভেদী হাহাকার পাঠকের অন্তরে প্রবাহিত করে দেয় বেদনার উষ্ণ প্রবাহ। শুধু মেঘনাদবধে নয়, মধুসূদন তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যনাটকের ট্র্যাজিক রসসৃষ্টিতে সচেতন ভাবে অবলম্বন করেছেন গ্রীক কাব্যনাটকের এ অভিনব টেক্‌নিক।

বাংলা কাব্যের গতানুগতিক ধারায় মধুসূদন একটা স্বতন্ত্র সুরের স্রষ্টা। সেই সুরের উৎস কোথায়? সেই উৎস গ্রীক প্যাগান-মনোবৃত্তিসুলভ বলিষ্ঠ জীবনবাদে এবং আকাশ-পাতাল-বিহারিণী রোমাণ্টিক ভাবকল্পনায়। এ উভয় প্রবৃত্তির উদ্দাম লীলায় মধুসূদন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মহাকাব্যের আদর্শকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করলেন নবতর মহাকাব্য—'বিশাল রসে'র সমন্বয়ে চিত্তের প্রসার আর কল্পনার উদ্দীপ্তি যে মহাকাব্যের প্রাণ। আবার এ মহাকাব্যে শুধু বীরধর্মী কবির ধীরোদাত্ত সুরই ধ্বনিত হয়নি,

গীতিকাব্যের স্বরমূর্চ্ছনাও এই কাব্যের অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। রাম-লক্ষ্মণকে রাবণ-ইন্দ্রজিতের তুলনায় ছোট করেছেন বলে যাঁরা মধুসূদনের কবিকল্পনায় শুধু বিজাতীয় ভাবপ্রেরণার গন্ধ পান, তাঁরা এ কাব্যে অদৃষ্টবিড়ম্বিতা ভারতীয় নারীমনের মর্মমূলে প্রবেশ করবার আন্তরিক কবিপ্রয়াস বোধ হয় লক্ষ্য করেননি।

মহাকাব্য হিসাবে মেঘনাদবধের উৎকর্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন যুগে। মধুসূদনের সমসাময়িক বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র এবং উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ যে শুধু এ কাব্যখানির রসনিষ্পত্তি বিচারে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তা নয়, বঙ্কিমযুগের মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদবধকে একখানি অদ্বিতীয় মহাকাব্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং মধুসূদনের কবি-প্রতিভাকে তুলনা করেছেন ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-হোমার-দান্তে ও সেক্সপীয়রের প্রতিভার সঙ্গে। আবার এ যুগে মধুসূদনের জনৈক কাব্য-সমালোচক জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের নজীর দেখিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মেঘনাদবধ প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য হয়েছে কিনা :—

"Ram and Laksman are two of the noblest figures in Indian mythology, but in Madhusudan's poem they are utterly devoid of valour and honour. It is open to question whether so unorthodox an attitude towards the national tradition is justified in an epic poet ; the world's greatest epic poets have exalted their national idols. In any case the degradation of Ram end Laksman has not really served Madhusudan's purpose of elevating Ravan and Meghanad ; that purpose would have been best served if he had matched them against heroes worthy of their steel... Before his death Meghanad throws a cup at Laksman who swoons at the blow. We wonder whether we are reading a heroic or a mock-heroic poem."[১]

১ J C. Ghosh, Bengali Literature, p. 145.

মহাকাব্য হিসাবে মধুসূদনপ্রতিভার মূল্যায়নে সমালোকের উক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা শক্ত। এ ছাড়া মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা নির্ণয়ে একই লেখকের নিম্নলিখিত মন্তব্যও আধুনিক সমালোচকের চিন্তার খোরাক যোগাবে নিশ্চয়ই :

"The importation of foreign ideas and modes was his greatest achievement, and the best thing about his poetry is its wide, almost world-wide cultural affiliation With all its merits *Meghanad Badh* is a brilliant experiment rather than a great poem." [১]

সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত বাঙালীর গতানুগতিক কাব্যভাবনাকে অতিক্রম করে বিশ্বভাবধারার সঙ্গে নিকট-সম্পর্ক স্থাপন মেঘনাদবধ কাব্য রচনার অন্যতম ফলশ্রুতি,—সমালোচকের উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই ; আর বন্ধু রাজনারায়ণ-নির্দিষ্ট জাতীয় ভাবোদ্দীপক মহাকাব্য (সিংহল বিজয়) রচনার প্রস্তুতি হিসাবে মধুসূদন তাঁর প্রিয় ইন্দ্রজিতের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কাব্যমহিমা দান করে হাত পাকাচ্ছেন (pucca fist)—তাঁর চিঠিতেই একথা স্পষ্ট। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও পরিণত শিল্পবুদ্ধি নিয়ে জাতীয় মহাকাব্য রচনার শুভক্ষণ মধুসূদনের জীবনে আসেনি। কিন্তু তার জন্যে আক্ষেপ করে লাভ নেই। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচারে মেঘনাদবধ পরীক্ষোত্তীর্ণ হোক বা না হোক, কল্পনার উদ্দীপ্তি ও সহমর্মিতার গভীরতা যদি শ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্যতম লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, তা হলে মেঘনাদবধ বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য।

মধুসূদনের কবিমন ছিল বৈচিত্র্যসন্ধানী, তাই সে গ্রহিষ্ণু মনের ভিতর বিভিন্ন মেজাজের (mood-এর) একত্র সংমিশ্রণ দেখে আমরা বিস্মিত হই না। সচেতনভাবে কবি ছিলেন বীররসের উদ্গাতা, আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কবিমন ছিল বাঙালীসুলভ লিরিকধর্মের অনুগামী। মেঘনাদবধে লিরিক ভাবোচ্ছ্বাসের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। শুধু চতুর্থ সর্গে নয়, মেঘনাদবধের

১ J. C. Ghosh, Bengali Literature, p. 147.

আরো বহুস্থানে এ লিরিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখে মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা-মুগ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার উহাকে "মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্য" বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেননি। মেঘনাদবধ কাব্যের যথার্থ মূল্যায়নে প্রবীণ সমালোচকের এই উক্তি ভাবাতিশায়ী মনে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু মধুকবির কবি-ধর্ম নির্ণয়ের অভ্রান্ত সঙ্কেত ওই উক্তিটির মধ্যেই নিহিত আছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কবিচিত্তের এ স্বতঃস্ফূর্ত লিরিক অভিব্যক্তিতে ভবিষ্যৎ গীতিকাব্যের যে পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে, আধুনিক বাংলা কাব্যের যে কোন নিবিষ্ট পাঠকের দৃষ্টিকে তা আকর্ষণ করে।

মধুসূদনের কাব্যধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় এ গীতিধর্ম একটা প্রবল প্রেরণা রূপে তাঁর কবিজীবনের আদ্যন্ত সক্রিয় হয়েছে। সচেতনভাবে কবি যখন পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের কাব্যাদর্শে 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদবধ' রচনায় ব্যাপৃত, তখনও স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরাবেগের তাড়নায় তাঁর কবিচিত্ত 'রাধাবিরহে'র বিপুল ভাববন্যায় ভাসমান। মেঘনাদবধে এ লিরিক উচ্ছ্বাসের আবির্ভাব অতর্কিত, আর 'ব্রজাঙ্গনাকাব্যে' (১৮৬১) সে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ সহজ, সাবলীল। ব্রজাঙ্গনার শিল্পপ্রমৃতি (technique) নির্মাণে কবি মধুসূদন গ্রীক 'ওড্' (Ode) জাতীয় কাব্যরচয়িতাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন, যতি ও মিল স্থাপনায় স্বাধীনতা দেখিয়ে বৈচিত্র্যহীন বাংলা পয়ার ছন্দোজগতে মুক্ত গতি ও বৈচিত্র্য এনেছেন,—আধুনিক নতুন টেকনিকের কাব্যস্রষ্টা হিসাবে মধুসূদনের এ গৌরব অবিস্মরণীয় সন্দেহ নেই,[১] কিন্তু ব্রজাঙ্গনা কাব্য সৃষ্টিতে মধুসূদনের বৃহত্তর গৌরবের কারণ হল লিরিক ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে অবিমিশ্র মানবিক বেদনাবোধকে বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম মুক্তিদান। বাঙালী কবির রুদ্ধ হৃদয়ের এ যবনিকা উন্মোচন কী বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল, সেদিনের কাব্যপাঠক তার পূর্ণ তাৎপর্য

১ এ কাব্যের যতি সংখ্যায়, ছত্র সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখিয়েছিলেন সে স্বাধীনতাকে ডঃ সুকুমার সেন অমিত্রাক্ষর পয়ার-প্রবর্তন অপেক্ষাও গুরুতর বলে মনে করেন। দ্রষ্টব্য: উক্ত লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭

উপলব্ধি করতে না পারলেও রবীন্দ্রকাব্যের সাগরসঙ্গমে এসে তার মর্মার্থ গ্রহণে আমাদের বাধা ঘটে না।

শুধুমাত্র মানবিক বেদনাবোধই 'ব্রজাঙ্গনা'র একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ব্রজাঙ্গনা আধুনিক বাংলা কাব্যে অন্যতম রোমান্টিক কল্পনা-সমৃদ্ধ কাব্য। মধুসূদনের সংযত-গম্ভীর ক্লাসিক মনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এই রোমান্টিক চেতনায় আলোছায়ার খেলা যুগপৎ কাব্যপাঠককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে। 'ব্রজাঙ্গনার' বিরহিনী রাধিকা নিজের বেদনার্ত হৃদয়ের ম্লান ছায়া দেখেছে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে; মানব হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতি হৃদয়ের একাত্ম উপলব্ধিতে বাংলা কাব্যে এলো একটা উদার বিস্তৃতি ও গভীরতা;—য়ুরোপীয় রোমান্টিক প্রেম কবিতার (Love-Lyrics) আদর্শে বাংলা প্রেমকাব্য মধুসূদনের সহৃদয় অনুভবে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান পেল। আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্রমবিকাশের ধারায় ব্রজাঙ্গনার সুনির্দিষ্ট স্থান হল এখানে।

এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মধুসূদনের কাব্যধারায় ব্রজাঙ্গনা এক হিসাবে নিঃসঙ্গ কাব্য। নিঃসঙ্গ বলার কারণ হল, সচেতনভাবে মধুসূদন এ কাব্যে গ্রীক 'ওডের' স্বাধীন ছন্দ (Vers Libre) অনুসরণ করলেও অন্তরাবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশের ক্ষেত্রে এ কাব্যের সাদৃশ্য দেখা যায় প্রচলিত বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে। অলঙ্কৃত শব্দযোজনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব এবং কবিতার শেষে নিজের নামের ভণিতা প্রয়োগে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মিত্রাক্ষরে রচিত বলে বাংলা ছন্দের রাজ্যে বিদ্রোহী মধুসূদন এ কাব্যখানি প্রকাশে দ্বিধা ও বিলম্ব করেছিলেন বলে কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় শুধু মিত্রাক্ষরের জন্যে নয়, ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ গতানুগতিকতামুক্ত নয় বলেই স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী কবির এই কাব্য প্রকাশে দ্বিধা ও দীর্ঘসূত্রিতা। এ ছাড়া বাংলা কাব্যের বহুকর্ষিত ক্ষেত্রে পদচারণা করবার স্পৃহাও বোধ হয় ক্রমশঃ হারিয়েছিলেন মধুসূদন; না হলে শুধুমাত্র বন্ধুর বিরূপ সমালোচনায় তিনি ব্রজাঙ্গনার দ্বিতীয় খণ্ড রচনা-পরিকল্পনা বিসর্জন দেবেন—এ মত বিচারসহ বলে বোধ হয় না। সে জন্যে বলছিলাম, ব্রজাঙ্গনা মধুকবির ভাবময় মুহূর্তের নিঃসঙ্গ প্রিয় কাব্য। বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে ভাবসম্পর্ক-স্থাপনোৎসুক সচেতন কবি মধুসূদন তাই সদম্ভে

বলতেন, মেঘনাদবধ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমরতার আসন দেবে, আর আবেগপ্রবণ বাঙালী কবি মধুসূদন প্রবল ভাবাবেগের মুহূর্তে এ-সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না যে, "মেঘনাদবধ অপেক্ষা আমার 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ভাল।" (মধুস্মৃতি, পৃঃ ১৯৬)

"বীরাঙ্গনা" (১৮৬২) মধুসূদনের কবিপ্রতিভার স্ব-ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের কাব্য। বিষয়বস্তু পরিকল্পনা এখানেও তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধের মত ভারতীয় পুরাণ থেকে গৃহীত, কিন্তু ভাবাদর্শ ও প্রকাশভঙ্গীতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সচেতন ভাবে স্বীকৃত। হোমার-ভার্জিল-দান্তে-টাসো ও মিল্টনের কাব্যাদর্শ পরিক্রমার পরে এবার শুরু হয়েছে ইটালীয় কবি ওভিদ (Ovid)-এর Heroic Epistles, আর ইংরাজ কবি পোপের Epistles-এর কাব্যাঙ্গিক বাংলা কাব্যে প্রবর্তনের সচেতন প্রয়াস। ভাবপ্রকাশের বাহনও সবলতর হয়েছে নতুন শক্তির আবির্ভাবে। এ-শক্তির উৎস বর্ণনামূলক রচনাদর্শের (narrative) স্থলে নাটকীয় (dramatic) রীতির আদর্শ অনুসরণ। মেঘনাদবধে ও ব্রজাঙ্গনায় সে রীতির পূর্বসংকেত, বীরাঙ্গনায় পূর্ণতা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থকতম সমাধান-প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় এ-কাব্যে। মেঘনাদবধের কঠিন-কঠোর বাগ্‌রীতি ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার করুণ মাধুর্যের সম্মেলনে বীরাঙ্গনার প্রকাশ ভঙ্গীতে এসেছে একটা অভূতপূর্ব symmetry। অমিত্রচ্ছন্দের এ আদর্শ প্রকাশ বাংলা কাব্যে প্রথম ও শেষ—অননুকরণীয়, অনতিক্রান্ত—আপন ঔজ্জ্বল্যে দ্যুতিমান্।

বীরাঙ্গনার আঙ্গিক পরিকল্পনায় মধুসূদন ওভিদের অনুগামী হলেও চরিত্র নির্বাচনে এবং ভাবব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। ওভিদের নায়িকাদের জীবনে রোমান্টিক প্রণয়প্রবৃত্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বীরধর্মী নায়িকাদের আদিম শৌর্যবোধ; আর মধুসূদনের নায়িকাদের মধ্যে বীরধর্মী নায়িকার সন্ধান কমই মিলে। মধুসূদনের দৃষ্টিতে এই নায়িকারা বীরধর্মী নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় ও প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধে। শকুন্তলা, গঙ্গা ও জনাচরিত্র এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মধুসূদনের কোন কোন সমালোচক এ-সমস্ত চরিত্রের বিদ্রোহিতা দেখে কবির চরিত্র-পরিকল্পনার উপর আধুনিক বাঙালী

রেনেসাঁসের নিঃসন্দিগ্ধ প্রভাব অনুমান করেছেন।[১] কিন্তু এ অনুমান কতটা শ্রদ্ধেয় তা বিচারসাপেক্ষ। মধুসূদন মুখ্যতঃ ভাবপ্রবণ কবি ও শিল্পী। মানুষের জীবনের চিরন্তন রহস্য, নারী অন্তরের স্বতন্ত্র বেদনাবোধ তাঁর কবিকল্পনার প্রধানতম উপাদান। মননশীল ব্যক্তি হিসাবে সমসাময়িক জীবনসমস্যার প্রতি মধুসূদন অনবহিত ছিলেন বলা যায় না, কিন্তু যুগসমস্যা তাঁর অবিমিশ্র শিল্পি-সত্তাকে কোথাও আচ্ছন্ন করেছে বলে মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যদর্শের প্রভাবে তিনি স্বাতন্ত্র্যধর্মী কোন কোন নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সমস্ত চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে কবির অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ। চিন্তাবিচারহীন এ বিপুল ভাবাবেগই কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করেছিল নারীমনের নিত্য নতুন রহস্য আবিষ্কারে। এ-ভাবদৃষ্টি প্রভাবেই শিল্পী মধুসূদন প্রবেশ করেছিলেন নারীমনের অন্তর্লোকে। "মধুসূদন চিন্তাশিল্পী নহেন—ভাবশিল্পী"—মধুসূদনের শিল্পচেতনা প্রসঙ্গে সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের এ-উক্তিই অভ্রান্ত বলে মনে হয়।

মধুসূদনের রোমান্টিক ভাবাবেগ প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে দ্রৌপদী, কৈকেয়ী, শূর্পনখা, ও তারা চরিত্র সৃষ্টিতে। এই সমস্ত চরিত্রের মানসপ্রবৃত্তি জটিল, কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক। চরিত্র সৃষ্টিতে সে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন কাব্যপাঠকের রুচিকে পীড়িত করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই যুগের পক্ষে অগ্রগামী মধুসূদনের শিল্প রাজ্যে প্রবেশ করবার অক্ষমতাই এই পীড়ার কারণ বলে অনুমিত হয়। সুগভীর সহানুভূতি, অতলান্ত সহমর্মিতা, আর অনুভবক্ষম রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির প্রেরণায় কবি-শিল্পী মধুসূদন দ্রৌপদী, কৈকেয়ী, শূর্পনখা ও তারার মনের রহস্যাচ্ছন্ন দিকটিকে আলোকিত করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। বাংলা কাব্যে তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বীরাঙ্গনা কাব্যের বিশিষ্ট তাৎপর্য হল এখানে।

---

১ 'যুগসৃষ্টির ভাবানুষঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখব,—বীরাঙ্গনার প্রতি পত্রে রেনেশাঁ যুগের বিদ্রোহ ও মর্মপীড়া যুগপৎ প্রতিটি নারীচরিত্রে কোন না কোন রূপে অনুস্যূর্ত হয়ে আছে।' ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১২

'চতুর্দশপদী কবিতা' (১৮৬৫) মধুসূদনের পরিণত উপলব্ধির কাব্য। স্বর্গ-মর্ত্য পরিক্রমা সমাপ্ত করে কবি-অন্তর এখানে নতুন পিপাসার তৃপ্তি খুঁজেছে পৃথিবীর পথে। ফলে এ-কাব্যের বহিরঙ্গে লেগেছে নতুন রং আর অন্তরঙ্গে জেগেছে নতুন সুর। অমিত্রচ্ছন্দের উদ্ধত মহিমা এখানে অন্তর্হিত, ভাব প্রকাশের ভাষা এখানে সংযত-গম্ভীর, কোন কোন স্থানে কোমল-মসৃন। দুঃখবেদনার হুতাশনে কবি-মনের আবাল্যলালিত অহমিকা দগ্ধীভূত এবং সে ভস্মবিভূতির মধ্যে জন্মলাভ করেছে নব-দৃষ্টিতে জ্যোতিষ্মান্ একটি সম্পূর্ণ মানবিক সত্তা। 'চতুর্দশপদী কবিতা' সেই নবজাগ্রত মানবিক সত্তার আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম-বিরহের সঙ্গীতে ভরপূর।

বিদেশে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেও স্বদেশীয় কাব্য-সরস্বতীকে নতুন আভরণে সজ্জিত করবার আকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের চিত্তে তখনও সজীব। তাই আত্মমুখী ভাবকল্পনার বাহন হিসাবে মধুসূদন গ্রহণ করলেন য়ুরোপীয় কাব্যের নবজন্মের পথিকৃৎ ইটালীয় কবি পেত্রার্কার সনেটের আঙ্গিক। সে সংযত কবিভাষার মাধ্যমে নিজ অন্তরনিরুদ্ধ ভাবপ্রবাহকে মুক্তি দিলেন মধুসূদন আত্মমুখী কবিতার সহস্রধারায়। বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট বিশেষ ভাবে স্মরণীয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এ বৎসরেই প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা। এই দু'খানি গদ্য-পদ্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাঙালীর বহুকাল সঞ্চিত নিরুদ্ধ অন্তরাবেগ সর্ব-প্রথমে মুক্তি খুঁজে পেল। এক হিসাবে মধুসূদনের এই নবতর ভঙ্গীর কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কারের চাইতেও গভীর তাৎপর্যময়; কারণ এ আত্ম-মুখী ভাবপ্রকাশের পথ অনুসরণ করেই মধুসূদনের উত্তরসূরী বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রোত্তর বহু কবি আধুনিক বাংলা কাব্যের দিগন্তসীমাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের উদার ব্যাপ্তির অভিমুখে।

সনেটের মাধ্যমে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের দিক দিয়ে মধুসূদনের প্রয়াস পেত্রার্কের চাইতেও বিস্তৃততর ও বলিষ্ঠতর। পেত্রার্ক যেখানে শুধুমাত্র প্রেমপ্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে স্বীয় অন্তরকে অনাবৃত করেছিলেন, মধুসূদন সেই স্থলে নিজের গভীরতর উপলব্ধিকে উৎসারিত করেছেন স্বদেশানুভূতি, নিসর্গানুভূতি, মানব-মাহাত্ম্যানুভূতি এবং আরও বিচিত্র অনুভূতিকে

অবলম্বন করে। আবার সনেটের মধ্যে আত্মমুখী ভাবকল্পনা কাব্যরূপ পেলেও বিহারীলালের সঙ্গে মধুসূদনের হৃদয়ধর্মের পার্থক্যও সুচিহ্নিত। বিহারীলালের হৃদয়ানুভূতি যেখানে একটা আত্যন্তিক রহস্যময় মায়াজালের আবরণে অবগুণ্ঠিত, মধুসূদনের ভাবতন্ময় আত্মভাবনা সেখানে সূর্যালোকের সুস্পষ্ট দীপ্তিতে আলোকিত।

মধুসূদনের স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনার পরিচয়বাহী এই 'চতুর্দশপদী কবিতা'বলী। স্বদেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কবিহৃদয়ের মমতা কত গভীর ছিল, কবি বোধ হয় স্বদেশে বাসকালে নিজেও এত সচেতন ছিলেন না। স্বদেশের মাটির সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের ফলেই স্বদেশাত্মার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বদেশপ্রেমিক কবি। মধুসূদনের কাব্যে তাঁর বাঙালী-প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ও গভীরতম প্রকাশ যদি কোথাও হয়ে থাকে সে তাঁর 'মেঘনাদবধে' নয়—'চতুর্দশপদী কবিতা'য়। এই কাব্যে মধুসূদনের সংস্কৃতিপ্রীতি সংকীর্ণ দেশসীমার ঊর্ধ্বে—ভারতীয় রেনেসাঁসের নবারুণরাগে রঞ্জিত। মানব মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পৃথিবীর যে কোন দেশে যখনই তিনি দেখতে পেয়েছেন, তখনই তার প্রতি ভক্তিপ্রণত চিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে কুণ্ঠিত হননি উদারচিত্ত কবি।

স্বদেশীয় আত্মার মর্মলোকে প্রবেশ করেও পরিশীলিত বুদ্ধি ও বিস্তৃত হৃদয়ানুভূতি দিয়ে বিশ্বাত্মার হৃদস্পন্দন অনুভব করা যদি আধুনিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ হয়,মধুসূদন সেই উদার সংস্কৃতি-প্রভাবান্বিত প্রথম সার্থক বাঙালী কবি—আধুনিক সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

কবি-অন্তরের বেদনাস্পন্দিত লিরিকধর্মী কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মধুসূদনের বিদেশযাত্রার পূর্বে রচিত 'কবিমাতৃভাষা', 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি'-ও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবি-হৃদয়ের পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়—সেজন্য সে প্রসঙ্গ এই আলোচনার বহির্ভূত।

১১

গদ্যে রসসৃষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ সংস্কৃতির নবরূপ

বঙ্কিমচন্দ্র

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দান অপরিমেয়। একজন মাত্র শক্তিধর স্রষ্টার প্রতিভাস্পর্শে বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের এত বড় জাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনে আর ঘটেনি। যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য জগৎসভায় আজ বাঙালীর একমাত্র সম্পদ, তার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয় বঙ্কিমের অতন্দ্র সাধনায়। সাহিত্যসৃষ্টি ও সংস্কৃতি আলোচনা বঙ্কিমের নিকট অবসর বিনোদনের বিলাসচর্চা বা জীবিকার তাড়নায় মনোহারী পণ্য নির্মাণের মত কাজ ছিল না। মানব-সভ্যতার এই দুটি উপকরণ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চেতনারই অঙ্গীভূত। জগতের শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পীদের মত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনকে একসূত্রে গ্রথিত করে দেশজননীর কণ্ঠে এক অম্লান মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন মননশীল শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। একটু ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ মনে হলেও এই মন্তব্য বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, বঙ্কিমের প্রকৃত রূপ হল পূজারীর। রসিকের জীবনানুভূতি দিয়ে একদিকে করেছেন তিনি রহস্যময় জীবনের পূজা, আবার জ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে সেই পূজার অপূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন এই শ্রদ্ধাশীল জ্ঞানতাপস। সেজন্যে বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, স্রষ্টার জীবনবেদনা পরিণতিতে জাতীয় ভাবনার অজস্র ধারায় বিকেন্দ্রিত। সহজাত রসস্রষ্টা শিল্পীর এরূপ আত্মবিলোপের উদাহারণ জগতের সাহিত্যে বিরল। স্বদেশের হিতচিন্তায় প্রিয়বস্তু বিসর্জনের এ মহত্বকে লক্ষ্য করেই মনীষী রমেশচন্দ্র বোধ হয় তাঁর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমকে "The greatest man of the nineteenth century" বলতে দ্বিধা করেননি। এ-জাতীয় গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এই প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের সকল কীর্তির মূল্যায়ন সম্ভব নয়; তাই বর্তমান অধ্যায়ের এ নাতিদীর্ঘ আলোচনা বঙ্কিমের বিশিষ্ট

শিল্প-সাধনা ও সংস্কৃতি রচনাপ্রয়াসের রূপরেখা-অঙ্কনেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সৃজনধর্মী রচনার অন্যতম উৎস হল লেখকের নির্বাধ কল্পনা, এবং কল্পনার শৈল্পিক প্রকাশের মধ্য দিয়েই সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে বলা চলে সংস্কার যুগ। এই যুগের গদ্য সাহিত্য মুখ্যতঃ নীরস, কল্পনাহীন ও জ্ঞানচর্চামূলক। সেই সাহিত্যকে সরস ও প্রাণস্পর্শী করে তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র সুদূরবিস্তারী ও বর্ণাঢ্য কল্পনার সাহায্যে। সৃষ্টিধর্মী লেখকের আবেগস্পন্দিত সুদূরের অভিমুখী কল্পনা গতিলাভ করে কখনও অতীত জীবন, কখনও বর্তমান জগৎ, আবার কখনও বা ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে অবলম্বন করে। এ-ধরণের কল্পনাকে ইংরেজ লেখকেরা অভিহিত করেছেন রোমাণ্টিক কল্পনা বলে—যার যথাযথ প্রতিশব্দ বাংলায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রোমাণ্টিক কল্পনার বহু লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন অনেক ইংরেজ লেখক। ওয়াট্স-দান্তন এ কল্পনা-প্রবৃত্তির ভিতর দেখেছেন—Renassance of wonder ; ওয়াল্টার পেটার দেখেছেন—addition of strangeness to beauty ; আর ক্রম্প্‌টন রিকেটের মতে A subtle sense of beauty এবং an exuberant intellectual curiosityই হল এ ধরণের ভাবকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। রোমাণ্টিক কল্পনার এই বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে ;—সে হল লেখকের তীব্র, তীক্ষ্ণ সৌন্দযচেতনা, এবং এই সৌন্দর্যচেতনার উদ্দীপনীশক্তি হল—"An extra-ordinary developement of imaginative sensibility" (Herford)।

কল্পনাপ্রবৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ ও লেখকের মননপ্রধান উদ্দাম কৌতূহলের ফলেই খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (Age of Romantic Revival, C1780-C1830) সৃষ্টি হয়েছিল ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও জার্মাণীতে এক বিপুলপ্রসার, বিচিত্রধর্মী প্রাণবন্ত সাহিত্য। পূর্বযুগের Order, clarity ও tranquility-তে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক্লাসিক সাহিত্যপাঠকের সামনে এই সৌন্দর্য-সচেতন সাহিত্য খুলে দিল রসানুভূতির নব নব প্রবেশদ্বার। জীবনের বিচিত্র-সুন্দর রূপ দেখতে পেল পাঠক সৌন্দর্যস্রষ্টা কথাশিল্পীর সুসজ্জিত চিত্রশালায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলনের বর্ণহীন আকাশে সেই যুগের বাঙালী পাঠক দেখতে পেল সাতরঙা রামধনুর বর্ণবিলাস। বঙ্কিমের সেই নির্বাধ সৌন্দর্যচেতনা কৌতূহলী করে তুলল বাঙালী পাঠককে মানবজীবনের রহস্যের প্রতি। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের কল্পনাধর্মী উপন্যাসের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের তাৎপর্য হল এখানে।

সৌন্দর্যমুগ্ধ চিত্তের রঙীন কল্পনাকে রূপ দেবার বাহন হিসাবে উপন্যাসের টেক্‌নিক গ্রহণ করলেও বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল আসলে রোমাণ্টিক কবির প্রতিভা। সেজন্য বঙ্কিমের অনুভূতিশীল কবিচিত্ত বহু ক্ষেত্রে বাস্তবজীবন-পরিবেশ ত্যাগ করে সৌন্দর্যসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিল প্রধানতঃ ইতিহাসের সুদূর অতীত জীবনকে অবলম্বন করে। অতীতচারী দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্কিম অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন ইংরাজ রোমাণ্টিক ঔপন্যাসিকের সমধর্মী। উপন্যাস রচনার প্রারম্ভে অতিরিক্ত রোমান্স প্রবণতার জন্য কল্পনা-কেন্দ্রে দুর্বলতারও পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রথম ব্রতীর সংশয়কে সবলে অতিক্রম করে তাঁর স্বতন্ত্র সৃষ্টিনৈপুণ্য দ্বিতীয় উপন্যাসে প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল, সে কথা বঙ্কিমের উপন্যাস পাঠকমাত্রেরই নিকট সুপরিজ্ঞাত। বঙ্কিমের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও স্মরণযোগ্য, স্বভাবধর্মের দিক দিয়ে রোমাণ্টিক কল্পনার অধিকারী হলেও এই প্রতিভাবান শিল্পী কোন কোন উপন্যাসে সমাজচিন্তার বন্ধুর ক্ষেত্রে বিচরণ করতেও দ্বিধা করেননি। হোক সে সমাজভাবনা রক্ষণশীল, কিন্তু সে চিন্তা লেখকের প্রাণ ও জ্ঞানের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমের রোমাণ্টিক কল্পনার বর্ণাঢ্য জগৎ সমকালীন কথাশিল্পী ও বিস্মিত পাঠকের সামনে একটা অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যজগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল বটে, কিন্তু সে মাত্রাতিশায়ী ভাবকল্পনা শুধু বঙ্কিম-উপন্যাসকে নয়, সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসকেও করে তুলেছিল অনাবশ্যক আড়ম্বরের ভারে ভারাক্রান্ত। সাধারণ মানুষের জীবনসমস্যা রইল তাঁদের শিল্পসাধনার এলাকার বাইরে, বিশিষ্ট মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তির সংঘাত বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠল তাঁদের উপন্যাস-শিল্প। নবসৃষ্টির দুর্দম প্রেরণা সত্ত্বেও Romantic Revival

যুগের ইংরাজী সাহিত্যে যে আপেক্ষিক চিন্তাদৈন্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল সে কথা স্মরণ করে একজন ইংরাজ লেখক মন্তব্য করেছেন :

"Romanticism as expressed in the literature of the age had, of course, in common with every great movement, definite limitations of its own. It was essentially a school of ideas, of splendid generalisations. Little attempt was made by its exponents to apply their ideas to the concrete problems of the day : it harped on Man rather than Men, sought the way of escape from modern conditions of life rather than a reconstruction of that life,......... too readily accepted what was primitive, wild, strange, and picturesque, as the essential glories of life. Among its lesser souls, moreover, we see the tendency to exalt the merely bizzare, and to replace the old conventions of "correctness" at all costs for extravagances at all costs."

উক্ত মন্তব্য বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনাপ্রধান উপন্যাস সম্পর্কে যেমন সত্য তেমনি সত্য তাঁর ব্যর্থ অনুকরণকারী সমসাময়িক কাল্পনিক কাহিনী স্রষ্টাদের সম্পর্কে। তাঁর সৃজনধর্মী সাহিত্য সেই যুগের কথাসাহিত্যে যে এতটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে বঙ্কিম হয়ত তা পূর্বে অনুমানও করতে পারেন নি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন তিনি দেখতে পেলেন তাঁরই প্রদর্শিত শিল্পরচনার পথে বিচরণ করতে গিয়ে অক্ষম লেখকেরা নিত্য নিয়ত পদস্খলিত হচ্ছেন, তখনি স্ব-সাহিত্য প্রেমিক বঙ্কিম কঠোর সমালোচনার দণ্ড উদ্যত করে সচেষ্ট হলেন এ-ধরণের লেখকদের অক্ষম শিল্পপ্রয়াস থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে। এই হল বঙ্কিমের সমালোচনা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস যার সঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠক মাত্রই সুপরিচিত। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে এখানে আলোচ্য নয়।

বঙ্কিমের শিল্পিজীবনের দিক্-পরিবর্তনরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। সমসাময়িক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াস দেখে বঙ্কিম হয়ে উঠলেন আত্মসমালোচক ; তাঁর উপন্যাস হল নবতর

আদর্শচেতনায় সঞ্জীবিত। তিনি উপলব্ধি করলেন, অনুশীলনের দ্বারা মানুষের চিত্তগঠনের পূর্বে নিছক রসচর্চা শ্রেয়োবোধের আদর্শ থেকে শিল্পীকে বিচ্যুত করে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের শিল্পাদর্শও হল বিবর্তিত। সেজন্যে উপন্যাস রচনার পরিণতিতে দেখি চিন্তাশীল শিল্পী বঙ্কিম তাঁর শিল্পাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অনুশীলনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে। আধুনিক সমালোচক বঙ্কিমের শেষ পর্যায়ের উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সাতারামে শিল্প-বিকাশের অপূর্ণতা দেখে ব্যথিত হন। বাস্তবিক পক্ষে এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনা যে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে তাতে সন্দেহও নেই। কিন্তু ব্যর্থ শিল্পসৃষ্টি বলে নিন্দিত এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে সচেতন শিল্পী বঙ্কিম তাঁর পরিণত শিল্প-ভাবনাকে এক নবতর প্রতিষ্ঠাভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন, এ সত্যও অনস্বীকার্য। পাঠকমাত্রই জানেন, বঙ্কিমের এই শেষ শিল্পপ্রয়াস ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির কল্যাণ-কামনায় নিয়োজিত হয়েছিল। শিল্পিমানসে সমাজভাবনা প্রাধান্য লাভ করায় এই উপন্যাস-ত্রয়ীর কলাবিধিতে দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্কেতবাহী এই উপন্যাসত্রয়ী সর্বযুগের পাঠকের নিকট মহৎ শিল্পের নিদর্শন বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের ঐতিহাসিক আবির্ভাব এবং বিবর্তন-রেখার সূত্র অনুসন্ধানের পর আধুনিক সৃজনধর্মী সাহিত্যে সেই উপন্যাসের প্রকৃত ভূমিকা কি এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ের আলোচনার প্রারম্ভেই একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট করেই চোখে পড়ে। আধুনিক ভাব ও আঙ্গিকের নতুন কাব্য রচনায় বঙ্কিমের সমকালীন কবি মধুসূদনের সামনে কোন পূর্ব ঐতিহ্য ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার পূর্বেও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮২।৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল্পনিক ইতিহাসের আশ্রয়ে এক ধরণের রোমান্স রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সে সমস্ত রূপকথা জাতীয় তরল রোমান্সের সঙ্গে বঙ্কিমের জীবনরহস্যসচেতন রোমান্সের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্ততঃ দুইখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল যার ভিতর বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রথম অভ্যাগমবার্তা ঘোষিত হয়েছে

এই দুইখানি উপন্যাসের একখানি হল প্যারীচাঁদ মিত্রের বাস্তব-জীবননির্ভর কাহিনী 'আলালের ঘরের দুলাল', আর একখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রোমান্সধর্মী 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। প্যারীচাঁদের পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল, আর ছিল সেই বিকৃত সংস্কৃতির যুগে নীতিধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা। কিন্তু তাঁর শিল্পাদর্শ উচ্চ শ্রেণীর ছিল না, আর অন্তর্দৃষ্টিও এত মর্মভেদী ছিল না যার সাহায্যে মানবমনের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক রূপ দিতে পারেন। ভূদেবের আপাত-নীরস ক্লাসিক মনের অন্তরালে সৌন্দর্যসচেতন যে একটা রোমান্টিক মন প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কাহিনী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই শ্রেণীর আরও কাহিনী রচনায় মনঃসংযোগ করলে ভূদেব হয়ত বঙ্কিম-পূর্ব রোমান্টিক কথাসাহিত্যে স্থায়ী যশের অধিকারী হতেন। কিন্তু যুগপ্রয়োজনে ক্রমবিলীয়মান পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পুনর্গঠনের জন্য প্রবন্ধ রচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করায় ভূদেব রোমান্টিক উপন্যাস রচনার পথে আর অগ্রসর হননি। বস্তুতঃপক্ষে প্যারীচাঁদ ও ভূদেব শুধুমাত্র নকিবের ভূমিকায় অভিনয় করে বাংলা উপন্যাসের দৃশ্যপটহীন রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় নিয়েছিলেন।

এই বিরলসজ্জা বাংলা কথাসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে রাজবেশে বঙ্কিমের আকস্মিক আবির্ভাব তাই আমাদের কাছে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলেই মনে হয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী কল্পনার ঐশ্বর্য নিয়ে সৃজনধর্মী বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর জীবনে নিশ্চয়ই একটা প্রস্তুতি-পর্ব ছিল— উপযুক্ত উপকরণের অভাবে যার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। তবে বঙ্কিম-জীবনের কোন কোন ঘটনা এবং যুগচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সে প্রস্তুতিপর্বের পুনর্গঠনে প্রয়াস পেতে পারি।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পূর্বযুগকে বলা চলে ভাবসংঘাতের যুগ। শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই ভাবসংঘাত শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য-সংস্পর্শের ফলে। এই ভাবসংঘাতের অনিবার্য ফল হল জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য শিক্ষিত বাঙালীর ক্লান্তিহীন প্রয়াস। বঙ্কিম-পূর্ব যুগকে

সেজন্য বলা চলে মুখ্যতঃ সংস্কার-যুগ। এই যুগের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য যেমন একটা প্রবল উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, তেমনি সাহিত্য সংস্কারের জন্যও। এই সংস্কারপ্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল 'নব্যবঙ্গের' বিদ্রোহচেতনার মধ্যে। ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে সে বিদ্রোহচেতনার কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রথম বিদ্রোহী নব্যবঙ্গেরই একজন—প্যারীচাঁদ মিত্র। ভাষা ও ভাবকে জীবনধর্মী সাহিত্যের বাহনে রূপান্তরিত করবার জন্যে এত সচেতন প্রয়াস প্যারীচাঁদের পূর্বে আর দেখা যায়নি। কিন্তু ভাবগভীর ও উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টির জন্য শিল্পীর যে মৌলিক প্রতিভার প্রয়োজন, সে প্রতিভা প্যারীচাঁদের ছিল না। এ ছাড়া আরও একটি অসম্পূর্ণতা ছিল প্যারীচাঁদের জীবনে—সে হল জীবন-রহস্যসচেতন পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের গভীর অনুশীলনের অভাব। জীবনের প্রতি প্যারীচাঁদের অনুরাগ গভীর হলেও স্ব-জীবনের বিচিত্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্যারীচাঁদ এই শ্রেণীর সাহিত্য অনুশীলনে গভীর মনঃসংযোগ করতে পারেন নি। প্যারীচাঁদের সমসাময়িক মধুসূদনের জীবনও সংঘাতময় এবং বিচিত্র। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বদেশীয় সাহিত্যের মান উন্নয়নের জন্য মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে গভীর অনুশীলন করেছিলেন তার নজির মধুসূদন-পূর্ব কোন লেখকের জীবনে দেখা যায় না। অলৌকিক প্রতিভার সঙ্গে বিস্তৃত সাহিত্যানুশীলন যুক্ত হওয়াতে অবশেষে জন্ম নিল ভাবগভীর এবং উচ্চাঙ্গের শিল্পসম্মত নবীন বাংলা কাব্য।

উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত কাব্যসৃষ্টিতে মধুসূদনের যে ভূমিকা, প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ সৃজনধর্মী গদ্য সৃষ্টিতে বঙ্কিমেরও সেই ভূমিকা। 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম' অলৌকিক প্রতিভা মধুসূদনের মত বঙ্কিমেরও ছিল, কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিভার স্পর্শেই এই নতুন গদ্য সৃষ্টি হয়নি। এই নবসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল বঙ্কিম-কর্তৃক পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের বিস্তৃত ও গভীর অনুশীলনের ফলে। যে যুগধর্মের প্রভাবে মধুসূদনের ও বঙ্কিমের জীবনে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ অনুশীলন-প্রবৃত্তি দেখা যায় মনীষী রমেশচন্দ্র তাকে অভিহিত করেছেন 'earnestness' বলে। এই মনীষীর মতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত স্বদেশীয় সাহিত্যের মান উন্নয়নের জন্যে বাঙালী লেখকদের

মধ্যে যে ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—তার সঙ্গে এই শতাব্দীর পূর্ববর্তী সাতশত বৎসরের সাহিত্য-প্রয়াসের তুলনা চলে। এ-ছাড়া তিনি এমন মন্তব্যও করেছেন, স্বদেশের সাহিত্যের রুচি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্যে মধুসূদনের এবং বঙ্কিমের সচেতন প্রয়াস প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় না; এবং দেখা না যাওয়ার প্রধান কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের আপাত-চাঞ্চল্যের মধ্যেও দেশাত্মবোধের যে প্রবল প্রেরণা স্রষ্টার অন্তরে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল, সেই প্রেরণা প্রাচীন বাঙালী-চিত্তে ছিল অনুপস্থিত।

মধুসূদনের মত বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙলা দেশের সেই নবযুগের চির-অতৃপ্ত জ্ঞানতাপস। বাল্যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যপাঠ তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করেছিল প্রাচীন সাহিত্যের রসজগৎ, রিচার্ড্‌সনের শিষ্য না হলেও প্রথম যৌবনে সেক্স্‌পীরীয় সাহিত্যপাঠে তন্ময়তা তাঁর অনুভূতিশীল মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল মানবজীবনের বৈচিত্র্য ও গভীরতা উপলব্ধিতে। এ ছাড়া স্বদেশীয় ও বিদেশী ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠক ছিলেন যুবক বঙ্কিমচন্দ্র। এই বিস্তৃত ইতিহাস পাঠ তাঁকে শুধু স্বদেশসচেতন করেনি, মানবপ্রকৃতির মূল্য নির্ধারণে সহায়তাও করেছিল প্রচুর। শুধুমাত্র রাজ্য ও রাজার উত্থান পতনের কাহিনী পাঠ নয়, ইতিহাসের মর্মমূলে প্রবেশ করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তিনি পরিণত যৌবনে। না হলে উপন্যাসে ইতিহাসকে এত সজীব রূপ দেবার প্রেরণা তিনি পেলেন কোথা থেকে? এ ছাড়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী রোমাণ্টিক উপন্যাস, বিশেষ করে স্যর ওয়াল্টার স্কটের বিচিত্র রূপরহস্যের জগত তাঁর জাগ্রত চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল বাংলা সাহিত্যে জীবনরসমাধুর্যে পরিপূর্ণ নিটোল রোমাণ্টিক কাহিনী রচনায়। সর্বোপরি পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যাদর্শ স্বী-করণের ফলে বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈদগ্ধ ও উন্নত রুচিবোধের অধিকারী হয়েছিলেন সেই বিদগ্ধরুচিই অবশেষে সৃষ্টি করল নবীন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য। স্রষ্টার এই উন্নত রুচি সমসাময়িক বাংলা গদ্যকে স্থূলতামুক্ত করেছে, আর সেই সঙ্গে অনাবিল হাস্যরসের আবির্ভাবে বাংলা গদ্য রুচিশীল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-পাঠকের নিকটও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নতুন সাহিত্য নির্মাণে বঙ্কিমের শক্তির এই বিচিত্র বিকাশ সচেতন অনুশীলনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল

সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই প্রতিভাবান পুরুষের একটা অতি-তীক্ষ্ণ ও অতি-সচেতন সৃষ্টিধর্মী কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে চরিত্র চিত্রণের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, এবং সহজাত কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে মানবজীবনের প্রতি সুগভীর বেদনাবোধ। এই স্বাভাবিক শক্তিস্পর্শে বঙ্কিমের হাতে সৃষ্টিধর্মী বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম প্রকৃত জীবনধর্মী হয়ে উঠল।

এ ছাড়া বঙ্কিমের বিশিষ্ট শিল্পিমানস গঠনে ব্যক্তিসংস্পর্শ ও যুগপ্রভাবের কথাও চিন্তনীয়। ব্যক্তিসংস্পর্শের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যের কথা সর্ব প্রথমেই মনে পড়ে। এই বিখ্যাত কবি-সাংবাদিক বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থায় তাঁর বহু মূল্যহীন কবিতা প্রকাশ করে তরুণ কবির যৌবন-স্বপ্নকে সযত্নে লালন করেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে যে উচ্ছল কৌতুকপ্রিয়তা দেখা যায় তার উপরও ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাস-তরল স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে বলেই মনে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের 'খাঁটি বাঙালী প্রীতি' আরও অন্তস্রোতা হয়ে বঙ্কিম-মানসে স্বদেশপ্রেমের গভীরতায় উজ্জীবিত। রঙ্গলালের আবেগপ্রধান স্বদেশপ্রেমের কাব্যোচ্ছ্বাসও দেখা গিয়েছিল বঙ্কিমের উপন্যাস-জগতে আবির্ভাবের পূর্বে। সহৃদয় দীনবন্ধু মিত্রের অন্তরঙ্গ সৌহার্দের প্রচ্ছায়ে তাঁর অন্তরের সরসতা পুষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলার' প্রেরণাও স্বদেশীয় সংস্কৃতির দিকে তাঁর জাগ্রত মনকে সবলে আকর্ষণ করে থাকবে এও খুব বিচিত্র নয়। বঙ্কিম উপন্যাসে যে নীতিধর্মের উৎকট প্রকাশ দেখা যায় তা সমকালীন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের নীতিবাদী আন্দোলনের প্রভাবজাত কিনা তাও অনু-সন্ধানের বিষয়। তবে এ কথা সত্য, যুবক বঙ্কিমচন্দ্র জীবননীতি সম্পর্কীয় কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনতে ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ বিপ্লবের তরঙ্গক্ষেপ বঙ্কিম দেখেছিলেন; সেই সমাজ-বিপ্লবে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও সমকালীন যুগসমস্যাকে তিনি তাঁর সামাজিক উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন—অবশ্য নিজের জ্ঞানবিশ্বাস মত। স্বীয় যুগের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কেও বঙ্কিম এসেছিলেন; কিন্তু এই মহাপুরুষ প্রদর্শিত নিছক নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করবার স্পৃহা জীবনরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-ভাবনার প্রভাব তাঁর শিল্পভাবনাকে প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত না করলেও তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ পর্যায়ে

স্বদেশাত্মার রূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশের জনসাধারণের মধ্যে। ইংরাজ-বিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস না থাকলেও তাঁর উপন্যাস যে সমসাময়িক রাষ্ট্রচিন্তাবিমুক্ত এ কথা বলা চলে না। নবপ্রতিষ্ঠিত 'ভারত-সভার' (১৮৭৬) প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন; কংগ্রেসের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল, তবে সে যুগের কংগ্রেস গণধর্মী ছিলনা বলে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থরক্ষার উপযোগী কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। শাসকের অত্যাচারে দেশের গণজীবনে যে অবর্ণনীয় দুর্দশা উপস্থিত হয়—এই রাষ্ট্রচিন্তা তাঁর শেষ পর্যায়ের একখানি উপন্যাসে জীবন্ত রূপ পেয়েছে। পাদ্রী হেষ্টি ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিতর্কে তাঁর মনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যে চিন্তা জাগ্রত হয়েছিল তারও অনিবার্য প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে বঙ্কিমের পরিণত শিল্পভাবনার উপর।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পি-মানস গঠনে উক্ত সম্ভাব্য প্রভাবের কথা চিন্তার পরে এবার বঙ্কিম-উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস Rajmohan's wife ও স্ব-কৃত অনুবাদ অসমাপ্ত 'রাজমোহনের স্ত্রী' পাশ্চাত্ত্য রোমান্স-প্রীতির প্রত্যক্ষ ফল। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের অনুকরণ-প্রবৃত্তিই মুখ্য, সেজন্য স্বতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষরহীন। নিতান্ত অপরিণত মনে হওয়াতে বঙ্কিম বোধ হয় এই উপন্যাসখানি প্রকাশে ইচ্ছুক হন নি। রোমান্টিক ঘটনাপ্রধান হলেও এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সে হল এই উপন্যাসখানি ইতিহাসের প্রভাববর্জিত বঙ্কিমের প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস। তাঁর মতে "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটি প্রধান সূত্র এই প্রথম প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে অপ্রকাশিত রহিয়াছে।"[১] যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেণীর উপন্যাস অসাধারণ রসবৈচিত্র্য লাভ করেছে, তাঁর প্রথম সৃষ্টি সেই বিশেষত্বহীন।

১ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ২৭৩

এই ব্যর্থ প্রয়াসের পর বঙ্কিম অর্ধ-ঐতিহাসিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিক ও ধর্মনীতি-নির্ভর কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করে বৈচিত্র্যহীন বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও অবশ্য স্বীকার্য, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস লেখকের অনুভবক্ষম রোমান্টিক চেতনার স্পর্শে বাস্তবাতীত মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণযোগ্য: সৃজনধর্মী সাহিত্য মাত্রেরই লক্ষ্য পাঠকের মনে কল্পলোকের সংকেত সৃষ্টি করা। সেই কল্পলোক অবশ্য মানুষের অনুভূতিনির্ভর। শিল্পস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র অভিজ্ঞতার জগতেও বিচরণ করেছেন, কিন্তু সেই জগৎ রোমান্টিক শিল্পীর স্বীয় মানস-পরিমণ্ডলে সৃষ্ট। এই কারণে সমকালীন জীবনদ্বন্দ্বমুখর বাস্তব অভিজ্ঞতার অসমতল রাজ্যে বঙ্কিমের শিল্পিমন স্বচ্ছন্দ-বিচরণের অবকাশ পায় নি। তাঁর অনুভূতি-নির্ভর জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে সর্বযুগের মানবমনের দ্বন্দ্ব চিত্রণে। মানুষের অন্তর্নিহিত যে প্রচণ্ড প্রবৃত্তি তার সচেতন বুদ্ধিকে অভিভূত করে তাকে জীবনের স্বাভাবিক কক্ষপথ থেকে আক্ষিপ্ত করে—সুগভীর হৃদয়ানুভূতির সাহায্যে সে বেদনাসুন্দর জীবনের রূপ অঙ্কিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিচিত্রধর্মী উপন্যাসে। এই প্রচেষ্টায় জীবনশিল্পী বঙ্কিম নিঃসন্দেহে সেক্স্‌পীয়রের অনুগামী। অবশ্য সেক্স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডির উৎকর্ষ বঙ্কিম-উপন্যাসে আছে কিনা তা তর্কের বিষয়। কিন্তু জীবনের যে জটিল রহস্যবোধ সেক্স্‌পীয়রকে মানবমনের অন্তর্লোকে প্রবেশের প্রবর্তনা দিয়েছিল, সেই একই রহস্যচেতনা বঙ্কিমের রোমান্স সৃষ্টির মৌল প্রেরণা। আত্মঘোষণায় বঙ্কিম মধুসূদনের মত মুখর নন। মিল্টন-প্রতিভামুগ্ধ মধুসূদনের মত ভাবোচ্ছ্বসিত হলে বঙ্কিমও নিশ্চয়ই বলতেন—"সেক্স্‌পীয়র দেবতা!" গ্রীক নাটক এবং মিল্টনের কাব্যের ভাবানুষঙ্গে এসে বাংলা কাব্যের যেমন বন্ধনমুক্তি ঘটল, তেমনি সেক্স্‌পীয়রের জীবনচিন্তার সান্নিধ্যে এসে বাংলা কথাসাহিত্যও হয়ে উঠল ভাব-গভীর। প্রথম উদ্যমে বঙ্কিমের তরল রোমান্সসৃষ্টি-প্রবণতা তাঁর পরবর্তী বিচিত্রধর্মী উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কত ভাবঘন রূপ লাভ করেছে, এখন তাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রোমান্টিক উপন্যাস। কল্পনাকেন্দ্রে কোন কোন স্থানে অসঙ্গতি, অতিনাটকীয় ঘটনা ও বাক্যবিন্যাস, ডিটেক্‌টিভ কাহিনীসুলভ কৌতূহল-সৃষ্টি-প্রবণতা এই উপন্যাসে বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করলেও নানা কারণে এই উপন্যাসখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্য-জগতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, মানুষের জীবনকাহিনীর আশ্রয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনার আদি প্রয়াস এই গ্রন্থ; দ্বিতীয়তঃ, নরনারীর প্রণয়-প্রবৃত্তির রহস্যাচ্ছন্ন দিকের রূপময় প্রকাশে পরম চিত্তাকর্ষক এই কাহিনী। সমকালীন কথাকার প্যারীচাঁদের মত সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্নে এখানে শিল্পিমন আন্দোলিত নয়, অতর্কিত ঘটনার অবতারণায়, নারীমনের তির্যক গতি অঙ্কনে সৌন্দর্যের এক অপরূপ মায়ালোক সৃষ্টিই এই উপন্যাস-রচনায় লেখকের মুখ্য প্রয়াস। এই কল্পনার জগৎ রোমান্সের স্বপ্নস্বর্গলোক। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ও প্রতিনায়িকাকে বলা যায় 'রোমান্সের পরমহংস'। যে আত্মবিহ্বল ভাবপ্রেরণায় সৌন্দর্যের স্বপ্নলোকে মানসপ্রয়াণ করেছিলেন মধুসূদন তাঁর কাব্যপ্রয়াসের প্রথম পর্যায়ে (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে), সেই অনুভূতিনির্ভর তীব্র সৌন্দর্যচেতনায় বঙ্কিমও যাত্রা করেছিলেন কল্পনার ইন্দ্রলোকে তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের সূচনায়। উভয় শিল্পীর যাত্রার লক্ষ্য সৌন্দর্য্যের অমৃত লোক। প্রথমোক্ত শিল্পীর সৌন্দর্যজগতের পটভূমিকায় মুখ্যতঃ সুদূর পৌরাণিক জগৎ, আর শেষোক্ত শিল্পীর শিল্পজগতের প্রেক্ষাপটে রয়েছে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ইতিহাসের অস্পষ্ট অধ্যায়। তাঁদের সমসাময়িক বাঙালীর জীবনপ্রবাহ ছিল রূঢ় বাস্তব সমস্যার সাজ্ঘাতে তরঙ্গিত এবং স্থিতিস্থাপকতাহীন। সেজন্যে উভয় শিল্পীই মানসযাত্রা করেছিলেন অতীত জীবনরাজ্যে কলা সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। রোমান্টিক কল্পনার এই অবাধ মুক্তির ফলে বাংলা কাব্য হয়ে উঠল যেমন সজীব, আধুনিক সৃষ্টিধর্মী গদ্যও হয়ে উঠল তেমনি নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত। শিল্পকলায় অপূর্ণতা সত্ত্বেও সৃষ্টিধর্মী আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'দুর্গেশনন্দিনীর' সুনির্দিষ্ট স্থান হল এখানে। বঙ্কিম-প্রদর্শিত এই ঐতিহাসিক রোমান্সের রাজপথ অনুসরণ করেই বাংলা কথাসাহিত্যের শুরু হল জয়যাত্রা। শুধু বঙ্কিম যুগের

অধিকাংশ ঔপন্যাসিক নয়, বঙ্কিমের অব্যবহিত পরবর্তী শক্তিমান কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উপন্যাস রচনার প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিম-প্রদর্শিত ঐতিহাসিক রোমান্সের আদর্শকে যে অতিক্রম করতে পারেন নি, এই সত্য তো সকলেরই সুপরিজ্ঞাত।

কল্পনাপ্রসার ও শিল্পধর্মের দিক দিয়ে "দুর্গেশনন্দিনী"-র সঙ্গে "কপালকুণ্ডলা"র (১৮৬৬) ব্যবধান অকল্পনীয়। শুধুমাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে বঙ্কিমের সৃষ্টিপ্রতিভার এই অনন্যসুলভ বিকাশ মুগ্ধ পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃত করে দিল এক অসীম সৌন্দর্যজগৎ। সেই জগতের বিপুল বিস্তৃতি প্রকৃতির বৃহৎ ব্যাপ্তিতে ও মানবমনের রহস্যের গভীরতায়। এই কাব্যধর্মী উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানবজীবন একই অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত—একে অপরের পরিপূরক। বিদগ্ধ সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই উপন্যাসের উৎকর্ষ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: বঙ্কিমচন্দ্র "এই উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্যের সন্ধান করিয়াছেন। একের উপর অপরের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে, কেহ অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করে নাই।" প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়েছে কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে; আবার নারীমনের রহস্যাচ্ছন্ন তির্যক গতি ও স্বভাব-দুর্বল পুরুষের রূপমোহের পরিণতি বাস্তব-সুন্দর রূপ পেয়েছে মতিবিবি ও নবকুমারের চরিত্রে। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ভাবসংঘাত, কল্পনার ঐশ্বর্য, বর্ণনার দীপ্তি, ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ রচনার আশ্চর্য দক্ষতা কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। একদিকে বাস্তব ইতিহাস আর একদিকে আদিমতাধর্মী প্রকৃতিজীবনকে বর্ণবহুল ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যে একই বৃন্তে বিধৃত করেছেন ভাবশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। সমস্ত কাহিনীটি যেন কল্পনাবিলাসী কবি বঙ্কিমের একটি চমৎকার লিরিক কবিতার সুরে অনুরণিত —বাংলা কথাসাহিত্যে একক-তুলনারহিত।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে লেখকের প্রকাশরীতি বিচিত্র; জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতেও স্বাতন্ত্র্য আছে। উচ্চকোটির সাধুভাষার সাহায্যে প্রকৃতির সীমাহীন ঐশ্বর্য বর্ণনায় সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে যেমন একটা গম্ভীর ভাবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, রমণীর রূপ বর্ণনায় তেমনি কোথাও বা পুস্তকগত আদর্শ আবার

কোথাও বা লঘু কৌতুকপ্রিয় কল্পনার বিদ্যুৎবিলাসও দেখা দিয়েছে। সন্ধি-সমাসের ঘনঘটাচ্ছন্ন গুরুভার, বর্ণনার ঐশ্বর্য ও লেখকের গভীর সঙ্কেতধর্মী সংলাপরচনানৈপুণ্য রচনায় বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেছে। নিগূঢ় ভাবব্যঞ্জনাময় এই সমস্ত সংলাপ উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রের অন্তর্লোক অতি সহজেই অনাবৃত করে দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে এই সঙ্কেতধর্মী ভাবসমৃদ্ধ বাগ্‌রীতিই আধুনিক সৃজনধর্মী সাহিত্যবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এই শক্তিমান স্টাইলের ঐতিহ্য বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে ছিলনা বললেই চলে। মনে হয় এই ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশরীতি বিদেশের আমদানি। বঙ্কিমের আড়ম্বর-বহুল বর্ণনায় যেমন স্বীয় যুগের উচ্চ কোটির সাধুভাষার প্রভাবের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে, তেমনি ব্যঞ্জনাময় বাগ্‌রীতির ব্যবহার সেক্স্‌পীয়রের সচেতন অনুসৃতির ফল বলেই মনে হয়। শুধু এই সঙ্কেতধর্মী ভাষা ব্যবহারে নয়, বিচিত্র দৃশ্য পরিকল্পনায় নাটকীয় রীতি অবলম্বনেও বঙ্কিমের শিল্পিমানসের উপর সেক্স্‌পীয়রের প্রভাব খুব গভীর বলেই অনুমিত হয়। এই উচ্চকোটির বাংলা গদ্যশৈলী ও পাশ্চাত্ত্য ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরীতির সম্মিলিত আদর্শে ভাষাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করলেন স্বতন্ত্র একটা স্টাইল—যে স্টাইল মুখ্যত অনুসৃত হয়েছে প্রাক্‌-রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যে।

দুর্গেশনন্দিনীতে মানবচিত্তের রহস্যসন্ধানী শিল্পীর মানসযাত্রা ইতিহাসের রাজ্যে, আর কপালকুণ্ডলায় প্রকৃতি-জগতে, মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যজীবনে এবং ইতিহাসে। কল্পনার বিস্তৃতি, অভিজ্ঞতার প্রসার, এবং অনুভূতির গভীরতায় প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে দ্বিতীয় উপন্যাসের পার্থক্য মৌলিক। দুর্গেশনন্দিনীতে ঐতিহাসিক ঘটনা চরিত্রবিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, আর কপালকুণ্ডলায় ইতিহাস স্থান গ্রহণ করেছে শুধু পটভূমিকায়;—মানবমনের উপর প্রকৃতির অনতিক্রমণীয় প্রভাবের বর্ণনাই এই উপন্যাসে শিল্পীর মুখ্য প্রয়াস। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক নির্ণয় লেখকের প্রধান লক্ষ্য হলেও সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের আংশিক ছায়াপাত হয়েছে এই উপন্যাসে। এই রোমান্টিক কল্পনাপ্রধান কাহিনীতে বঙ্কিমের শিল্পিমনে সমাজ চিন্তা গৌণ স্থান অধিকার করলেও সেই যুগের হিন্দুসমাজের বহুবিবাহ সমস্যা, এবং কৌলীন্যপ্রথার বেদনাময় পরিণতি সম্পর্কে সার্থক ইঙ্গিত দেখা যায়। Grotesque এবং

bizarre-এর অবতারণায় রোমান্স রসসৃষ্টি-প্রচেষ্টা মুখ্য হলেও কপালকুণ্ডলায় তৎকালীন সমাজ জীবনের এই টুকরো ছবি শিল্পিমানসের ভবিষ্যৎ দিক্-পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

কপালকুণ্ডলার পরবর্তী 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে স্বদেশচিন্তার প্রথম উদ্বোধন। সমকালীন হিন্দু জাতীয়তা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর স্বদেশ-চেতনা তখন বিভিন্ন পথে মুক্তির উপায় খুঁজছিল। মৃণালিনী-উপন্যাসে বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে মুসলমান শক্তি কর্তৃক বঙ্গবিজয় কাহিনীর অভিনব ব্যাখ্যায়। ঘটনা সন্নিবেশে, চরিত্র চিত্রণে ও কল্পনাকেন্দ্রে নানা অসঙ্গতির চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের রসচেতনা যে ক্রমশঃ স্বদেশ-ভাবনার পথে বিবর্তিত হচ্ছিল মৃণালিনী কাহিনী তার প্রথম স্বাক্ষর। এ-ছাড়া পশুপতি-মনোরমা কাহিনীতে বঙ্কিমের রহস্য-সচেতন শিল্পিমন দাম্পত্যজীবনকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের জটিলতা সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। অবশ্য সেই জীবন চিন্তায় বঙ্কিমের পরবর্তী স্তরের গভীরতর উপলব্ধির পরিচয় নেই,—সে-চিন্তা জীবনের উপরতলবিহারী মাত্র। বঙ্কিম-সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মনে করেন দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী প্রভৃতি উপন্যাসের উপর সেক্স্পীয়রের Much Ado About Nothing, The Winter's Tale, Cymbeline প্রভৃতি কমেডির প্রভাব সুচিহ্নিত।

'বিষবৃক্ষে' (১৮৭৩) বঙ্কিমের সামাজিক সমস্যাচেতনা খুব ব্যাপক না হলেও গভীর। সমকালীন বাস্তব সামাজিক সমস্যা বিধবা-বিবাহ ও বহু-বিবাহকে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের কথা চিন্তাও করেননি, কিন্তু মনীষীর মননশীলতার সাহায্যে সেই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন এই উপন্যাসে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় সমাজ। অতএব যে কোন সামাজিক সংস্কারের কথা চিন্তা করবার পূর্বে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত করার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে ও দাম্পত্য সম্পর্কে সেই বিশুদ্ধিতার কথাই চিন্তা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে এবং তাঁর সমাজচিন্তাশ্রিত সমস্ত উপন্যাসে। এই চিন্তা পরবর্তীকালে অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বে একটা তাত্ত্বিক রূপ পেয়েছে।

কিন্তু বিষবৃক্ষ উপন্যাসের উৎকর্ষ শুধুমাত্র এই সমাজচিন্তায় নয়, সেই উৎকর্ষ প্রধানতঃ স্বভাব-দুর্বল নরনারীর গভীরতর হৃদয়-রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। প্রবৃত্তি-তাড়িত নরনারীর হৃদয়মনের বাস্তব বিশ্লেষণে শিল্পী বঙ্কিমের লেখনী এখানে অকম্পিত, মানবাত্মার অবতরণের চিত্র অঙ্কণে লেখকের শিল্পকৌশল তাঁর ভাবগুরু সেক্স্‌পীয়রের অনুগামী। সমসাময়িক সমাজচিন্তার সঙ্গে গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার মিশ্রণে প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই প্রথম জীবনধর্মী বাংলা উপন্যাস। এ-ছাড়া এই উপন্যাসে জীবনের ট্র্যাজেডিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছে স্বভাব-শিল্পীর সুনিপুণ রসরসিকতা।

বিষবৃক্ষের পরবর্তী 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) গল্পপ্রিয় বঙ্কিমের স্বাভাবিক রোমান্টিক চেতনারাজ্যে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। সমাজচিন্তার বন্ধুর ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে লেখক এখানে গার্হস্থ্য জীবন-পরিবেশে চমকপ্রদ কাহিনী রচনায় ব্যাপৃত। রহস্যময় জীবনভাবনার গভীরতর উপলব্ধি এই লোকরঞ্জক কাহিনীতে সাময়িকভাবে অন্তর্হিত। তবে কৌতুক রসের উজ্জ্বল দীপ্তি এবং লঘুতরল ভাষার গতিশীলতা বঙ্কিমের শিল্প-প্রতিভার একটা উজ্জ্বল দিক উন্মোচিত করেছে এই উপন্যাসে। জীবনের লঘুচ্ছন্দময় রূপ উদ্‌ঘাটনে পরিহাসপ্রিয় বঙ্কিম এখানে সহজ, স্বচ্ছন্দ। ইন্দিরা কাহিনীকে কোন কোন সমালোচক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে সঙ্কুচিত, কেউ কেউ রূপকথা বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেন নি। বাস্তবিকপক্ষে রোমান্সপ্রিয় বঙ্কিম সমাজ ও জীবনচিন্তার অসমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করে কিছুকালের জন্য যেন বিশ্রাম খুঁজেছিলেন ইন্দিরা-কাহিনীর রোমান্টিক সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিক পরিবেশে।

যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) কাহিনীতেও রোমান্টিক ঘটনার চকিত-চমক। কপালকুণ্ডলা বা বিষবৃক্ষের গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা এই কাহিনীতে নেই। কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র কতগুলি বহির্ঘটনার প্রভাবে— অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশে এই কাহিনী জীবনশিল্পে পরিণত হবার অবকাশ পায়নি। গল্পকারের একমাত্র ঝোঁক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটানো। উপন্যাসের জীবন-জটিলতা এই উপকথা জাতীয় কাহিনীতে অনুপস্থিত। বঙ্কিম নিজেও এ ধরণের কাহিনীর নাম

দিয়েছেন 'উপকথা'। ইন্দিরা-কাহিনীর মত এখানেও লেখকের আনন্দ শুধু গল্প বলায়।

নিছক রোমান্সের রাজ্যে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করবার পর শিল্পী বঙ্কিম আবার সবলে প্রবেশ করলেন জীবনচিন্তার গভীরে। পরবর্তী উপন্যাস "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৪) ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও কাহিনীর আবেদন সামাজিক। কথাশিল্পীর জীবনচিন্তার সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে স্ব-জাতি প্রেমিক বঙ্কিমের স্বদেশ-গৌরবভাবনা—যে ভাবনার অনিবার্য ফল সংঘাতময় ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে বাঙালীর বাহুবল প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। সমসাময়িক জীবন-পরিবেশে এই ধরণের সংঘাতময় জীবনচিত্রের অভাব; সেজন্য এই উপন্যাসেও বঙ্কিম গ্রহণ করলেন বাঙালীর ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকা। বাঙ্লার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে নববলদৃপ্ত ইংরাজের রাজনীতিক দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী প্রভাব বিস্তার করেছে সেই যুগের নিস্তরঙ্গ বাঙালী-জীবনের উপর। ফলে বাঙলা দেশের পল্লী সমাজের সামান্য চরিত্রও অসমান্য গৌরবদীপ্তি লাভ করেছে এই উপন্যাসে। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে শিল্পরচনার কৌশলও হল এই। জীবনের সংঘাত যেখানে প্রবল নয়, চরিত্রের বিকাশও সেখানে খণ্ডিত। সেজন্য দ্বন্দ্বমুখর ঐতিহাসিক ঘটনার ছত্রচ্ছায়ায় অনন্যসাধারণ চরিত্রসৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রখর জীবনচেতনানির্ভর উপন্যাসে। দুইটি সুস্পষ্ট ধারায় আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী; কিন্তু সুনিপুণ শিল্পকৌশলের সাহায্যে অপূর্ব ঐক্যসূত্রে বিধৃত করেছেন লেখক এই দুই বিচ্ছিন্ন ধারাকে। বঙ্কিমের শিল্পপ্রতিভার অন্যতম স্বাক্ষর চন্দ্রশেখর উপন্যাস।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আদর্শ নায়ক এবং মহৎ চরিত্র সৃষ্টির দিকেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমের লক্ষ্য। ফলে সমাজচিন্তানায়কের নীতিবাদী দৃষ্টি-প্রভাবে জীবনদ্রষ্টা শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনা অভিভূত। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সমাজনীতির স্থির মূল্যবোধ সম্পর্কে মনীষী বঙ্কিমের অকুণ্ঠ বিশ্বাস সূচিত হয়েছে এই উপন্যাসে; কিন্তু তাই বলে নরনারীর সহজাত যে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ নীতিধর্মের মহৎ প্রেরণাকে অতিক্রম করে স্বাভাবিক

চরিতার্থতার পথ খোঁজে—জীবনরহস্যের সহানুভূতিশীল দ্রষ্টা বঙ্কিম সেই সত্যকেও অস্বীকার করেননি কোথাও। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় শুধুমাত্র প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনকে স্বাভাবিক কক্ষপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত করেনি, স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানতাপস চন্দ্রশেখরের অন্তস্তব্ধ মনকেও আলোড়িত করেছে। রামানন্দ স্বামীর যোগবল এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সাময়িকভাবে এই আবেগময়ী নারীর হৃদয়-ঝঞ্ঝাকে প্রতিহত করলেও একেবারে প্রশমিত করতে পারেনি। প্রতাপ-শৈবলিনীর হৃদয়-দ্বন্দ্বের চরম পরিণতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের আত্মবিসর্জন ঘটেছে সমাজ নীতির উন্মাদ তাড়নায় নয়, হৃদয়ধর্মের প্রবল প্রেরণায়। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী রামানন্দ স্বামীর জবানীতে নীতিবাদী শিল্পী বঙ্কিম সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতাপের ইন্দ্রিয়জয়ের প্রশংসা করেছেন, আবার শৈবলিনীর মর্মস্পর্শী-উক্তির মধ্য দিয়ে জীবনদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মের গৌরব ঘোষণা করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে এই উপন্যাসে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও হৃদয়বান শিল্পী বঙ্কিম যেন নীতিধর্ম ও সৌন্দর্যবোধের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কোন সময় তাঁর মন ঝুঁকেছে সমাজনীতির চিরন্তন আদর্শের প্রতি, আবার কোন সময় হৃদয়াবেগের অপ্রতিরোধনীয় শক্তির প্রতি। বস্তুতঃপক্ষে এই উভয় শক্তির সংঘর্ষেই ত জীবন হয়ে উঠে সংঘাতমুখর। সেই দ্বন্দ্বমথিত জীবনের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে। আধুনিক বাংলা সৃজনধর্মী সাহিত্য যে গভীরতর জীবনচেতনার স্পর্শে মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল তার অন্যতম স্বাক্ষর চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখরে গভীর জীবনরহস্য সন্ধানের পর ক্লান্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র আবার যেন অবকাশের স্বপ্ন দেখেছেন "রাধারাণী" (১৮৭৭।৮১ সনে প্রথম প্রকাশিত) উপন্যাসে। ইন্দিরা বা যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসে যেমন এই উপন্যাসেও তেম্নি লেখক শুধুমাত্র কাহিনীকারের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ। পূর্ববর্তী উপন্যাসের মত জীবনরহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার মত কোন সচেতন প্রয়াস বা ইচ্ছা এখানে লেখকের নেই।

অতঃপর উপন্যাস রচনায় নতুন টেক্‌নিক নিয়ে পরীক্ষায় ব্রতী হলেন বঙ্কিম 'রজনী' উপন্যাসে (১৮৭৭)। আত্মজৈবনিক রীতিতে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের 'টেক্‌নিককে সার্থকভাবে বাংলা উপন্যাসে রূপদানে এখানে শিল্পী

বঙ্কিমের প্রয়াস অত্যন্ত সচেতন। পাশ্চাত্ত্য কাব্যের অন্তরঙ্গ রস ও বহিরঙ্গ রূপের অনুসৃতিতে আধুনিক বাংলা কাব্য যেমন বিচিত্র অভিব্যক্তির পথ খুঁজেছিল মধুসূদনের কাব্যপ্রয়াসে, তেমনি পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যের রসবস্তু ও ফর্মের অনুসরণে বাংলা উপন্যাসও বিচিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ লেখনী-স্পর্শে। বিস্তৃত ইতিহাসচেতনাকে অতিক্রম করে বঙ্কিম এই উপন্যাসেই বোধ হয় সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছেন নরনারীর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে। এই মনস্তত্ত্ব-প্রধান কাহিনীতে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য নতুন দিগন্তের সন্ধান পেল। সেই হিসাবে 'রজনী' বঙ্কিম-উপন্যাসে একটি স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী। অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের ফলে ঘটনার ইন্দ্রজাল-সৃষ্টি এই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসেও রোমান্সের বাস্তবাতীত মহিমা এনে দিয়েছে। সেদিক দিয়ে অবশ্য 'রজনী' বিশেষত্বহীন। কিন্তু কয়েকটি গুরুতর কারণে 'রজনী' বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত আকাশে পূর্বসূরীত্বের দাবী করতে পারে। প্রথমতঃ, কাহিনী রচনায় অভিনব টেক্‌নিকের অনুসৃতি, যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে: দ্বিতীয়তঃ, চরিত্র সৃষ্টিতে নারীমনের রহস্যাচ্ছন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা অনাবিষ্কৃত অধ্যায় উন্মুক্ত করেছে। এই উপন্যাসের উজ্জ্বলতম চরিত্র লবঙ্গলতা যেন শৈবলিনী চরিত্রেরই আর একটি সংস্করণ, যদিও লবঙ্গের অন্তঃ-প্রকৃতি ও মানসপ্রবণতা শৈবলিনী থেকে পৃথক। জীবনের প্রথম প্রেম সামাজিক স্বীকৃতি না পাওয়ায় সেই প্রেম শৈবলিনীর জীবনে একটা প্রচণ্ড অভিশাপের আকারে দেখা দিয়েছিল। সে অভিশপ্ত প্রেম দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয় করে তাকে পবিত্র দাম্পত্যজীবন থেকে আক্ষিপ্ত করেছিল বাইরের দ্বন্দ্বময় জগতে। লবঙ্গলতার প্রথম প্রেম অভিশপ্ত হলেও সেই প্রেম তার দাম্পত্যজীবনে আপাততঃ ফাটল ধরায়নি, কিন্তু বিদীর্ণ করেছে তার স্বামী-অনুরক্ত সংযত মনকে। সমাজশৃঙ্খলার অনুকূল পরিবেশে সেই বেদনারক্তরঞ্জিত নারীমনের চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিম এই স্বল্প-আয়তন উপন্যাসে। এখানে বঙ্কিমের দৃষ্টি সহানুভূতিশীল জীবনদ্রষ্টার। এই জীবনদৃষ্টির প্রভাবে পরবর্তী যুগে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নারীমনের বিসর্পিত গতি চিত্রণে নবতর সার্থকতা অর্জন করেছেন। সেই নবসৃষ্টির প্রথম পথপ্রদর্শক কবি বঙ্কিম। বিদগ্ধ সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লবঙ্গলতা চরিত্রের সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় সঙ্গত

ভাবেই মন্তব্য করেছেন : "নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তসংযমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র মানবহৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির মাধুর্য আহরণ করিয়াছেন। কোথাও প্রতিভার এই দুই দিক সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে ; কোথাও একটি অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টি নীতিশিক্ষার ভারে চাপা পড়ে নাই সেইখানে কাব্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অমরনাথ লবঙ্গলতার প্রেমের আখ্যায়িকা ইহার নিদর্শন"। তৃতীয়তঃ, রজনী উপন্যাসে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা বোধ হয় সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকতার পথে বিচরণ করেছে। কাহিনীর পরিণতিতে অমরনাথের সংসারবৈরাগ্য প্রেমের পরিণতিকে লোকাতীত মহিমা দান করেছে। এই জীবনগ্রন্থে মনীষী-শিল্পী বঙ্কিম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে সুস্পষ্টভাবে নিবৃত্তির জয় ঘোষণা করেছেন ; প্রেয়লাভের বাসনা হতে শ্রেয়োলাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। বঙ্কিমের শিল্পিমানসের এই দিক্-পরিবর্তন সর্বপ্রথম সূচিত-হয়েছে "রজনী" উপন্যাসে।

নীতিবেত্তা ও সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিমের শিল্পিমনের এই দ্বন্দ্ব এবং সমাধান -প্রয়াস আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পরবর্তী সমাজ-চিন্তাশ্রিত উপন্যাস "কৃষ্ণকান্তের উইলে" (১৮৭৮)। জীবনরহস্যের সৌন্দর্যদ্রষ্টা বঙ্কিমকে তাঁর সমাজহিতৈষী নীতিবাদী সত্তা থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখলে এই জীবন-শিল্পীর শিল্পরচনার যথার্থ মূল্যায়নে ব্যাঘাত ঘটবে নিশ্চয়ই ; কারণ সৌন্দর্যবোধ ও নীতিবোধ তাঁর শিল্পিমানসে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-মিশ্রিত। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর পরিণত শিল্পপ্রতিভা প্রবল প্রত্যয়ে জাগ্রত হয়েছে এই দ্বৈত মানস-প্রবণতার আশ্রয়ে।

সৌন্দর্যদ্রষ্টা রোমাণ্টিক শিল্পী বঙ্কিম রসিকের হৃদয়ানুভূতি দিয়ে নর-নারীর প্রেমোন্মেষের পরম রমণীয় আবির্ভাবকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু যে প্রেম বিধ্বংসী শক্তির প্রচণ্ডতা নিয়ে দাম্পত্যজীবনে প্রবল ভূমিকম্পের সূচনা করে সেই অশুভ প্রেমের অসামাজিক বিকাশকে কোথাও প্রশ্রয় দিতে পারেননি। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সর্বযুগের সমালোচক মহলে সব থেকে গুরুতর অভিযোগ উত্থিত হয়েছে সনাতন হিন্দুসংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের

জন্য। তিনি শিল্পাদর্শ লঙ্ঘন করে বিধবার স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতাকে ভয়াবহ পরিণতি দান করেছেন। চিন্তাশীল সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই অভিযোগের সদুত্তর দিয়েছেন তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে। তিনি সঙ্গতভাবেই এই মত ব্যক্ত করেছেন, এই অসামাজিক প্রেম যদি বিধবার না হয়ে কুমারীর হত তা হলেও বঙ্কিম সেই প্রেমকে সমভাবে মর্মান্তিক পরিণতি দান করতেন। বস্তুতঃ বঙ্কিম-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কুমারীর কোর্টশিপ বা প্রেম-বর্ণনা অনৈতিহাসিক বলে বিবেচিত হত ; অপর পক্ষে হিন্দুবিধবার জীবন-সমস্যা ছিল সমকালীন বাঙলা দেশের একটা জাগ্রত সমস্যা। এই কারণেই জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্যজীবনের সুপবিত্র আদর্শের বিরুদ্ধে অবতারণা করেছিলেন বিধবা নারীর প্রলয়ঙ্কর প্রেমের সম্ভাব্য চিত্র। কৃষ্ণকান্তের উইলের বিষয়বস্তু পরিকল্পনাতেও বঙ্কিমের শিল্পচেতনার সঙ্গে চিন্তাশীলতার অপূর্ব সমন্বয় দেখে আমরা বিস্মিত হই।

কৃষ্ণকান্তের উইলে কথাশিল্পীর সৌন্দর্যদৃষ্টি অবিমিশ্র কিনা এই গুরুতর প্রশ্নও বঙ্কিম-সমালোচকের মনকে আন্দোলিত করেছে। আমাদের ত মনে হয়, অন্ধ প্রবৃত্তিতাড়িত দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ জীবনচিত্র বর্ণনায় এই উপন্যাসে শিল্পীর লেখনী যেমন অকম্পিত, সৌন্দর্যের উৎস হতে গন্তব্যের দিকে তাঁর মানস-প্রয়াণও তেমনি সুস্পষ্ট গাতিরেখায় চিহ্নিত। দাম্পত্য জীবনের দ্বৈত-লীলায় যে সুমধুর প্রেমের ফুল ফোটে সেই সৌন্দর্যে রূপদ্রষ্টা বঙ্কিম মুগ্ধ ; বঞ্চিত জীবনের মর্মকোষে প্রণয়ের যে গোপন মধু অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হয় সেই সৌন্দর্য আহরণেও তাঁর কবিচিত্ত উদ্বেলিত ; রূপমোহে ভোগোন্মত্ত নরনারীর সকাম প্রেমের প্রলয়ঙ্কর রূপও যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি একনিষ্ঠ প্রেমের করুণ মাধুর্যের মধ্যেও বঙ্কিম দেখেছেন সৌন্দর্যের কল্যাণময় আদর্শ। এই দ্বন্দ্বপ্রধান জীবনের স্তরে স্তরে সৌন্দর্যের যে বিচিত্র রূপ তরঙ্গিত, অখণ্ড ভাবদৃষ্টি দৃষ্টি দিয়ে কবি বঙ্কিম সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তাতেও যেন তাঁর সৌন্দর্যপিপাসার তৃপ্তি ঘটেনি। যেই প্রেম নরনারীর জীবনে অন্ধ মোহের সঞ্চার করে, সেই প্রেম সুন্দর হলেও চঞ্চল; তাই উপন্যাসের পরিণতিতে দেখি স্বভাবশিল্পী বঙ্কিম ব্যঞ্জনাময় শিল্পরীতিকে উপেক্ষা করে নির্মোহ শান্ত প্রেমের সৌন্দর্যদর্শনে তৃপ্তিলাভ করেছেন। রজনীতে

যে উর্ধ্বায়িত সৌন্দর্য-দর্শনের শুরু, কৃষ্ণকান্তের উইলে সেই সৌন্দর্য-দৃষ্টির বিকাশ।

কৃষ্ণকান্তের উইলে জীবনশিল্পী বঙ্কিমের পরিণত শিল্পসৃষ্টিনৈপুণ্য সর্বযুগের পাঠকমহলে স্বীকৃত। কোন কোন স্থলে সংলাপ রচনায় অতি নাটকীয় ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় দিলেও এই কাহিনীর প্রায় সর্বত্র বঙ্কিম সংযত-কথনের মধ্য দিয়ে যে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে পরিণত শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন। শুধুমাত্র সংলাপে নয়, বর্ণনায়ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্ম যে কোন বিশ্লেষণ-ধর্মী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়না। প্রথম সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষের নামকরণে লেখকের যে সচেতন উদ্দেশ্যপ্রবণতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এখানে তাও অনুপস্থিত। কৃষ্ণকান্তের উইলের নামকরণও আশ্চর্য ব্যঞ্জণাধর্মী। রচনা-রীতিতে আড়ম্বরপ্রিয়তাও সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে এই উপন্যাসে। সব দিক থেকে পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় কৃষ্ণকান্তের উৎকর্ষ দেখে এ-কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, বঙ্কিম যদি অতঃপর সমাজচিন্তানির্ভর উপন্যাস রচনায় তাঁর এই পরিণত শক্তিকে নিয়োগ করতেন তাহলে এই শ্রেণীর উপন্যাস শিল্পী বঙ্কিমের হাতে আরও বেশী সমৃদ্ধ হত।

কিন্তু বঙ্কিমের স্বাভাবিক রোমান্সপ্রিয় মন সামাজিক পরিবেশ ত্যাগ করে আবার সৌন্দর্য রচনার স্বপ্ন দেখল ইতিহাসের সুদূর জগতে। 'রাজসিংহ' (১৮৯৩) সেই স্বপ্নপ্রয়াণের প্রত্যক্ষ ফল। বার বার পরিমার্জন করবার পর এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম এ কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, রাজসিংহ-ই তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। ওয়াল্টার স্কটের প্রতিভা-মুগ্ধ শিল্পী বঙ্কিমের বরাবরই আকাঙ্ক্ষা ছিল সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে নবজাগ্রত বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি কল্পনাপ্রধান হওয়ায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি, তাই রাজসিংহে বঙ্কিম সচেতনভাবেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের টেকনিক অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, বঙ্কিম যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এই উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল কিনা? এ-যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ

সরকার কোন কোন দোষত্রুটি সত্ত্বেও রাজসিংহ উপন্যাসকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গেলে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এবং একথাও অবশ্য স্বীকার্য, ইতিহাসের মর্যাদা যে উপন্যাসে লঙ্ঘিত হয়, সেই উপন্যাস রোমান্স হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে কখনও নয়। হিন্দুর বাহুবল প্রতিপন্ন করবার প্রবর্তনা রাজসিংহ রচনার সময় বঙ্কিম-মানসে সক্রিয় ছিল; সেজন্যে নিজের অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিন্নতর রূপে উপস্থিত করেছেন। আবার কোথাও কোথাও সচেতন ভাবেই সমকালীন ঐতিহাসিকের মতামতকে অগ্রাহ্য করেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের কল্পনাবিস্তারের অবাধ স্বাধীনতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবার অধিকার অবশ্যই নেই। কিন্তু রাজসিংহ উপন্যাসে দেখা যায়, বঙ্কিম স্বীয় অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের ইতিহাসকে নিজের প্রয়োজন মত সাজিয়েছেন। সেজন্য রাজসিংহ ঐতিহাসিক রোমান্স হিসাবে রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ দাবী করতে পারে না।[১] বঙ্কিম-প্রতিভামুগ্ধ মননশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহের উৎকর্ষের কথা চিন্তাই করেননি। বরং তিনি এই অনবদ্য শিল্পসৃষ্টিকে বঙ্কিমের জীবন-শেষের শেষ রোমান্স—'কবি হৃদয়ের Swan-song' বলে বিশেষিত করে তার সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই উপন্যাসের উপকাহিনীতে লেখক নরনারীর প্রেমের যে রহস্যময় বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, পৃথিবীর যে কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তার তুলনা চলে। রাজসিংহ উপন্যাসে বিগত ইতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায় ঘটনার চকিত-চমক, চরিত্রের অনন্যসাধারণ বিকাশ, কাহিনীর দ্রুতগতি, বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিস্ময়কর পরিণতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের সমস্ত চেতনাকে একসঙ্গে জাগ্রত রাখে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে

১ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১৯১—১৯৭

পরীক্ষোত্তীর্ণ হোক বা না হোক, বঙ্কিমের শিল্পপরিণতির অন্যতম স্বাক্ষর রাজসিংহ—এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাজসিংহ রচনার পরে বঙ্কিমের শিল্পদৃষ্টির বিবর্তনরেখা যে কোন সাধারণ পাঠকের চোখেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। এই পর্যায়ে বঙ্কিমের শিল্পাদর্শ একটা তাত্ত্বিক রূপ গ্রহণ করেছে। প্রবীণ শিল্পী বঙ্কিমের পরিণত শিল্পোপলব্ধি অনুস্যূত হয়ে আছে এই সময়ে তাঁর নব্য লেখকদিগের প্রতি উপদেশের মধ্যে :

"যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"

এখানে শিল্পসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা সৌন্দর্যানুভূতিকে স্বীকার করে নিয়েও লোকহিত ও দেশহিতকামনাকে রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন প্রবীণ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। অবিমিশ্র সৌন্দর্যচেতনার স্তর অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্র এ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন চিন্তানেতার ভূমিকায়। কথাশিল্পীর চমকপ্রদ গল্পরচনাশক্তি এখনও অব্যাহত, কিন্তু এই স্তরে লেখক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন যেন নিজের জটিল চিন্তাকে চিত্তাকর্ষক রূপ দেবার অভিপ্রায়ে। স্বদেশের সীমাহীন রিক্ততা, গ্লানি ও দৈন্য এই সময় জাগ্রত করল রসিক শিল্পীর স্পর্শকাতর মনকে। এই জাগরণ যেন নিদ্রাভঙ্গে নববল-দৃপ্ত সুপ্ত সিংহের জাগরণ। মুখ্যতঃ যে ব্যক্তিচেতনা ছিল এতদিন তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রধান উৎস, সেই সীমাবদ্ধ মানসক্রিয়া অকস্মাৎ প্রবল প্রত্যয়ে ব্যাপ্তিলাভ করল সমষ্টিচেতনায়। এই নবজাগ্রত হৃদয়-অনুভব শুধুমাত্র বাঙ্‌লা দেশের ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ রইল না,—ভারতীয় জীবনের উদার আকাশে প্রসারিত হল। শাসকজাতি স্বৈরাচারী হলে দেশের জনসাধারণ কী অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়, অকম্পিত হস্তে তার বাস্তবরূপ অঙ্কিত করলেন স্বদেশপ্রেমিক শিল্পী তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১৮৮২)। এই সময়ে মানুষের ধর্ম সম্পর্কেও বঙ্কিম-চন্দ্রের পরিণত চিন্তা একটা তাত্ত্বিক রূপ লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। সেই চিন্তা অব্যবহিত পরবর্তীকালে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ ধর্মতত্ত্বে গ্রথিত হয়েছে (ধর্মতত্ত্ব, প্রথম ভাগ, অনুশীলন, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত)। এই

গ্রন্থে মনীষী বঙ্কিম দেশবাসীকে সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন: "সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" অবশ্য লোকপ্রীতিকে তিনি স্বদেশবাৎসল্যের উপরেও স্থান দিতে দ্বিধা করেন নি এই গ্রন্থে; চিন্তাশীল সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মনে করেন,—"এই দ্বৈধতা ও তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেদীপ্যমান।" উক্ত মতের সমর্থনে শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ সেনগুপ্ত বলেন: "উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি মহাপুরুষ চিকিৎসক যিনি সত্যানন্দকে সন্তান সম্প্রদায় গঠন করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যিনি সত্যানন্দের নিকট হইতে অকুণ্ঠিত ভক্তি দাবী করিয়াছিলেন এবং যিনি বিজয়ের মুহূর্তে সত্যানন্দকে বিসর্জনের পথে চালিত করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার (এবং বঙ্কিমচন্দ্রের) মতে বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী এবং সন্তান সম্প্রদায় দেশস্থ লোকের ধন ও প্রাণ অপহরণ করিয়া যে সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র"।[১]

আনন্দমঠ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বদেশ চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালীর জীবনবেদ। একটা প্রবল আদর্শবাদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধের এরূপ চমৎকার সমন্বয় ইতিপূর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসে আর দেখা যায় নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাঙালী-প্রজার যে ভয়াবহ দুর্দশার চিত্র বাঙ্কম এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন আধুনিক যে কোন বাস্তববাদী উপন্যাসেও সেই বাস্তবতার চিত্র দুর্লভ। আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত হলেও এই উপন্যাসের আবেদন সর্বভারতীয়। এই সম্প্রসারিত ভারতচেতনা শিল্পী বঙ্কিমকে উত্তীর্ণ করে দিল মনীষীর পর্যায়ে। মনীষীর দৃষ্টি দিয়ে বঙ্কিম এই উপন্যাসে নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন ভারতীয় জাতির দুর্ভাগ্যের কারণ, তুলনা করেছেন সেই দুর্ভাগ্যকে অতীত সৌভাগ্যের সঙ্গে, এবং আকর্ষণ করেছেন জাগরণোন্মুখ জাতীয় মনকে একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। শুধু জ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে নয়, ধ্যানী ও প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একসূত্রে গেঁথে অখণ্ড কল্যাণময় একটা সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন দেখলেন বঙ্কিম তাঁর শিল্পিজীবনের শেষ প্রান্তে এসে। চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেবার প্রবল

১ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ২১৪—২১৫

প্রেরণা সঞ্চার করলেন তিনি দেশাত্মবোধে নবজাগ্রত জাতীয় চিত্তে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা জীবন-শিল্পীর সেই জাতীয় সমষ্টিচেতনার আবেদন যে ব্যর্থ হয়নি তার সাক্ষ্য দেয় স্বাধীনতার জন্য পরবর্তী জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস। একটা বিশাল আদর্শের ছায়ায় রচিত বলে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ'কে তুলনা করেছেন মহাকাব্যের সঙ্গে। এ-ছাড়া ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের মানসিকতার উপর এই উপন্যাসখানির মহৎ ভাবপ্রেরণা যে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথা চিন্তা করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও মন্তব্য করেছেনঃ "পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তরকারী গ্রন্থ আছে আনন্দমঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে।"[১]

বাস্তবিকই মনীষা ও ভাবাবেগদীপ্ত এই একখানি উপন্যাসের মাধ্যমেই মননশীল কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে।

আনন্দমঠ উপন্যাসে মনীষী বঙ্কিমের সমষ্টিচেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমের জীবনদৃষ্টির এক অভিনব রূপও ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। স্বভাব-দুর্বল পুরুষের বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ এবং সেই প্রবৃত্তির সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবনের রসরূপ অঙ্কনেই শিল্পী বঙ্কিমের আনন্দ যেন সহজাত। সেই আনন্দের চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে এই উপন্যাসের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভবানন্দের চরিত্রে। বিরাট আদর্শপ্রেরণায় মানুষ নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করে, প্রয়োজন হলে নিগ্রহও করে। কিন্তু প্রকৃতির অনতিক্রমণীয় প্রভাব এড়ানো মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। যে পুরুষ স্বীয় অমেয় পৌরুষের গৌরবে প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাকে অগ্রাহ্য করে, প্রকৃতি সুযোগ পেলেই সেই পুরুষের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মানুষের জীবনে প্রকৃতির সেই নিষ্ঠুর পরিহাসের লীলা নিত্যনিয়তই ঘটছে। কত অমিতবীর্য বিবেকবান পুরুষও প্রকৃতির এই রহস্যময় শক্তির নিকট পরাজিত হচ্ছেন—মানবজীবনের রহস্য-সন্ধানী শিল্পী বঙ্কিম স্বভাবদুর্বল মানবমনের সেই পরম রহস্যের সন্ধান করেছেন আনন্দমঠের ভবানন্দ চরিত্রে।

১ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৭৮

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সংযতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর মানসিক স্খলনের চিত্রকে উজ্জ্বল বর্ণরেখায় চিত্রিত করলেও প্রবীণ শিল্পী বঙ্কিম উচ্ছ্বসিত হয়েছেন তাঁর প্রায়শ্চিত্ত-প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে। ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ পর্যায়ে শিল্পী বঙ্কিমের এই মানসক্রান্তির স্বরূপ উপলব্ধিতে আমাদের বিলম্ব ঘটে না। যে প্রবল প্রবৃত্তি মানুষের আদর্শ-চেতনায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, সেই প্রবৃত্তি যত সুন্দরই হোক না কেন, ঔপন্যাসিক জীবনের এই পর্যায়ে আদর্শসন্ধানী বঙ্কিম তার বেশী মূল্য দেন নি। মানুষের মোহকে তিনি জীবনের কঠোর সত্য বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু মোহমুক্তিকে পরম গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন। ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ স্তরে শিল্পী বঙ্কিমের সৌন্দর্যদৃষ্টি একটি অভিনব রূপ লাভ করেছে এই উপন্যাসে।

"দেবী চৌধুরাণী" (১৯৮৪) উপন্যাসে আনন্দমঠের মত লেখকের দীপ্ত মনীষার স্বাক্ষর নেই; কাহিনী সৃষ্টিতেও শৈথিল্যের পরিচয় আছে একথা সত্য—কিন্তু এই উপন্যাসে বঙ্কিম শিল্পরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর পরিণত উপলব্ধি—অনুশীলন তত্ত্বকে। তত্ত্বপ্রধান হওয়াতে এই উপন্যাসের শিল্পমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে সন্দেহ নেই—কিন্তু নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে যেন এ-সময়ে বঙ্কিমের মন নেই। কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণী রচনা করেছিলেন তাঁর উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যেই তার ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়: "The substance of Religion is culture" "The fruit of it is the Higher life"; "The general Law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more Religious." অনুশীলনের ফলে নারীও যে কত অভাবনীয় শক্তির অধিকারী হতে পারে তার স্বাক্ষর বঙ্কিম-কল্পিত দেবী চৌধুরাণী-চরিত্র। অবশ্য অমিত শক্তির অধিকারী হলেও নারী-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা যে গার্হস্থ্য জীবন-পরিবেশে—এই ইঙ্গিতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। শুধু এই উপন্যাসে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রেও রয়েছে গার্হস্থ্যজীবনের সনাতন আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য।

দেবী চৌধুরাণী কাহিনী যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে একটা

সর্বজনীন আদর্শের ছায়া আছে, কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস "সীতারামের" (১৮৮৭ খৃঃ অঃ) প্রথম সূচনায় হিন্দুর বাহুবল ও হিন্দুরাজ্য পুনরুজ্জীবনের যে ইঙ্গিত দেখা যায় তার মধ্যে সর্বজনীন মহৎ আদর্শের প্রতিফলন কোথায়—এই প্রশ্ন প্রথমেই সীতারাম পাঠককে বিভ্রান্ত করে। যে 'প্রচার' পত্রিকায় সীতারাম প্রকাশিত হতে থাকে সেই সময় বঙ্কিম বাঙালী জাতির ভীরুতার কলঙ্ক ক্ষালন করে 'বাংলার কলঙ্ক' এবং হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা বিষয়ক 'হিন্দুধর্ম' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১২৯১ সন)। কিন্তু তাঁর একদেশদর্শী স্বদেশচিন্তা ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে বঙ্কিম সীতারাম উপন্যাসকে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেন। হিন্দুধর্মের ভিতর পৃথিবীর মানুষ মাত্রেরই সর্বাঙ্গীন মুক্তির উপায় নিহিত আছে—এই ধারণা নিয়ে বঙ্কিম এই উপন্যাস রচনা শুরু করলেও পরে নিশ্চয়ই ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এরূপ চিন্তা অর্থহীন। এরূপ চিন্তা-বিবর্তনের মধ্যে বঙ্কিমের পরিণত মনীষার স্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। সীতারাম বঙ্কিমের পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় হীনপ্রভ মনে হলেও স্ব-জাতি ও স্ব-দেশ ভাবনায় মূল্যসমৃদ্ধ।

সীতারাম উপন্যাসে স্ব-দেশ ও স্ব-জাতিচিন্তা বঙ্কিমের পরিণত বুদ্ধিকে জাগ্রত করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার জন্য লেখকের সহজাত অন্তর্দৃষ্টিও এই উপন্যাসে অব্যাহত। যে অন্ধ নিয়তিশক্তি পুরুষের সমস্ত পৌরুষকে অভিভূত করে তার জীবনে ট্র্যাজেডি আনয়ন করে সেই রহস্যময় নিয়তি-লীলার প্রত্যক্ষ রূপ সীতারামের চরিত্র। সীতারাম উপন্যাসে এই নিয়তি-লীলার প্রকৃতি অবশ্য পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি থেকেও জটিলতর। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে দেখি পুরুষ সম্মোহিত হয়েছে দাম্পত্য জীবন-সীমার বাইরে ভিন্নতর নারীর রূপ দর্শনে। তার ফলে তার দাম্পত্য সম্পর্কে উপস্থিত হয়েছে জটিল সমস্যা। সেই সমস্যার গুরুভারে পুরুষ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। জীবনের সেই সংঘাতময় রূপের মধ্যে শিল্পী বঙ্কিম দেখেছিলেন মানবমনের পরম রহস্য। এই উপন্যাসে দেখি, পৌরুষদৃপ্ত পুরুষ নিজের বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত—যে স্ত্রী তাঁর নিকট অপ্রাপণীয়া। পুরুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পথে নারীর সংস্কার যে পর্বতপ্রমাণ বাধা উপস্থিত

করল সে বাধা যেন অন্ধ নিয়তিশক্তি। এই শক্তি অবশেষে ধ্বংস করল পুরুষের পৌরুষকে, তার কীর্তিকে। জীবনের এই 'মহতী বিনষ্টি'র ছবি দেখেছিলেন জীবনরহস্যসন্ধানী বঙ্কিম সীতারাম উপন্যাসে। বঙ্কিমপ্রতিভা-মুগ্ধ সমালোচক মোহিতলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে সীতারাম-ট্র্যাজেডির মর্মবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন: "সীতারামের ট্র্যাজেডি তাঁহার নিজেরই কবিজীবনের ট্র্যাজেডি;—সকল তত্ত্ব, সকল ধর্মোপদেশ, এবং সর্ববিধ আশা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এমন উন্মাদ আর্তরব আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। সেই নারী পুরুষ, এবং সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি—এই শেষবার কবি-বঙ্কিমকে যে আকারে অভিভূত করিয়াছে, তাহার কোন স্বস্ত্যয়ন-মন্ত্র নাই।......সীতারাম তাহার উপযুক্ত সহধর্মিণীকে পাইয়াও পাইল না; না পাইলেও হয়তো এমন সর্বনাশ ঘটিত না। কিন্তু প্রাপ্ত বস্তুর ঐ দুষ্প্রাপ্যতাই তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। ম্যাকবেথের সেই ডাইনিদের কথা যেমন সত্যমিথ্যার ভেল্কিতে মতিভ্রম ঘটাইয়াছিল, এখানেও তেমনই ঐ জ্যোতিষ-গণনার একটা হেঁয়ালী বাক্য যে নিয়তিকে এমন করাল করিয়া তুলিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পৌরুষ তৃণের মত ভাসিয়া গেল। এ সকলই বঙ্কিমের কবিদৃষ্টির শেষ সাক্ষ্য; তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই সৃষ্টির ও মানব ভাগ্যের গভীরতর প্রদেশে ঐ এক অন্ধকারই আছে, এবং কপালকুণ্ডলাই হৌক, আর মনোরমাই হৌক, আর শ্রীই হৌক—পুরুষের পক্ষে, সেই ভাগ্যের সহিত শক্তিপরীক্ষার যুদ্ধে, নারীর সকল মূর্তিই সমান; বৈরাগিনী, হিতৈষিণী বা সত্যকার অর্দ্ধাঙ্গিনী যেমনই হোক—জীবনের স্রোতবেগ একটু গভীর হইলে পুরুষ নিরাশ্রয় হইবেই।......সব চেয়ে আশ্চর্য হইতে হয় এই জন্য যে, 'আনন্দমঠে' তিনি যে বৃহত্তর লোককল্যাণের জন্য, বা বড় একটা কিছুর জন্য আত্মোৎসর্গকেই পুরুষের পরমার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন,—এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে যে ধর্মতত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাধনযোগ্য বলিয়া উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, 'সীতারামে' সেই সকলের নিস্ফলতা প্রদর্শন করিয়া, সেই জীবন-জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।"[১]

১ মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, পৃঃ ৬২—৬৩

বঙ্কিমের প্রথম পর্যায়ের রসপ্রধান উপন্যাসের সঙ্গে শেষ পর্যায়ের তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের ব্যবধান মৌলিক। এই উভয় শ্রেণীর উপন্যাসের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে মনীষী-সমালোচক বিপিনচন্দ্র পাল বলেন :

"দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীতে সার্বজনীন মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে আত্মচরিতার্থতার পথে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এই ভোগের পথ যে সোজা পথ নয়, বাহিরের বন্ধন ছিঁড়িলেই যে এই ভোগের পথে যাইয়া মানুষ সম্যক আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না, এই পথে পদে পদে কত বিঘ্ন কত বাধা, আত্মচরিতার্থতা লাভ করা দূরে থাক, আত্মহত্যার যে কত আশঙ্কা,—বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি ইহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক য়ুরোপীয় evolution বা অভিব্যক্তিবাদের ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিকে রসরাজ্যে মানবের আত্মচরিতার্থতার অভিব্যক্তিধারাতে thesis এর অবস্থা বলা যায়। বিষবৃক্ষ প্রভৃতিকে এই অভিব্যক্তিধারাতে antithesis-এর অবস্থা বলা যায়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে সহজ রসবিলাপের ছবি দেখিতে পাই। এখানকার কথা সহজ ভোগ। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভোগের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযমের এবং সমাজ-শাসনের একটা প্রবল বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই এই তিনখানি ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে সন্ধির কথা বা সমন্বয়ের সঙ্কেত নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে এই সন্ধি বা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারামের বিশেষত্ব। কেবল রসমূর্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী বা সীতারামের রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীদিগকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্মযোগে দীক্ষিত করা।"[১]

তত্ত্বদর্শী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও বঙ্কিম-প্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি ইংরাজী প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "The earlier Bankim was only a poet and a stylist—the later Bankim was a seer and

১ বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১৭৫—৭৬

a nation builder." আবার এ যুগের প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমের শিল্পপ্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন : উপন্যাস রচনার প্রথম স্তরে বঙ্কিমের শিল্প-ভাবনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল মুখ্যতঃ সেক্স্‌পীয়রের জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বারা, আর শেষ স্তরে তাঁর শিল্পচেতনা জাগ্রত হয়েছিল ভিক্তর হিউগোর জীবনচিন্তার আদর্শে।

অতঃপর উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের শিল্পকৌশলের মোটামুটি আলোচনা করে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তিরেখা টানা যেতে পারে।

প্রত্যেক উপন্যাসের উৎকর্ষ নির্ভর করে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর : প্রথমত, লেখকের কাহিনী রচনাশক্তি, দ্বিতীয়তঃ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তৃতীয়তঃ, ব্যঞ্জনা সৃষ্টি। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে যখন বঙ্কিমের সূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সম্যকভাবে জাগ্রত হয়নি তখন চমকপ্রদ কাহিনী রচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। যে সময় বঙ্কিম উপন্যাস রচনা শুরু করেন তখন ছিল বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ ; সেজন্যে অসাধারণ ঘটনার চকিত-চমক সৃষ্টি করে কাহিনীতে বৈচিত্র্য সঞ্চারই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সমসাময়িক জীবন পরিবেশে অনন্যসাধারণ ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ করা ছিল দুরূহ, এই কারণে চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আকর্ষণেই উপন্যাস রচনায় তিনি মুখ্যতঃ ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন—সে মন্তব্য আগেই করা হয়েছে। মধ্য যুগের ভারতবর্ষ ও বাঙলা দেশের কতগুলি সংঘাতময় অধ্যায় বেছে নিয়েছিলেন তিনি এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনার জন্যে। সেই বিস্মৃত ঐতিহাসিক চরিত্র ও জড় ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে সজীব কল্পনা মিশিয়ে তিনি যে অপূর্ব রসলোক সৃষ্টি করলেন তা তাঁর অসামান্য শিল্পকৌশলেরই পরিচায়ক। মানুষের জীবন যে শুধু ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ন্যায়নীতির ফর্মূলা মিলিয়ে সরল গাণিতিক রেখায় অগ্রসর হয়না,—বহির্ঘটনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাতে মানুষের জীবনে যে জটিলতা আসে—মানব জীবনের রহস্যসন্ধানী বঙ্কিমের নিকট এই সত্য অজ্ঞাত ছিল না। সেজন্য জীবনরহস্যের সূত্র সন্ধানে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের কাহিনীতে আনলেন জটিলতা। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একমুখী জীবনকথা বহুধারায় প্রবাহিত হয়েছে ; কিন্তু বঙ্কিমের শিল্পদৃষ্টির একাগ্রতার ফলে সেই বিচিত্রধারায় প্রবাহিত কাহিনী পরিণতিতে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য-

সূত্রে বিধৃত হয়েছে। বঙ্কিম-উপন্যাসের নিপুণ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার শিল্পীর এই সামঞ্জস্যবোধকে বলেছেন—Unity of Inspiration বা কবিদৃষ্টির সমগ্রতা। এ-সম্পর্কে উক্ত সমালোচকের নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য:

"……এই গল্প রচনাশক্তিই প্রকৃত সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ—কারণ সৃষ্টিমাত্রেই একটা অখণ্ড সুডৌল রূপ বুঝায়। ঐ আদ্যন্তযুক্ত, সুমণ্ডলায়িত যে একটি প্লট—উহার মূলে আছে সেই 'Unity of Inspiration' বা কবিদৃষ্টির সমগ্রতা। ……যে উপন্যাসে এরূপ গল্প সম্পূর্ণতা নাই, তাহার কল্পনাও বিক্ষিপ্ত কল্পনা; তাহাতে জীবন সম্বন্ধে কতগুলা ভাবনা, কতগুলা খণ্ডচিত্রের যোজনা, কতগুলা প্রশ্ন বা অমিমাংসিত সমস্যার উত্থাপন মাত্র থাকে—কবিচিত্তে তাহার কোন সুসম্পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয় নাই। সেই রূপটি দার্শনিক সত্যমিথ্যা বিচার বা একটা শেষ সিদ্ধান্তের মত হইবার প্রয়োজন নাই, যদি তাহা হয় তবে সেই রচনা কাব্য বা একটা সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্ম হইবেনা, রং ও রেখার কারুকর্ম হইতে পারে—জীবনেরই একটা আলেখ্য বা প্রতিকৃতি হইবেন না। কিন্তু এরূপ সুডৌল, সুসম্বদ্ধ, সুসম্পূর্ণ আকারের মধ্যেই কবি-প্রেরণার একাগ্রতা, বলিষ্ঠতা ও সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় থাকে; একটা গঠিত মূর্ত্তির মতই উহার ওই সর্বাঙ্গ সুষমা বা সর্ব অঙ্গ-ব্যাপী ভাবৈক-সঙ্গতিই খাঁটি সৃষ্টিকর্মের লক্ষণ।" [১]

এ-ছাড়া বঙ্কিম-উপন্যাসের কাহিনীগুলিকে বিস্তৃতি দান করেছে সংঘাত-পূর্ণ বৃহৎ ঘটনার সমাবেশ, ঘনসংসক্তি দান করেছে নাট্যকারের কল্পনার objectivity, আর সে কাহিনীতে মাধুর্য সঞ্চার করেছে উধ্বর্গ কবি-কল্পনা। "কাব্যে উপন্যাসে জীবনের আলেখ্য রচনা করিতে হইলে,—মানুষের দেহপ্রাণের বহিরন্তর দৃষ্টিগোচর করাইতে হইলে, কেবল লিরিক বা আত্মসর্বস্ব কল্পনায় তাহা সম্ভব নয়; তাহাতে এপিক, নাটক ও লিরিক এই ত্রিবিধ প্রেরণার দুর্লভ সঙ্গীতি চাই, জীবনের সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণটাই শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। বাংলা সাহিত্যে কি পূর্বে, কি পরে, এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কোন কবির কাব্যসৃষ্টিতে সেই শক্তির পরিচয় নাই…"।—বঙ্কিম

মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, পৃঃ ২৫

উপন্যাসের কলাকৃতির উৎকর্ষ নির্ণয়ে উক্ত সমালোচকের এই মন্তব্যও সুচিন্তিত।

শিল্পী বঙ্কিমের কলানৈপুণ্যের অন্যতর পরিচয় দেখা যায় চরিত্র সৃষ্টিতে। সজীব চরিত্র রচনায় বঙ্কিম বহুস্থানে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর না হয়ে ঘটনা সমাবেশ, দীর্ঘ বর্ণনা ও ব্যক্তিগত মন্তব্যের আশ্রয় নিয়েছেন। আধুনিক বিশ্লেষণ-ধর্মিতার যুগে চরিত্রসৃষ্টিতে এরূপ আত্মগত মন্তব্য-যোজনা প্রায় অপাংক্তেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম যখন উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন এদেশে আধুনিক বিশ্লেষণধর্মী চরিত্র-সৃষ্টির রীতি প্রবর্তিত হয়নি। এ অবস্থায় চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যে কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন শিল্পবিচারে তার স্থান কোথায় তাই হবে আমাদের বিচার্য।

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলে জীবনের যে গ্লানির দিক উদ্‌ঘাটিত হয় সেই পথে বিচরণ করার স্পৃহা স্বভাবতঃ রুচিশীল শিল্পী বঙ্কিমের ছিল না। সেজন্যই বোধ হয় কাহিনীর বিকাশ প্রচেষ্টায় ঘটনার প্রাচুর্য, মন্তব্য এবং বর্ণনাত্মক রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য এ কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিচিত্র ঘটনার আকস্মিক আবির্ভাবে বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্রগুলি যে অসামান্য দীপ্তিলাভ করেছে আধুনিক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসে তা বিরলদৃষ্ট। এ-ছাড়া আশ্চর্য ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ রচনা-শক্তি বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মলোক যেন এক নিমেষেই অনাবৃত করে দিয়েছে। চরিত্রসৃষ্টির ভূমিকা হিসাবে নায়িকার দীর্ঘ রূপ বর্ণনারীতিতে যে আতিশয্য দৃষ্ট হয় তা ভিক্টোরীয় যুগের রচনাদর্শ ও ক্লাসিক সাহিত্যপ্রীতিরই ফল সন্দেহ নেই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকৃতি বর্ণনা বহুস্থলে বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্রের রহস্যাচ্ছন্ন মর্মপ্রদেশকে যেন প্রদীপ্ত সূর্যালোকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে এরূপ বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা সেক্স্‌পীয়রের এবং কালিদাসের নাটকেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতএব চরিত্রসৃষ্টির কৌশল হিসাবে বঙ্কিমের রচনায় বর্ণনার ঐশ্বর্য একেবারে অনাবশ্যক বলে মনে করবার হেতু নেই। বঙ্কিম উপন্যাসের সব চাইতে ক্লান্তিকর বিষয় হল সদুপদেশ ও মন্তব্য নিয়ে মাঝে মাঝে লেখকের আত্মপ্রকাশ। শিল্পসৃষ্টিতে এরূপ লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতরণ শুধুমাত্র

বঙ্কিমের চরিত্রসৃষ্টি গৌরবকে ম্লান করেছে তা নয়, চাঁদের কলঙ্কের মত তাঁর অপূর্ব কারুকলাসমন্বিত শিল্পসৌধের গায়ে কতগুলি কালো আঁচড় লাগিয়ে দিয়েছে।

সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাসৃষ্টির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুধুমাত্র সংলাপ রচনায় নয়, কোন কোন উপন্যাসের পরিণতি সৃষ্টিতেও অদ্ভুত ব্যঞ্জনা কৌশল বঙ্কিমের শিল্পনৈপুণ্যের অন্যতম উদাহরণ। বস্তুতঃ কল্পনা-সমৃদ্ধি ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাসৃষ্টিনিপুণতা বঙ্কিমের কলাকৃতির উৎকর্ষের মূলে।

উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টির এই আশ্চর্য নৈপুণ্য যে কোন সাধারণ পাঠকেরও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এ-যুগের কোন কোন সমালোচক বঙ্কিমের শিল্প সৃষ্টিতে অপূর্ণতার পরিচয় পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই অপূর্ণতার অন্যতম উদাহারণ, তাঁদের মতে, কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা। কাহিনীর ঘটনাবর্তে যখনই কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে বঙ্কিম তার সহজ সমাধান অনুসন্ধান করেছেন অবিশ্বাস্য ধরণের অলৌকিক ঘটনার সমাবেশের সাহায্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রের পরিণতিও পূর্ব-নির্দিষ্ট হয়েছে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে। এই অলৌকিকে বিশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞানযুগে অচল ; অতএব শিল্পসৃষ্টির উপকরণ হিসাবে অশ্রদ্ধেয়। এ ধরণের সমালোচনার উত্তরে শুধু একথা বলা চলে, স্বপ্নদর্শন, জ্যোতিষে বিশ্বাস ও অলৌকিক ঘটনার প্রতি সেক্স্‌পীয়রের মত বঙ্কিমেরও বিশ্বাস ছিল ; সেজন্যই তিনি এ সমস্ত ঘটনাকে শিল্পসৃষ্টির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এই উপকরণের সাহায্যে শিল্পমূর্তি নির্মাণে তিনি সকল ক্ষেত্রে যে সার্থকতা লাভ করেছিলেন তা নয়—তবে বহু ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পগৌরব যে ক্ষুণ্ণ হয়নি একথা সত্য। বঙ্কিমের শিল্পকৃতির বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল আকস্মিক ঘটনার (chance) অবতারণায় কাহিনীতে চমৎকৃতি আনায়নের চেষ্টা। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, শুধু বঙ্কিম নয়, রোমান্টিক যুগের ইংরাজ ঔপন্যাসিকেরাও একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন লোকরঞ্জক কাহিনী রচনায়। তৃতীয়তঃ, বঙ্কিম উপন্যাসে অতিনাটকীয় বাক্য-বিন্যাসের সাহায্যে পাঠক-অন্তরে আবেগ সঞ্চারের যে চেষ্টা কিংবা বর্ণনায়

কোন কোন স্থলে যে অতিরিক্ত আড়ম্বরপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়—তাও রোমান্টিক যুগের অন্যতম ধর্ম।

রচনার কোন কোন স্থলে ভাবাতিশায়ী উচ্ছ্বাস, অতিকথন, আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং শিল্পকৌশলে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও একটা প্রবল প্রাণৈশ্বর্যময় আনন্দবেদনায় উদ্বেল গভীর জীবনবোধের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সে-যুগের শুষ্ক তত্ত্বান্বেষী শিক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে, যে জীবনচেতনার আবেদন সর্বযুগের মানুষের চিত্তে সমানভাবে সক্রিয়। এ জন্যে বঙ্কিম শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন যুগের স্রষ্টা নন, সর্বযুগের জীবন-সচেতন কবি।

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত ভূমিকা শুধু রসস্রষ্টা শিল্পীর নয়, স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল মনীষীরও। বঙ্কিম-মানসের মননশীল রূপ তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে আংশিক আত্মপ্রকাশ করলেও তার পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছে বঙ্কিমের চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ সাহিত্যে। মনীষী বঙ্কিমের এ বহুমুখী চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রসারিত করেছিল এবং স্থাপন করেছিল একটা দৃঢ় ও স্থির প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর। সে-প্রসঙ্গ এখন আমাদের বিবেচ্য।

আধুনিক সংস্কৃতি-সমালোচকের মতে সংস্কৃতির উন্নততর প্রকাশ জাতির মানস-সম্পদে (Ideational products)[১]। বঙ্কিমের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রচিন্তায় সে-যুগের বাঙালী এমন একটা চিত্তপ্রকর্ষের সন্ধান পেল যা ইতিপূর্বে দেশের মধ্যে ছিল দুর্লভ।

প্রথমতঃ, সাহিত্যচিন্তার কথাই ধরা যাক্। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তাঁর নিত্য নতুন সৃষ্টিনৈপুণ্য দেখে সমসাময়িক লেখকেরাও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সৃষ্টিক্ষেত্রে এই সক্রিয়তা স্রষ্টা বঙ্কিমের নিকট অভিনন্দনযোগ্য মনে হলেও শক্তিহীন লেখকের আদর্শবোধহীন অক্ষম রচনা-প্রয়াস ছিল গঠনশীল শিল্পী বঙ্কিমের একান্ত অনভিপ্রেত। সেজন্যে

১ গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ১৫

বিশ্লেষণী দৃষ্টির সাহায্যে দেশী ও বিদেশী ক্লাসিক সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে তিনি আদর্শ-সাহিত্যের একটা মান নির্ধারণের প্রয়াস পেলেন। সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়-প্রয়াসে সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্বযুগের বাঙালী লেখকের রচনার আলোচনা-গবেষণা ছাড়াও ক্লাসিক সাহিত্য জগতে প্রবেশ-চেষ্টা বঙ্কিমের উন্নত সাহিত্য চিন্তার পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তার মূল সূত্রগুলি অনুস্যূত হয়ে আছে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগুলিতে। বিভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করেছিল এই সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা :

"(১) জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সাহিত্যালোচনা

(২) প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

(৩) সমসাময়িক পুস্তক সমালোচনা

(৪) ধর্মতত্ত্বে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শিল্পসৃষ্টির রহস্য আলোচনা।"[১]

সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমের আলোচনা খুব ব্যাপক না হলেও এ-ধরণের আলোচনার সূত্রপাত করে সাহিত্যচিন্তার এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র সে-যুগের লেখক ও পাঠকের সামনে।

বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়েছে তাঁর সামাজচিন্তাকে আশ্রয় করে। সেই কারণে তাঁর সাহিত্য সমালোচনায় রোমাণ্টিক ভাব-বিহ্বলতা অনুপস্থিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্ট, ঋজুভাষায়। সাহিত্যভাবনা প্রকাশে বঙ্কিমের এই আধুনিক দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গী এ-যুগের সমালোচককেও বিস্মিত করে। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট :

"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের সে উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।"

এখানে সাহিত্যসৃষ্টিতে নীতিবোধের আদর্শ স্বীকৃত হলেও সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রেরণাও অস্বীকৃত নয়। এই দ্বৈত প্রেরণাই বঙ্কিমের সচেতন শিল্পসৃষ্টি-প্রয়াসের মূলে। এই মহৎ প্রেরণাকে বঙ্কিমচন্দ্র সকল সৃষ্টিকর্মের আদর্শ বলে

১ ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা, দেশ, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পভাবনায় একটা ক্রম-বিবর্তনের স্তরও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাঁর সাহিত্যচিন্তার পরিণত স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই কাব্যরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। এরূপ সাহিত্য-ভাবনায় বঙ্কিমের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। অবশ্য এই নবলব্ধ রোমান্টিক দৃষ্টির সূচনা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যচিন্তায় তথ্যনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিবর্তনের উপর সমান গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। সে যুগের সাহিত্য ভাবনায় এ-ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী।[১]

বঙ্কিমের সমাজ ভাবনার মূলমন্ত্র ছিল সমসাময়িক স্বাতন্ত্র্যহীন আত্ম-ভ্রষ্ট বাঙালীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। শক্তিমান বিদেশী সভ্যতার আঘাতে এত সুপ্রাচীন একটি জাতির দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভেঙে চুরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ছিল তা অসহনীয়। সে-যুগের আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্বদেশ চেতনায় অনুপ্রাণিত করবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন তাঁর সুবিখ্যাত সংবাদপত্র 'বঙ্গদর্শন'। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটা গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত হল এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কোন সময় তীব্র ভাবাবেগ দিয়ে, কোন সময় নৈয়ায়িকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, আবার কোন সময় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার স্বপ্নাভূতির সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে দেখলেন এ সংবাদপত্রের মাধ্যমে ; সে দৃষ্টি শুধু বর্তমানেরদিকে কেন্দ্রীভূত নয়, অতীতের দিকেও প্রসারিত। এই দৃষ্টির প্রত্যক্ষ ফল বঙ্কিমের নাতিবৃহৎ সমাজচিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী। এ সমস্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমের যে মনীষার দ্যুতি, এবং ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায় তা সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তায় কয়েকটি স্তরবিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম স্তরে এই সমাজভাবনা ইংরাজ লেখক সুইফ্‌ট-এর তিক্তমধুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও লঘু কৌতুকের সরস ধারায় উৎসারিত (দ্রষ্টব্য, লোকরহস্য, ১৮৭৪)। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বান নিক্ষিপ্ত হয়েছে কখনও নির্বিশেষ মানব সমাজের দোষ-দুর্বলতাকে লক্ষ্য করে, আবার কখনও বা সমকালীন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যমুগ্ধ মেরুদণ্ডহীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজীবনের অসঙ্গতিকে উপলক্ষ্য করে।

১ ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা, দেশ ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

"ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল" কিংবা "গর্দভ" নামক রসরচনায় মানবসমাজের স্বার্থান্ধ হীন প্রবৃত্তির উপর ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে; আবার পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত "বাবু" নামক কৌতুকপূর্ণ রচনার মধ্যে সমকালীন বাঙালী 'বাবু' চরিত্রের প্রায় সব রকম ত্রুটি নির্মল হাস্যালোকে রসরূপ লাভ করেছে। এই সমস্ত ব্যঙ্গ রচনায় বঙ্কিমের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী যে কোন সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বাবু' চরিত্র বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মবিশ্লেষণেও কুণ্ঠিত হননি। এই লঘুতরল ব্যঙ্গ সেই যুগের বাঙালীকে নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে যে সচেতন করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক ও গভীর সমাজভাবনায় মননের সঙ্গে উষ্ণ হৃদয়াবেগ যুক্ত হয়েছে "কমলাকান্তের দপ্তরে" (১৮৭৫)। এই পরিণত রচনায় বঙ্কিম ক্রান্তিদর্শী ঋষি এবং কবি। হাল্‌কা হাসির বুদ্‌বুদের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের গভীরতর সমাজভাবনা এই গ্রন্থে করুণ মাধুর্যে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-ভাবনা এখানে কখনও জাতির অতীত গৌরবস্বপ্নে বিভোর, কখনও সম-কালীন অবস্থা-বিপর্যয়ে বেদনায় উচ্ছ্বসিত, আবার কখনও বা বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাল্পনিক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনায় ব্যাপৃত। বঙ্কিম-সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত বলেন;—এ হাস্যরসাত্মক অথচ মননশীল গ্রন্থে বঙ্কিম একাধারে "কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশ প্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজ-শিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, ও স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?"[১]

কমলাকান্তের সত্যমূল্য নির্ণয়ে সুসমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের এই মন্তব্য মূল্যবান।

"মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে" সমকালীন আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন, পদমর্যাদা-লোলুপ ইংরাজ প্রভুর পদলেহী একশ্রেণীর ব্যক্তিত্ববোধহীন বাঙালীকে তীব্র ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ করা হয়েছে। এখানেও বঙ্কিমের সমাজ-ভাবনা দুর্বল জাতিকে

১ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১০৭

মোহমুক্ত করবার সাধনায় নিযুক্ত। চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত বলেছেন,—"মুচিরাম ঘটিরাম ইত্যাদির সৃষ্টি এক হিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজসেবা।"[১]

বস্তুতঃপক্ষে সমাজসচেতন বঙ্কিমের বিশিষ্ট সমাজভাবনার সরস অভিব্যক্তি উক্ত তিনখানি গ্রন্থ। "হুতোমের" পরে ব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত ও এক-শ্রেণীর উৎকেন্দ্রিক বাঙালীকে জাগিয়ে তোলবার এত সার্থক প্রয়াস সে যুগের বাঙ্‌লা দেশে ছিল একান্তভাবে দুর্লভ।

দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-ভাবনা মননশীল আলোচনা-গবেষণায় ব্যাপৃত। এই স্তরে বঙ্কিম-মনীষা সে-যুগের বাঙালীকে তরল মানসিকতামুক্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠোর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে যে ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার তুলনা এ-যুগের বাঙালী-সংস্কৃতির ইতিহাসেও বিরল। সে-যুগের প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য জাতির তুলনায় বাঙালীর মানস-সম্পদের দৈন্য বঙ্কিমের স্বদেশহিতৈষী চিত্তকে পীড়িত করেছিল নিশ্চয়ই। পরিহাস-রসিকতাপ্রিয় বঙ্কিম তাই হয়ে উঠলেন পরম গম্ভীর। স্পষ্ট, ঋজুরেখায় অতঃপর তিনি জাতির সম্মুখে উপস্থিত করলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর বিচিত্র চিন্তাধারাকে। ফলে সৃষ্টি হল বঙ্কিমের হাতে আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্য, যে শ্রেণীর সাহিত্যকে একজন আধুনিক সমালোচক অভিহিত করেছেন 'চিন্তা সাহিত্য' বলে।[২] বঙ্কিমের প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও পরিণত চিন্তার ফসল রূপ পেতে লাগল বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত কাব্য, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষা, সঙ্গীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পরে বাঙালীর মানস-সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে এত সচেতন ও ব্যাপক আয়োজন 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার পূর্বে আর দেখা যায়নি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত বিচিত্র বিষয়কে রূপ দেবার জন্যে উপযুক্ত লেখক-গোষ্ঠী তখনও

১ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ২৭৪

২ নারায়ণ চৌধুরী, আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন, পৃঃ ৬৬—৭২

তৈরী হয়নি। বঙ্কিম তাই এ সমস্ত রচনার প্রায় পনের আনা অংশ নিজেই লিখতে লাগলেন। বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে মনীষী বঙ্কিম এ যুগে যে অতিমানবীয় শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সেই শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন সব্যসাচীর শক্তির সঙ্গে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙালীর চিত্তপ্রকর্ষের জন্যে বঙ্কিম যদি সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক সূত্রপাত না করতেন তা হলে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যে আরও বিলম্বিত হত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই স্তরে বঙ্কিম-মনীষার শ্রেষ্ঠ দান হল বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৭৭, ১৮৯২) এবং সাম্য (১৮৭৯)।

জাতীয় মানসের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চাকে বঙ্কিম যে অপরিহার্য মনে করতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'র সমর্থনে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ। জাতির চিত্তকে আধুনিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বঙ্কিমের বিজ্ঞানপ্রীতি পূর্বসূরী রামমোহনের মত কৌতূহলের সীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকেনি ; বিজ্ঞান বিষয়ে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েও তিনি চিন্তাশীল লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের মত বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার ব্যাপক প্রসার-চিন্তায় ব্যাপৃত হন। সে-যুগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সমূহকে প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরে বঙ্কিম যেভাবে সরল ও সরস রূপ দেন, বাংলা ভাষায় সেরূপ বিজ্ঞানালোচনা এ যুগেও দুর্লভ বলা চলে। হক্‌স্‌লি, টিণ্ডল, প্রক্‌টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের মতাবলম্বনে নয়টি প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানালোচনার দিকে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। বিজ্ঞানাশ্রয়ে বঙ্কিম যে জাতীয় সংস্কৃতি-প্রসারের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতীয় জীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে তার বিস্তৃতি। বঙ্কিমের সমাজ চিন্তায় একটা বিপুল ব্যাপ্তি এ সময় থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে।

'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমের পরিণত মননশীলতা ও সমাজচিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সে প্রবন্ধ-গুলিকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন এ ভাবে :

সাহিত্য — সাতটি

প্রত্নতত্ত্ব — চারটি
ইতিহাস ও অর্থনীতি — দশটি
দর্শন ও ধর্ম — দশটি
বিবিধ— সাতটি

এই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও প্রখর ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ছিল মনীষীর গভীরতর সমাজচিন্তারই পরিচায়ক। বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন প্রাচীন গৌরব-চেতনাহীন কোন জাতি কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। সেজন্যে স্বজাতিহিতৈষী বঙ্কিম আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে উদ্ধার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন বাঙালী জাতির জন্মবৃত্তান্ত, এবং বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহমুগ্ধ, স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহাহীন সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করবার অভিপ্রায়ে বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় বঙ্কিম তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধানকার্য শুরু করেছিলেন :

১. নৃতত্ত্ব
২. রাজবৃত্ত
৩. লোকবৃত্ত

প্রধানতঃ লোকবৃত্তের ভিত্তিতে বাঙ্‌লা দেশের ইতিহাস রচনার দিকে বঙ্কিমের আকর্ষণ বেশী থাকলেও বাঙালী জাতির ইতিহাস পুনর্গঠনে তিনি রাজবৃত্তকেও উপেক্ষা করেননি[১]। প্রাচীন বাঙালীর জীবন ও কর্মের সামগ্রিক পরিচয়কেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন আত্মবিস্মৃত জাতির সাম্‌নে। সে বিপুল ও আয়াসসাধ্য কাজ এক জনের চেষ্টায় সমাপ্ত করা সম্ভব নয় বলে তিনি সকাতর আহ্বান জানিয়েছিলেন সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীকে জাতির গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন বিস্মৃত ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্যে।

জাতির নবজাগরণের দিনে প্রাচীন ইতিহাসের দিকে বঙ্কিমের এ সানুরাগ দৃষ্টি কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন, জাতির

১ ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৬৩

আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি আত্মস্মৃতির জাগরণে; আর মানুষের সৃষ্টিমূলক সকল প্রেরণার উৎসই হল এ আত্মবিশ্বাস। আত্মশক্তি জাগরণের অভিপ্রায়ে দেশের প্রাচীন ইতিহাস চর্চার জন্যে বঙ্কিমের সে ব্যাকুল আহ্বানে সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালী যে সাড়া দিয়েছিল, আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঙ্লার ইতিহাসের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, বাঙালীর ইতিহাস পাঠক-মাত্রই তা জানেন।

এই নবজাগ্রত ইতিহাস-চেতনা চিন্তাশীল বঙ্কিমের সমাজ-সচেতন মনকে সবলে আকর্ষণ করল ভারত-সংস্কৃতির বিস্তৃততর ক্ষেত্রে। প্রবল ইতিহাসনিষ্ঠ মননের সাহায্যে বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, ভারতীয় জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে বাঙালী জাতির উত্থান-পতনও নিবিড়ভাবে যুক্ত। বাংলার জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে ভারতেতিহাসের এ নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার বঙ্কিমের প্রগতি-শীল চিন্তার স্বাক্ষর। জাতির অতীত সম্পর্কে বঙ্কিমের এ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় সে-যুগের জাগরণোন্মুখ বাঙালী-মনকে ভারতের বৃহত্তর জাতীয় ইতিহাসের উদার রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে সহায়তা করেছে—বাঙালী-সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালী-মানসের এ পরিধি-বিস্তারের স্তরটিও লক্ষণীয়।[১]

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতসংস্কৃতির সূত্র অনুসন্ধানে ভারতেতিহাস আলোচনা করেছিলেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও কয়েকটি মননশীল রচনায়। ভারতেতিহাস আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের সুমহান জীবনবোধ ও গৌরবোজ্জল জীবনাদর্শের পরিচয় নিহিত আছে ইতিহাসের প্রাচীন যুগে। সেই যুগ হিন্দু-সংস্কৃতির যুগ। ভারতেতিহাসের মধ্যযুগ হল জাতির একটি 'মহতী বিনষ্টি'র যুগ। সে-যুগে বিদেশাগত মুসলমান ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছিল, অবশ্য ভারতের জাতীয় জীবনের দুর্বলতার মধ্যেই নিহত ছিল সে ধ্বংসের বীজ। সুপ্রাচীন ভারত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল বলে ভারতেতিহাসের মধ্যযুগ স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিমের অন্তরে কোন শ্রদ্ধার সৃষ্টি করতে পারেনি। অপর পক্ষে বঙ্কিমের সশ্রদ্ধ চিত্তকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করেছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মননশীল রূপ ও শিল্পকীর্তিগুলি। সেই জ্ঞান কর্ম ও প্রেমময় প্রাচীন হিন্দু

১ ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩

যুগের ইতিহাস ও জীবনাদর্শকে সে-যুগের আদর্শভ্রষ্ট জাতির সাম্নে তুলে ধরাই ছিল বঙ্কিমের ভারতেতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা অনুস্যূত হয়ে আছে সাংখ্যদর্শন, হিন্দুধর্ম, বেদের দেবতা, Buddhism and the Sankhya philosophy, Vedic Literature প্রভৃতি গবেষণাত্মক প্রবন্ধে। মহাভারতের যুগ ও কৃষ্ণচরিত্রের নিপুণ নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও বঙ্কিমের প্রাচীন ভারতসংস্কৃতি-প্রীতিরই ফল। এই উদার সংস্কৃতি আলোচনার ফলে বঙ্কিমের বিশ্বাস হয়েছিল একমাত্র সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাই এনে দিতে পারে জাতির বাঞ্ছিত মুক্তি, এবং সেই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পরমত-সহিষ্ণু ইংরাজ রাজত্বেই লভ্য। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচ্য নয়।

বঙ্কিমের বিশিষ্ট সমাজভাবনা ক্রমশঃ দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যে বিশ্বসমাজ-চিন্তার উদার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে "সাম্য" প্রবন্ধে। বঙ্কিমের সমাজ-ভাবনার এই বিস্তৃতি সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালী মানসের ক্রমবর্ধমান মানস-কৌতূহল ও সহানুভূতির প্রতীক। ব্যাপক অর্থে আন্তর্জাতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মননশীলতার বিস্তার উন্নত সংস্কৃতির একটা প্রধান লক্ষণ। মানব সমাজের অসম অবস্থা ও বৈষম্যের কারণ নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় এ মননশীল গ্রন্থ। কিন্তু স্বীয় নবপ্রচারিত অনুশীলন তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে চিন্তাশীল বঙ্কিম এই প্রিয় গ্রন্থখানির প্রচার বন্ধ করে দেন।

সমাজচিন্তার তৃতীয় স্তরে বঙ্কিমের সমাজ-ভাবনা একটা সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপ লাভ করেছে ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্ব-বিজ্ঞানী মিল, বেন্থাম, কঁত প্রভৃতি চিন্তানায়কদের প্রভাবে। এ তাত্ত্বিক সমাজভাবনার অন্যতম ফসল হল চিন্তানেতা বঙ্কিমের "অনুশীলন" ও "ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থ। ধর্মচিন্তাও ব্যাপক অর্থে বঙ্কিমের সমাজচিন্তার অন্তর্ভুক্ত। এই সমাজ-ভাবনায় বঙ্কিম যে পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞানের হুবহু অনুকরণ করেছেন তা নয়, তাঁর স্বতন্ত্র মননশীলতাও যুক্ত হয়েছে একটা আদর্শ সমাজবিজ্ঞান-তত্ত্ব গড়ে তুলবার জন্যে। পাশ্চাত্ত্য

সমাজতত্ত্বের মধ্যে বঙ্কিমের সমাজচিন্তার উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল কঁতের (Compte) ধ্রুববাদ (Positivism)। কঁতের মত বঙ্কিমও বিশ্বাস করতেন, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ অনুশীলন-সাপেক্ষ। এই অনুশীলন ঐহিক ও পরমার্থিক সকল বিষয়েরই জ্ঞানানুশীলন। ঐহিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব বহির্বিজ্ঞানের সাহায্যে, আর পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সোপান হল অন্তর্বিজ্ঞান। 'ধর্মতত্ত্বে'র পঞ্চদশ অধ্যায়ে বহির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানার্জনে কঁতের নির্দেশকে বঙ্কিম অভ্রান্ত মনে করেছেন। এই ধরণের জ্ঞানলাভের জন্যে কঁত জোর দিয়েছিলেন—Mathematics Astronomy, Physics, Chemistry, Biology, Sociology প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির অনুশীলনের উপর। বঙ্কিমও কঁতের মত সমকালীন বাঙালীর আত্মজাগরণের জন্যে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সম্যক অনুশীলন অপরিহার্য মনে করেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বহির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা বেশী। সেজন্যে বঙ্কিম এই ধরণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বদেশবাসীকে পাশ্চাত্ত্যের দ্বারস্থ হতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের সম্যক অনুশীলন ও বিকাশের জন্যে বঙ্কিম দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, গীতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করতে। এখানেই সমাজচিন্তায় বঙ্কিমের স্বাতন্ত্র্য। ঐহিক বিষয়ে তাঁর দেশ পাশ্চাত্ত্য অপেক্ষা হীন হলেও পারমার্থিক জ্ঞান ও উপলব্ধিতে ভারতীয় সাধনা সুপ্রাচীন কাল হতেই যে পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ এ-বিষয়ে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচল।

এই বিশিষ্ট সমাজ-ভাবনাই বঙ্কিমের চিত্তকে ক্রমশঃ প্রসারিত করল ভারত-সংস্কৃতির উদার আকাশে। তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ পর্যায় তিনি অতিবাহিত করেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা ও গবেষণায়। নিবিষ্ট পাঠের ফলে তিনি সেই সংস্কৃতির সবল রূপ প্রত্যক্ষ করলেন প্রাচীন হিন্দুর পুরাণের মধ্যে। এখানেই যুগস্রষ্টা রামমোহনের সংস্কৃতি-ভাবনা থেকে বঙ্কিমের জাতীয় সংস্কৃতি-চিন্তা নতুন রূপ লাভ করল। রামমোহন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখেছিলেন উপনিষদের সূক্ষ্ম ভাবধারায়, আর বঙ্কিম সেই সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ও বহু-বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করলেন হিন্দুর বিভিন্ন পুরাণ, বিশেষ করে

মহাভারতের সামগ্রিক জীবনবোধের মধ্যে। পৌরাণিক যুগের সমন্বয়াশ্রয়ী জীবনাদর্শ বঙ্কিমের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করল এক উন্নত সংস্কৃতির। সেই সংস্কৃতির ভিতর মানবমাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখলেন তিনি। সেজন্যে সেই পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ-প্রভাবিত প্রগতির যুগেও হিন্দু-সংস্কৃতি প্রচারে দ্বিধা করলেন না বঙ্কিমচন্দ্র। সনাতন হিন্দু-সংস্কৃতির ভিতর প্রত্যক্ষ করলেন তিনি সমাজ-প্রগতির এক প্রাণময় ধারা। সেই মৃত্যুঞ্জয় সবল ও সচল সংস্কৃতিধারাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে শোধন করে জ্ঞানের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি অনুশীলনধর্মে, ধর্মতত্ত্বে, কৃষ্ণচরিত্রে, শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় এবং Latters on Hinduism-এ। আত্মবিস্মৃত জাতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসীমা থেকে মোহ-যবনিকা ক্রমশঃ অপসারিত হল। বাঙালীর বহির্মুখী দৃষ্টি ও বিকেন্দ্রিক কল্পনা আত্মস্থ হবার অবকাশ পেল। বাঙালীর মনের গণ্ডিরেখা পরিবর্তিত হল এবং আকৃষ্ট হল জাতীয় জীবনের সনাতন সত্য ও শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতি। এই ভাবমুক্তিই বাঙালী জীবনে এনে দিল নতুন সাহিত্য, নতুন চিত্রশিল্প, নতুন সঙ্গীত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কোটিতে বাঙালী সংস্কৃতির নবজন্ম হল।

সমাজ ও সাহিত্যচিন্তার মত রাষ্ট্র-ভাবনাও উন্নতর সংস্কৃতির লক্ষণ। বঙ্কিমের রাষ্ট্র-ভাবনায় আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত আরও প্রসারিত হল। রাষ্ট্র-ভাবনার উৎসমূলে স্বজাতি ও স্বদেশচেতনা। একটা প্রবল দেশাত্মবোধের প্রেরণায় জাতি যখন প্রবলতর কোন বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংহত হয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় তখনি সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রনীতির। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি শুধুমাত্র দেশাত্মবোধের সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় কার্যক্রম নির্ধারণ রাষ্ট্রনীতির একটা অন্যতম অঙ্গ।

মধ্যযুগে মুসলমান অধিকারের সময় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে ছাড়া ভারত-বাসীর রাষ্ট্রচেতনা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তার কারণ সে যুগের পরাজিত হিন্দু রাজ্যাধিকার হারিয়ে সমাজ সংরক্ষণের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিল। ভারতে মুসলমান অধিকার-যুগ চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে একটা

শূন্যতার যুগ। এই মানসিক নিষ্ক্রিয়তার যুগে বাঙালী তথা ভারতবাসী জাতীয় স্বাধিকারবোধের চেতনাও ফেলেছিল হারিয়ে। ভারতীয় জাতির দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এত বড় সাংস্কৃতিক বিপর্যয় আর দেখা যায়নি। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চাদাবর্তনের প্রধান লক্ষণ হল চিন্তার দৈন্য। সে দৈন্যই প্রকট হয়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতির ইতিহাসে মধ্যযুগে।

স্বাধিকার সম্পর্কে জাতির চিত্তে নতুন চেতনা দেখা দিল ইংরাজশাসিত ভারতে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিচিত্র ধারা শুধু যে জাতীয় চিত্তের বহুযুগের কুসংস্কার দূরীভূত করতে সহায়তা করল তা নয়, জাতির সীমাবদ্ধ চিন্তারাজ্যে বিশ্বচিন্তার স্রোত প্রবাহিত করে দিয়ে স্বাধিকারবোধের চেতনাকেও করে তুলল ক্রমশঃ তীব্র হতে তীব্রতর। ব্যাপক ভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির ইতিহাস পাঠই ছিল সেই যুগের বাঙালীর চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ঘটাবার প্রধান উপকরণ। ভারতীয় জাতি সমূহের মধ্যে এই চিন্তাবিপ্লব সর্বপ্রথম সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাঙালীর জীবনে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যে পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করল এক নতুন জীবনবেদ। বাঙালীর জীবন ও চিন্তারাজ্যে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন :—

"All the great events which have influenced European thought within the last 100 years, have also told, however feeble their effect may be on the formation of the intellect of modern Bengal. The independence of America, the French Revolution, the war of Italian Independence, the teachings of history, the vigour and freedom of English literature and English thought, the great effort of the French intellect of the 18th Century,......all these have influenced and shaped the intellect of modern Bengal."

পাশ্চাত্ত্য কোন কোন জাতির মুক্তিসংগ্রামের জীবন্ত প্রভাব দেখা দিয়েছিল রামমোহনের রাষ্ট্র-চিন্তায়। জাতীয় জাগরণের প্রথম যুগে এ-মনীষীর রাষ্ট্র-চিন্তা

কৌতূহলের সীমা অতিক্রম করে মননের সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে-যুগের পক্ষে রামমোহনের প্রগতিশীল রাষ্ট্র-চিন্তা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী বাঙালী মনীষী বা সাহিত্যিকদের দ্বারা অনুশীলিত বা অনুসৃত হয়নি। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা হেমচন্দ্রের কাব্য-সঙ্গীতে যে আবেগময় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত, তার সঙ্গে রাষ্ট্র-চিন্তার কোন নিগূঢ় যোগ নেই। সমকালীন ভাবোচ্ছ্বাসিত স্বদেশচেতনার সঙ্গে মনন-শীল ভাবনা যুক্ত হল বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তায়। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের দেশাত্মবোধে যে রাষ্ট্র-চিন্তার সূচনা শতাব্দীর শেষার্ধে বঙ্কিমের মনীষায় সে-চিন্তার বিকাশ।

পরাধীনতার জন্যে একটা সুতীব্র বেদনাবোধ বঙ্কিমের সুচিন্তিত রাষ্ট্র-চিন্তার মূলে। বঙ্কিম যে মুক্তি-স্বপ্নে অধীর হয়েছিলেন, তা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, সে হল স্বদেশীয় সংস্কৃতির মুক্তি। যে সমস্ত বিদেশী শাসক ভারতের সংস্কৃতি সাধনায় অতীতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বঙ্কিমের সীমাহীন আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছে সেই বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে। বঙ্কিমের তথাকথিত মুসলমান-বিদ্বেষের মর্মার্থ হল এই। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলমানকে দেখেছিলেন তিনি দ্বৈতসত্তায়। কোন কোন ব্যক্তি-মুসলমানের ভিতর মানব-মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতি দেখে তিনি শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন, কিন্তু জাতি হিসাবে এই প্রচণ্ড শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল বঙ্কিম তা ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেন নি। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বিষ্ট মুসলমান রাজশক্তিকে দেখেছিলেন তিনি অত্যাচারীর প্রতীক হিসাবে। এই প্রতীকতার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাত্রেরই প্রতি জাতীয় চিত্তে একটা বিরোধের ভাব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[১]

বঙ্কিমের রাষ্ট্র-চিন্তা এখানে সমসাময়িক স্বদেশানুভূতির আবেগবিহ্বলতার স্তর অতিক্রম করে বলিষ্ঠ মননের রাজ্যে উত্তীর্ণ।

সুগভীর স্বদেশপ্রেম বঙ্কিমের রাষ্ট্র-চিন্তার ভিত্তি হলেও এই স্বদেশপ্রেমে কোন সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতা ছিল না। যে স্বদেশপ্রেম স্বার্থান্ধ, পরমত-অসহিষ্ণু, এবং দুর্বল জাতির স্বাধীনতা অপহরণ-তৎপর, সেই স্বদেশপ্রেমের

১ বিপিনচন্দ্র পাল, বাংলার নবযুগ, বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

প্রতি বঙ্কিমের ঘৃণা ছিল পর্বত-প্রমাণ। য়ুরোপীয় Patriotism-এর ভিতর সঙ্কীর্ণতা দেখে বঙ্কিম সেই স্বদেশপ্রেমের আদর্শ ভারতবাসীর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। এখানে বঙ্কিম আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁর উত্তরসূরী চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে।

স্বদেশ-ভাবনার সঙ্গে ধর্ম-ভাবনা যুক্ত হয়ে বঙ্কিমের রাষ্ট্র-চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা প্রশস্ত ভাবভিত্তির উপর। যে সমাজে ধর্মবোধ নেই সেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বঙ্কিমের মতে ছিল অকল্পনীয়। আর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র অনুশীলন শুধু স্বাধীন দেশেই সম্ভব। সুতরাং স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা প্রত্যেক দায়িত্বশীল জাতির পবিত্র কর্তব্য। বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই জগতের প্রত্যেক জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। দুর্বলতর জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হরণ না করা, আবার ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য নিজ দেশের স্বাতন্ত্র্যের উপর কোন শক্তিমান রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও সহ্য না করা করা—এই ছিল বঙ্কিমের রাষ্ট্র-ভাবনার মূল অভিপ্রায়। বঙ্কিমের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সঙ্গে বর্তমান স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে।

রাষ্ট্র-চিন্তার একটা পরিণত স্তর হল বৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন। "সাম্য" গ্রন্থে বঙ্কিম সেই আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাস অনুশীলনের ফলে বঙ্কিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদী জাতিগুলি বিশ্বমৈত্রীর ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গঠনের পরিবর্তে মানুষে মানুষে জাগিয়ে তুলেছে তীব্র বিরোধ। বঙ্কিমের সাম্যাদর্শ-প্রচারমূলক গ্রন্থ 'সাম্যের' প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার এ-ও একটা কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। যে ধর্মবোধ-হীন সাম্যাদর্শ মানুষকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে তোলে সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতাবোধ মানবসভ্যতা-বিধ্বংসী বলেই বঙ্কিমের মনে হয়। এই নবতর উপলব্ধির ফলে বঙ্কিম তাঁর রাজনৈতিক স্বাধীনতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলেন বিশ্বজনীন মৈত্রীর ভিত্তিতে।
বঙ্কিমের রাষ্ট্র-চিন্তার পরিণতি এই সমন্বয়ের আদর্শ।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তা স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়েছে 'আনন্দমঠ'

উপন্যাসে। দেশের রাজা অত্যাচারী হলে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন কিরূপ বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠে তার জীবন্ত আলেখ্য এই উপন্যাসে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের চিত্র। যে দুর্বল রাজশক্তি অগণিত নিরপরাধ প্রজাপুঞ্জের এই মর্মান্তিক পরিণামের জন্য দায়ী সেই রাজশক্তিকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎখাত করা প্রয়োজন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সেই বিপ্লব-শঙ্খ বেজে উঠেছে। আনন্দমঠ সর্বাংশে ইতিহাস-নিষ্ঠ নয় সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের এই বিপ্লব-স্বপ্ন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-বিপ্লবেরই পূর্বসংকেত।

কিন্তু সাগ্নিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী প্রভুশক্তির পরাজয়টাই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের চরম কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, বিপ্লবীরা আত্মঘাতী। জাতীয় জীবন সুগঠিত হবার আগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এলেও সেই স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। স্বাধীনতার স্থায়িত্বের জন্যে প্রয়োজন বহির্বিষয়ক জ্ঞানের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয়। ভারতের মাটিতে নবাগত বিদেশী ইংরাজের সাহায্যেই বহির্বিষয়ক জ্ঞান লভ্য; সেজন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে ইঙ্গিত করেছেন স্থায়ী স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হবার জন্যে ইংরাজ জাতির সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন। বঙ্কিমের রাষ্ট্র-চিন্তায় এখানে জাতির গঠনমূলক দিকটাই প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমের স্থির বিশ্বাস ছিল, প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী রাজশক্তিকে পরাভূত করবার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে ভারতবাসীকে বহির্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করতে হবে তাদেরই কাছে। বঙ্কিমের সুচিন্তিত রাষ্ট্রনৈতিক মতামত যে অর্থহীন নয় ভারতবর্ষের পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য। আত্মশক্তির জাগরণই বঙ্কিমের মতে স্বাধীনতালাভের প্রধান উপায়। 'কমলাকান্তে'-ও ক্রান্তিদর্শী মনীষী বঙ্কিম জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন এই আত্মশক্তির উপর নির্ভর করবার জন্যে। বঙ্কিমের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-চিন্তায়ও আত্মশক্তির জাগরণের উপর মুখ্যতঃ জোর দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমের রাষ্ট্র-চিন্তা কত প্রগতিশীল ও ভ্রান্তিহীন ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনের পরবর্তী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়েই তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে।

উপসংহারে শুধু একটা কথা স্মরণীয়: বঙ্কিম শিল্পী হিসেবে মহৎ, কিন্তু মনীষী হিসাবে মহত্তর। জাতীয় জীবনের এমন দিক অল্পই আছে যাকে স্পর্শ করেনি বঙ্কিমের মননশীল চিন্তাধারা। আধুনিক শিল্পবিচারে বঙ্কিমের কলাকৃতি হয়ত প্রশ্নাধীন থাকবে, কিন্তু অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অনির্বাণ স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় বঙ্কিম আধুনিক সংস্কৃতি-নির্মাণে যে প্রাণান্তকর প্রয়াসের ও গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বঙ্কিমকে আধুনিক বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি-সাধকদের মধ্যে একটি উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী করবে।

১২

চিন্তাসমন্বয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র

বাংলা উপন্যাস-জগতে বঙ্কিমের মত শিল্পীর আবির্ভাব সে-যুগে যেমন আকস্মিক তেমনি কতকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল বঙ্কিমের শিল্প-সাধনার যুগ। এ-যুগে শিল্পী বঙ্কিম মনোময় গল্পে ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাসে সমকালীন নব্য-শিক্ষিত বাঙালী সমাজের নিকট যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশন করলেন তা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ অভাবনীয় অন্যদিকে তেমনি উচ্চশ্রেণীর। কি ভাষার গাম্ভীর্যে, কি ভাবব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতে, কি ঘটনার চকিত-চমকে, কি সুদূর-প্রসারী কল্পনায়, কি মনস্তত্ত্বে, কি সমাজতত্ত্বে শুধুমাত্র একজন লেখকের সাধনায় বাংলা উপন্যাসের অভাবনীয় উন্নতি দেখে এই মহৎ প্রতিভার নিকট সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মন শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ল। চারদিকে বঙ্কিমের জয়জয়কার পড়ে গেল। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য-পাঠকমাত্রই বঙ্কিমকে 'সাহিত্যসম্রাট' বলে আখ্যায়িত করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে লাগলেন।

কিন্তু লোকপ্রিয়তার এই চরম শীর্ষে আরোহণ করেও বঙ্কিম অকস্মাৎ তাঁর সাহিত্য সাধনার দিক্-পরিবর্তন করলেন। বঙ্কিম-রচিত কাহিনী-মুগ্ধ পাঠক যখন এই প্রতিভাশালী শিল্পীর নিকট আরও নিত্যনতুন উপন্যাস প্রত্যাশা করছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁর অনুরাগী পাঠকের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করে এবং রসচর্চার ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন ধর্মচর্চায়। এই ধর্মচর্চার মুখ্য ফল "ধর্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্র"।

সৃষ্টিমূলক সরস সাহিত্যচর্চা হতে চিরতরে অবসর গ্রহণ যে কত বড় আত্ম-হত্যার সামিল সে-সম্পর্কে সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিম যে অনবহিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু জাতির প্রতি একটা মহত্তর কর্তব্যের প্রেরণা তাঁকে কেবল রসচর্চার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবিষ্ট করে রাখতে পারেনি। সাহিত্যচর্চাকে তিনি কখনও অবসর

বিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সাহিত্য ছিল এই স্বদেশ-প্রেমিক মনীষীর স্ব-দেশ ও স্ব-জাতিসেবার প্রধান বাহন।

· কি অবস্থায় ও কত বড় খ্যাতির মোহ পরিত্যাগ করে স্বজাতিসেবার প্রেরণায় বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা আরম্ভ করেছিলেন তা বোঝাবার জন্যে এই ভূমিকার অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যখন থেকে মনীষী বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, সে-যুগের পরানুকরণস্পৃহ শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের জন্যে একান্তভাবে রসচর্চার আয়োজন জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে অর্থহীন, সে দিন থেকে কোথায় পড়ে রইল তাঁর প্রিয় লেখক সেক্স্‌পীয়র, শেলী, বায়রণ, কীট্‌স, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থচর্চা—এখন থেকে বঙ্কিমের টেবিলে শোভা পেতে লাগল মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ, বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র, পরকালতত্ত্ব, miracle, আর য়ুরোপীয় দার্শনিক মিল, কঁত, ফিক্‌টে, সিলি, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দার্শনিকদের অমূল্য গ্রন্থগুলি। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে বঙ্কিম বুঝতে পারলেন যে, একটা সংস্কারমুক্ত সবল জাতি গঠিত না হলে কেবল সাহিত্য কেন, ভবিষ্যতে কোন সুকুমার শিল্পের সৃষ্টি এবং উপভোগও সম্ভব হবে না। সে-জন্য এখন থেকে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হল কি করে তৎকালীন বাঙালীর বহু-যুগ-সঞ্চিত মোহ ও সংস্কারের মূলে একটা রূঢ় আঘাত দিয়ে জাতীয় দৃষ্টিকে মোহ-মুক্ত, মনোবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক এবং ধারণাকে বাস্তবমুখী করে তুলবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আকস্মিক প্রভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবাদের কয়েকটি ক্ষীণ রশ্মি বাঙালীর তমসাচ্ছন্ন চিত্তভূমিকে কিছুটা আলোকিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন পর্যন্ত নানা প্রকার সংস্কারের প্রভাবে প্রাণহীন। এ-অবস্থায় কি ভাবে সে-যুগের বাঙালী-মানসকে সংস্কারমুক্ত করে আধুনিক করে তোলা যায়—এই হল বঙ্কিমের অতন্দ্র চিন্তার বিষয়। এই চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল এই সময় বাঙালীর চিন্তারাজ্যে বঙ্কিম-প্রবর্তিত একটা প্রবল ভাবান্দোলনের সৃষ্টি।

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মন চিরকালই অন্তর্মুখী; রাষ্ট্র-চিন্তা তার

অন্তরে তেমন সাড়া জাগায় না, যেমন সাড়া জাগায় ধর্ম-চিন্তা। স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালী আর ভারতবাসীর ধর্মবিশ্বাস বিকাশলাভ করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।" 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপক্রমণিকায় বঙ্কিম বাঙালীর কৃষ্ণভক্তির পরিচয় দিয়েছেন এ-ভাবে :

"বাংলা দেশে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণমন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম·· কৃষ্ণ এ দেশে সর্বব্যাপক।"

অথচ যে কৃষ্ণ-পূজাকে বাঙালী তার অধ্যাত্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত সেই কৃষ্ণ সম্বন্ধেই এমন কতগুলি অলৌকিক ও অসম্ভব উপাখ্যানে বিশ্বাস করে যাতে তার জাতীয় চরিত্র দুর্বল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে :

"কিন্তু ইহারা ভগবানকে কিরূপ ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে ননীচোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন, কৈশোরে পরদারিক, অসংখ্য গোপ-নারীকে পাতিব্রত্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন।"

কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা

ভগবান সম্বন্ধে এরূপ বিকৃত চিন্তার ফলে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র যে ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল বঙ্কিম তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন :

"ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন ধর্মদ্বেষীগণ ইহা বলিয়া থাকেন এবং সেই কথার প্রতিবাদ করিতে কখনও কাহাকেও দেখি নাই।"

কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা

তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিম নিজেও এ-কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দুর চিরপূজ্য দেবতা সম্পর্কে এই অন্ধ বিচারহীন বিশ্বাসই বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। কৃষ্ণচরিত্রের পৌরুষ ও বীর্যের আদর্শকে গ্রহণ না করে তরল ভাবালুতাপূর্ণ প্রেমের

আদর্শকে গ্রহণ করায় বঙ্কিম তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' অতি দুঃখে লিখেছিলেন :

"জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।"

দূরদর্শী বঙ্কিম তাই উপলব্ধি করলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর জড় প্রাণে চেতনার সঞ্চার করতে হলে জয়দেবের কৃষ্ণকে নয়, মহাপৌরুষের প্রতীক পাঞ্চজন্যের অধিকারী "মহাভারতের সেই আদর্শ পুরুষকে আবার জাতীয় জীবনে জাগরিত করিতে হইবে"। কারণ মহাভারতের কৃষ্ণই সেই আদর্শ পুরুষ যাঁর ভিতর সমস্ত মানবীয় বৃত্তির চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য হয়েছে। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরুদের জীবন বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝতে পারলেন, এঁদের চরিত্রে দয়া, ধর্ম, জীবপ্রেম ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ মানবীয় বৃত্তির স্ফুরণ হলেও রাজকার্যের জন্য যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন অপরিহার্য তা তাঁরা করেন নি। অথচ এরূপ ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল।

ভারতীয় কাব্য-পুরাণ-ইতিহাসাদি আলোচনা করে বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে মানবোচিত এমন সমস্ত গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় পুরাণোল্লিখিত অন্য কোন চরিত্রে যা দেখা যায় না :

"কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্মপ্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজ-পুরুষদিগের, তপস্বীদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।"

কৃষ্ণচরিত্র—পৃঃ ৮৭

মিলের হিতবাদ, অগাস্ট্‌ কঁতের ধ্রুববাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুশীলনবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সঙ্গে নিজের স্বাধীন চিন্তার সহযোগে বঙ্কিম যখন উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তখন তিনি সিলি প্রণীত Ecce Homo গ্রন্থের কতকটা অনুসরণে কৃষ্ণকে মানুষরূপে—স্বপ্রচারিত অনুশীলনধর্মের আদর্শরূপে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সামনে তুলে ধরলেন। এই হল বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা।

কৃষ্ণচরিত্র রচনা ও শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করতে বঙ্কিম আমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশী নানা শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে এবং স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে মহাভারতের মূল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি প্রত্যেকটি পুরাণোল্লিখিত তথ্যের বিচার করছেন, অনেক স্থানে বিদেশী মতের সঙ্গে স্বদেশীয় প্রচলিত মতের তুলনা করেছেন, যা তাঁর নিকট অসার ও কবি-কল্পনামাত্র মনে হয়েছে তা বর্জন করেছেন এবং যা প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মানবাদর্শের পূজারী Rationalist বঙ্কিম "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এই বিশ্বাস থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি।

"আমি নিজেও কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।"

এখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে দীপ্যমান হয়ে উঠে। বঙ্কিমের সমস্ত জীবনসাধনাই হল সামঞ্জস্যের সাধনা, এবং 'কৃষ্ণচরিত্রে' সেই সমন্বয়-সাধনা একটা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহময় মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও বঙ্কিম সে-যুগের কালচারবাদী ইংরেজী শিক্ষিতদের মত প্রাচীন হিন্দু-আদর্শ কখনও বিসর্জন দিতে পারেন নি। তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের উপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

"তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পাপোপাখ্যান জন-সমাজে প্রচলিত আছে তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার কৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ-সংস্পর্শশূন্য আদর্শচরিত্র আর কোথাও নাই, কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, দেশীয় কাব্যেও না।" কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা

জাতির হিতের জন্যে এই মহৎ চরিত্রের আলোচনায় এবং জাতীয় জীবনের সামনে এই আদর্শ চরিত্রের স্থাপন-প্রচেষ্টায় স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যয় করেছিলেন।

যে মহান্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের মানব-চরিত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার প্রভাব তৎকালীন বাঙালী-সমাজের উপর কতটা কার্যকরী হয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব।

আজকালকার কালচারবাদী বাঙালী dilettante-সাহিত্যিক নীরস ধর্মতত্ত্ব বলে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়েন না সত্য, কিন্তু গত শতাব্দীর বাঙালী সমাজে এই একখানি গ্রন্থ যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা ভাবতেও আজ বিস্ময় লাগে। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র'কে শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্ব বলে মনে করার মত ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুতঃ বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' যুগ-যুগ-সঞ্চিত বাঙালীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অভিযান, বাঙালীর চিন্তারাজ্যে যুগান্তরকারী বিপ্লব ঘটিয়ে দেবার একটা উপায় মাত্র। আধুনিক বাঙালীর মধ্যযুগীয় মানসিকতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সবল অভিযান আরম্ভ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু রামমোহন-প্রবর্তিত মানস-বিপ্লব বাঙালী হিন্দুর চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ, রামমোহন হিন্দুর সুপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে জাতির চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর (রামমোহনের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অভিজ্ঞতার দ্বারা বঙ্কিম কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন যে, রক্ষণশীল হিন্দুর চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে হলে হিন্দু-সমাজের বাইরে গিয়ে সে অনড় সমাজকে আঘাত করলে চলবে না, সংস্কারকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে হলে কাজ করতে হবে হিন্দু সমাজের ভিতরে থেকে। সেজন্য মনীষী বঙ্কিম হিন্দুর সনাতন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে অবিকৃত রেখে তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী নবতর চিন্তার সংযোগে বাঙালীর জাতীয় জীবনসৌধ গড়ে তোলবার প্রয়াস পেলেন। বঙ্কিমের ভূয়োদর্শনজনিত এই সংস্কার-প্রয়াসের ফল ফলতে দেরী

হল না। নতুন চিন্তার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালী গড়ে তুলল একটা নতুন সাহিত্য। শিল্প ও সমাজও হল নবতর আদর্শে সঞ্জীবিত। বাঙালী-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল বঙ্কিমের সমন্বয়ধর্মী ভাবধারার স্পর্শে।

তথাপি তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের যে তীব্র-কঠোর সমালোচনা না হয়েছিল এমন নয়। বাঙালী হিন্দুর দীর্ঘকালের সংস্কারে এই যুক্তিবাদী গ্রন্থখানি এমন আঘাত দিয়েছিল যে, গোঁড়া হিন্দুরা বঙ্কিমকে 'অবিশ্বাসী', 'নাস্তিক' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেও দ্বিধা করে নি। কত সংবাদপত্রে এ-গ্রন্থখানির যে কত বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল তার সীমা-সংখ্যা নেই। কিন্তু উদার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মনের উপর এই যুক্তিবাদী গ্রন্থখানির প্রভাব বিস্তৃত হতে দেরী হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে যে একটা নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল তার পশ্চাতে আছে বাঙালীর ভাবমুক্তি, এবং বাঙালী-মানসের এই ভাবমুক্তি-ক্রিয়ায় কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব অপরিমেয়।

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম-প্রচারিত নতুন ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য হল একটা প্রবল মানবতাবোধ। ভাব এবং যুক্তিপ্রধান এই নবীন মানবধর্মের (humanism) প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হল এ-যুগের সাহিত্যে। মানুষের আনন্দবেদনার গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াস এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে এ-যুগের সাহিত্য যেন একটা অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠল : নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে হল নব-মানবতার প্রতিষ্ঠা ; বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গীতিকাব্যে শোনা গেল ব্যক্তিসচেতন মানব-চিত্তের নতুন সুর ; সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, ত্রৈলোক্যনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গদ্যলেখক বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন বিচিত্রধর্মী ও জীবনভিত্তিক গদ্য রচনায়। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, প্রভৃতি নাট্যকার বাংলা নাটকের উষর ক্ষেত্রে আনলেন সমৃদ্ধি। ভাবধর্ম ও রূপকর্মের (matter and form) দিক দিয়ে এঁদের সমৃদ্ধ মনন এবং প্রাণধর্মী রচনা বাংলা গদ্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে যে কতখানি প্রসারিত করে দিল তা সাহিত্যের ইতিহাস

পাঠকমাত্রের কাছে অবিদিত নয়। কেউ কেউ মনে করেন, নবীনচন্দ্রের নব-মহাভারত—মহাকাব্যত্রয়ীর উপর বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব অনিবার্যভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য যা নিয়ে গর্ব করতে পারে, বাংলা সাহিত্যে যা 'ক্লাসিক' বলে সম্মানিত, তার অধিকাংশই রচিত হয়েছিল বঙ্কিমের এই প্রবল ভাবান্দোলনের যুগে।

এই ভাবমুক্তির ফলে রাষ্ট্রজীবনেও তৎকালীন বাঙালী যে প্রবল প্রাণস্পন্দন অনুভব করে তার ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে তীব্র স্বাজাত্যবোধ বাঙালীকে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হতে প্রবল প্রেরণা দিয়েছিল তার প্রধান ঋত্বিকও বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র ব্যাখ্যায় বঙ্কিম একথা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, বৈষ্ণবীয় ভাবাতিশায়ী অনুভবের পথে নয়, বীর্যবান কর্ম এবং জ্ঞানের পথেই জাতির মুক্তির উপায় নিহিত। মনীষী বঙ্কিম-অনুভূত এই সবল চিন্তা ও কর্মান্দোলনের পথে জাতিকে জাগিয়ে তুললেন আনন্দমোহন বসু, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তা ও রাষ্ট্র-নেতা, আর গড়ে তুললেন দেশের মধ্যে কংগ্রেস নামে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় এক শক্তিমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সংস্থাগুলি থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা ও নীতিগত পার্থক্য হল সুচিহ্নিত; কারণ ইতিপূর্বে বাঙালী-রাষ্ট্রনেতার স্বদেশচেতনার অভিব্যক্তি ছিল আবেদন-নিবেদনের সীমায় সীমাবদ্ধ, আর জাতীয় কংগ্রেসই সর্বপ্রথমে জাতিকে নির্দেশ দিল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করবার জন্যে। এই প্রতিষ্ঠান দেশের দিক্-দিগন্তে মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে যে ক্রমশঃ স্বাধিকার-চেতনায় মাতিয়ে তুলেছিল তার স্বাক্ষর বহন করে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস।

বাঙালীর সামাজিক জীবনেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয় এই সময়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিন্তা ও কর্মবীর রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী-চিত্তে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সচল ধারা

প্রবাহিত করে দিয়ে সে-যুগের বাঙালীকে যুক্তিবাদী ও বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন করতে কঠোর প্রয়াস পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-যুগের রক্ষণশীল বাঙালী-সমাজ মনে-প্রাণে সেই যুক্তিবাদী ভাবধারা গ্রহণ করতে পারে নি,—কারণ তখন পর্যন্ত তার ভাবমুক্তি হয় নি, দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচারিত 'নতুন জ্ঞান' এবং আরও কিছুকাল পরে বঙ্কিম পরিকল্পিত 'নব-মানবধর্ম' (New-humanism) প্রসারের ফলে বাঙালীর মন যখন উদার ও সংস্কারমুক্ত হল, তখন থেকে শুরু হল বাঙালীর সমাজ-জীবনে সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করতে বাঙালীর আর কোন দ্বিধা রইল না। ফলে দেশের মধ্যে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বিজ্ঞানের চর্চায়, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বাঙালী এক নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করল। এক কথায় ভারতীয় সমাজে বাঙালী যে আজ নিজেকে অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে গর্ব করে তারও প্রস্তুতি হয় এ-সময়ে।

বস্তুতঃ, গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সমস্ত মহৎ ও চিন্তাশীল গ্রন্থ বাঙালীর ভাবমুক্তি ও নবজাগরণে সহায়তা করেছিল, মনীষী বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৩

আত্মিক শক্তি ॥ সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তার

কেশবচন্দ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত প্রসারে কেশবচন্দ্রের বিশিষ্ট জীবন-ভাবনা ও বিচিত্র কর্মোদ্যমের কথা বাঙালী আজ প্রায় ভুলতে বসেছে। ভোলবার প্রধান কারণ জীবনের প্রতি আচার্য কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আজকের বাঙালীর জীবনদৃষ্টির একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেশবচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতিভাবনা ছিল জীবনসাধনারই অঙ্গবিশেষ। আত্মানুশীলন ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যে জীবনকে একটা স্থির প্রতিষ্ঠাভূমির উপর স্থাপন করতে পারলে সংস্কৃতি-শতদল বিকশিত হয়ে উঠবে বিচিত্র বর্ণালী নিয়ে—এই ছিল কেশবচন্দ্রের ধারণা। সেজন্য সেই আত্মভ্রষ্টতার যুগে কেশবচন্দ্র বাঙালীকে আহ্বান করেছিলেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে। এ অগ্নিমন্ত্র আত্মার জাগরণের মন্ত্র। আত্মা জাগরিত হলে জীবনের উত্তাপ বাড়ে, আর এ উত্তপ্ত জীবনবোধের তাড়নায় জাগ্রত জাতি অনুসন্ধান করে নিত্য নতুন অভ্যুদয়ের পথ। কেশবচন্দ্রের এই অগ্নিমন্ত্রের সাধনা ব্যর্থ হয় নি। এই অগ্নিমন্ত্র অগ্নিগর্ভ সহস্র শিখা বিস্তার করে স্পর্শ করেছিল সে-যুগের জাগরণোন্মুখ অসংখ্য মনকে; এবং সে বহুমনের কালিমা দগ্ধ করে জাগিয়ে তুলেছিল দেশব্যাপী এক নবীন জীবন। সে-জীবন ব্যাপকতায় বিশাল, উপলব্ধিতে গভীর, কর্মৈষণায় অক্লান্ত, আর নবসৃষ্টি-প্রয়াসে অধীর।

সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের জন্যে প্রথমে চাই মনের পরিশীলন, আর মনের পরিশীলনের জন্যে প্রথমে প্রয়োজন আত্মসমীক্ষা ও আত্মানুশীলন। যেখানে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মন ও আত্মার অনুশীলন নেই, সেখানে জাতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুম রচনা ছাড়া আর কী? প্রতিভার বরপুত্র কেশবচন্দ্র এই গভীর জীবনসত্য অনুভব করেছিলেন এখন থেকে আরও প্রায় একশো বছর আগে। স্বীয় অন্তরে অনুভূত গভীর প্রত্যয়

জাগ্রত করেছিল তাঁর জীবনকে, আলোকিত করেছিল সমসাময়িক অসংখ্য মনকে, আর সক্রিয় করেছিল সে-যুগের বাঙালীকে জীবন ও কর্মের বিচিত্র পথে বিচরণ করতে। সে-প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

কেশবচন্দ্র যে বছর জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮ খৃঃ অঃ) তার পাঁচ বছর আগে ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে (১৮৩৩ খৃঃ অঃ)। এ মহান্ চিন্তানেতা ও কর্মবীরের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে নব্য বাঙ্লার সংস্কৃতি-জগতে যেন একটা উজ্জ্বল দীপ নিভে গেল। মাত্র পনের বছরকাল (১৮১৫—১৮৩০) রামমোহন বাঙলা দেশের নব্যসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাঙালী জীবনের প্রায় সর্বতোমুখী সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর মৌলিক ভাবনা ও অক্লান্ত কর্মৈষণার সাহায্যে সমকালীন বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে যে উত্তপ্ত বেগ সঞ্চার করেছিলেন তা ছিল ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে যথেষ্ট। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর প্রাগ্রসর জাতিসমূহের সমপর্যায়ে উন্নীত করবার উদগ্র কামনায় তিনি যে কর্মসূচীর নির্দেশ দেন তার ভিতর আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যে সুদূর ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি যে আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাও বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনকে আকৃষ্ট করেছিল একটা নতুন সম্ভাবনার দিকে। সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সমাজ ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব অনুভূত হতে থাকল তাঁর মৃত্যুর পরেও। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। তাঁর একান্তভাবে যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন প্রগতিশীল হিন্দুদের মনে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিলেও তাদের বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন বা বিধর্মী করে তোলে নি। এর কারণ, তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টায় বিপ্লবের বীজ যতই থাকুক না কেন, তাঁর সকল চিন্তা ও কর্ম-প্রয়াসের পশ্চাতে ছিল ভারতের

সনাতন জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা। রামমোহনের সমকালেই বাঙলা দেশে আর একটি প্রবল শক্তি দেখা দিল, যার প্রভাবে বাঙালীর মনোজীবন প্রবল-ভাবে আন্দোলিত হয়ে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। কোন কোন বাঙালী সংস্কৃতি-সমালোচক এ যুগকে অভিহিত করেছেন 'ঝড়তুফানের যুগ' বলে। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এই বিপ্লববিক্ষুব্ধ যুগের স্রষ্টা হিন্দুকলেজের যুক্তিবাদী মনীষী শিক্ষক ডিরোজিও। কলেজ-গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে ডিরোজিও-প্রবর্তিত শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত সমস্ত চিন্তাধারাকে একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে দেখা। এই নব্যতন্ত্রের শিক্ষার ফলে হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষার্থীর দল হয়ে উঠলেন প্রবল সংশয়বাদী। স্বদেশীয় সনাতন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখতে লাগলেন তাঁরা বিজাতীয় ঘৃণার চোখে ; আর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যেই তাঁরা দেখতে পেলেন জীবনের সমস্ত অভীপ্সিত আদর্শ। এঁদের মধ্যে ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামতনু লাহিড়ীর মত স্বল্পসংখ্যক স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই ছিলেন স্বদেশের সনাতন আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ। পূর্বোক্ত তরুণ ছাত্রদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে বাঙালীর সংস্কৃতি-জগতে একটা তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। বিজাতীয় পোষাক, বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ, অপরিমিত মদ্যপান প্রভৃতি হল তাঁদের বহির্জীবনের প্রধান আকর্ষণ; আর স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আলোচনাই হল তাঁদের নব্যতন্ত্রী সভ্যতার একমাত্র লক্ষণ। এমন কি ভারসাম্যহীন শিক্ষার প্রবল উন্মাদনায় এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক ধর্ম মনে করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। স্বদেশীয়-ভাবাপন্ন সে-যুগের কোন কোন চিন্তানেতা দেখতে পেলেন সমকালীন বাঙালী-সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবপ্রেরণায় একটা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

এই যুগ-সঙ্কটের দিনে রামমোহনের মানস-শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এই বিজাতীয় ভাবান্দোলনের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত চরিত্রে বিশুদ্ধিসাধন, নব্যতন্ত্রী ইংরেজী শিক্ষিতদের বহির্মুখী মনকে স্বদেশীয় ঐতিহ্যাভিমুখী করে তোলাই হল এ-সময় দেবেন্দ্রনাথের একান্ত সাধনার বিষয়। এ-উদ্দেশ্যে রামমোহনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে তিনি নতুন শক্তির সঞ্চার করলেন রামমোহনের সহকর্মী রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তায়,

আর সমকালীন অপরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্ সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের সহযোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এ-গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

দেবেন্দ্রনাথ যে শুধু প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তা নয়, একটা সুগভীর ভাগবত চেতনা ছিল তাঁর মহান্ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব-উপলব্ধ সত্যধর্মের প্রেরণায় তিনি যে শুধু স্বীয় কুলধর্মকে বিসর্জন দিলেন তা নয়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে বেদান্ত-প্রতিপাদিত সেই সত্যধর্মকে প্রচার করবার ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি সেই যুগসঙ্কটের কালে। কিন্তু রামমোহন-পরিকল্পিত এই নবধর্ম-প্রচারে দেবেন্দ্রনাথ একটা প্রবল বাধা পেলেন সহকর্মী অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে। ভগবানের মঙ্গল-বিধানের প্রতি গভীর 'মিষ্টিক' চেতনার ফলে একটা সংশয়শূন্য বিশ্বাসই ছিল দেবেন্দ্রনাথের সকল ধর্মসাধনার মূল প্রেরণা, আর অবিচল বিশ্বাসে জগৎস্রষ্টার নিকট প্রার্থনা মানুষের আত্মিক সমুন্নতির প্রধান উপায়—এই ছিল ভগবৎ-নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির প্রধান কথা। প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন অক্ষয়কুমার কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এ 'মিষ্টিক' বিশ্বাস ও ভক্তিতত্ত্বকে তাঁর যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিনির্ভর চেতনার আলোকে একটি সত্যসন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী যে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, বাঙালী-সংস্কৃতি যে একটা অভিনব অভ্যুদয়ের পথ খুঁজছে,—দেবেন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারলেও সেই সংশয়বাদের যুগে অন্তর দিয়ে তা অনুমোদন করতে পারেন নি। দেবেন্দ্রনাথের অখণ্ড ধর্মবিশ্বাসের উপর অক্ষয়কুমারের যুক্তিদণ্ডের আঘাতের প্রবল প্রতিক্রিয়া হল এই: নির্জনে স্রষ্টার মৌন মহিমা উপলব্ধি করে নিজের বিক্ষুব্ধ অন্তরে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে।

দেবেন্দ্রনাথের ভাবান্দোলিত জীবনের এ হল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। এ বছরটি নানা কারণে বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ-বছরেই ভারতের সিপাহীরা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে

—এই অভিযোগে; এ বছরেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা দেশ ও বাঙলা দেশের বাইরের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হল; আর একটি আপাতক্ষুদ্র ঘটনা ঘটল বাঙলা দেশেই কলকাতার বুকে। এই স্মরণীয় বৎসরেই কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের একজন সত্যসন্ধ ভগবৎপ্রেমিক যুবক আপন কুলধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। বাঙালীর আত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব হল কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে যুগের বাঙালীর ধর্মসংস্কারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তেজস্বী কেশবচন্দ্রের যোগকে বলা চলে মণিকাঞ্চন-সংযোগ। এখন থেকে বাঙালী-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা গৌরবপূর্ণ উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হল এই উভয় ধর্মনেতার অতলান্ত ভগবদ্ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস ও লোকহিত-ব্রতের মহান্ আদর্শে।

আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই হল কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা।

কোন প্রগতিশীল দেশের উন্নত সংস্কৃতি অবিমিশ্র উপাদানে গঠিত হয়নি। কর্মের সঙ্গে ধর্ম, দেহের সঙ্গে আত্মা, ঐহিকতার সঙ্গে ভগবন্মুখিতা, বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবনার সমন্বয়েই জীবন্ত সংস্কৃতি একটা সর্বাশ্রয়ী রূপ লাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য প্রগতিশীল দেশগুলিতে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ দেখে আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হই। ভাবি, বস্তুনির্ভরতাই বুঝি সে সমস্ত দেশের প্রাণবান্ সংস্কৃতির মর্মমূলে। যে বিরাট আত্মিক শক্তি এ-সমস্ত দেশের সাধারণ-অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় থেকে সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে, সে সম্পর্কে অনেক সময় আমরা অবহিত হই না। বীর্যের সঙ্গে বিপুল ত্যাগ, অনির্বাণ কর্মৈষণার সঙ্গে নীরব আত্মিক সাধনাই হল পাশ্চাত্ত্য প্রগতিশীল জাতিসমূহের সর্বাঙ্গীণ জীবন-বিকাশের প্রধান প্রেরণা। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ধারণে এই সত্য আজ তর্কাতীত।

শুধু প্রগতিশীল আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি কেন, যে প্রাচীন ভারত-

সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের জন্যে আজ আমরা গর্বিত, সেই সংস্কৃতির উপাদানও বিমিশ্র। সেই উদার সংস্কৃতির একদিকে যেমন বীর্যের সাধনা, ঐহিক ভোগ-সম্ভোগের জন্যে তীব্র উত্তেজনা, তেমনি আর একদিকে ছিল ইহজীবনোত্তর চিরন্তন জীবনের আদর্শ লাভের জন্য অনন্ত আকূতি। এই মিশ্র জীবনবোধের পরিচয় অনুস্যূত হয়ে আছে ভারতীয় পুরাণে, বেদ-বেদান্তে, চার্বাক দর্শনে, ক্লাসিকেল সাহিত্যে, বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে আর শঙ্করভাষ্যে। এক যুগে যখন জাতীয় জীবনে ভোগের মাত্রা বেড়েছে, পরবর্তী যুগে তার বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভিত্তিতে মানব জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা যখন শুষ্ক জ্ঞান-সাধনার রূপ নিয়েছে, পরবর্তী যুগে সেই শুষ্কতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে হৃদয়ভিত্তিক প্রেমসাধনার। একযুগে অন্ধ বিশ্বাস ভারতীয় হিন্দুকে অনুপ্রাণিত করেছে অগণিত দেবদেবীর পূজায় আর যজ্ঞে বলির নামে নির্মম জীবহত্যায়; আর একযুগে সেই বিশ্বাসের উপর জয়লাভ করেছে যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী উদার জীবনদর্শন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রেম, ভোগলোলুপতা ও বৈরাগ্য —এ সমস্ত বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘর্ষে জেগে উঠেছিল বিচিত্রধর্মী প্রাচীন প্রাণবন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সে-যুগের সংস্কৃতিপ্রসার ও সংস্কৃতি-বিবর্তনের মূলে রয়েছে সমকালীন ভারতীয় জীবনে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ফলে যুগে যুগে মানুষের মুক্ত মনে উদিত হয়েছিল স্বতন্ত্র মতবাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও লাভ করেছে নিত্য নতুন রূপ। মধ্যযুগে ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাল, আর পরমত-অসহিষ্ণু বিদেশী শাসকের চাপে পড়ে তাদের মনের স্বাধীনতাও হল অন্তর্হিত। এই মানসিক পরাধীনতার অনিবার্য প্রভাব দেখা দিল সমাজ-জীবনে। সমাজ হয়ে উঠল রক্ষণশীল, ব্যক্তিমন হয়ে উঠল সঙ্কীর্ণ। ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ-মন গড়ে উঠল তদনুরূপ সংস্কারের আশ্রয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি হল ব্যাহত।

বহুকালের তিমিরাচ্ছন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগন্তরেখা আবার নতুন আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল ভারতে ইংরেজ অধিকারের ফলে। এবারেও

বিজয়ী রাজা বিদেশী, কিন্তু মধ্যযুগের রাজার মতো পরমত-অসহিষ্ণু নয়। সাত-সাগরের পার হতে এই বিদেশী শাসকের জাতি বিজিত ভারতীয় জীবনের সামনে তুলে ধরল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উচ্চ আদর্শ, আর যুক্তিবাদের তীব্র আলোক। সেই আলোকে প্রথম আলোকিত হল 'ভারতপথিক' রামমোহনের মন। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিবিচারে বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন এ মহান্ চিন্তানেতা, আর বহু যুগের মুমূর্ষু স্বদেশীয় চিত্তে এক প্রবল ভাবান্দোলন সৃষ্টি করলেন তাঁর নব-উপলব্ধ জীবনবোধের সাহায্যে। স্বাগত জানালেন তিনি বিদেশীয় পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সচল ও সবল রূপকে।

কিন্তু রামমোহনের সংস্কৃতি-সাধনা প্রধানতঃ বুদ্ধির সাধনা। পরিশীলিত মনের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে। সংস্কৃতি-সাধনার ক্ষেত্রে একই পথের পথিক ছিলেন সমকালীন প্রতিভাবান শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর আদর্শানুরাগী শিষ্যসম্প্রদায়। শুধু বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সত্যোপলব্ধির মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা বা উন্মাদনা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সেই উন্মাদনায় সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় যে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সে মুক্ত মননের আন্দোলন সমস্ত জাতির চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি সেদিন। শুধু সেদিন নয়, কোনদিনও পারে নি। বাঙালীর হৃদয় যুগে যুগে জেগেছে হৃদয়ের স্পর্শে, আনন্দের আবেদনে। ষোড়শ শতাব্দীতে—সেই তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক ভাবনার যুগে শ্রীচৈতন্যের হৃদয়োত্থিত প্রেমভক্তির আন্দোলন শুধু বাঙ্লার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি—সে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল ভারতবর্ষের বহু স্থানে, এবং সৃষ্টি করেছিল হৃদয়ভিত্তিক একটি অভিনব ধর্ম। সেই সঙ্কীর্ণ মানসিকতার যুগেও চৈতন্যপ্রবর্তিত এই অভিনব মানব-ধর্ম যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল সংস্কৃতিসৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল, সে-ধর্মের প্রভাব আজও পৃথিবীর চিন্তাশীল ও শান্তিবাদী সম্প্রদায়ের উপর সমভাবে বিদ্যমান।

সেই হৃদয়ের পথেই আহ্বান করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে একটা নতুন জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে। প্রেম, ভক্তি ও মানব-মাহাত্ম্যের উপর গভীরতর প্রত্যয়ই হল সেই হৃদয়ের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সেই হৃদয় কি জ্ঞানবর্জিত? মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই বলেছেন: 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ

জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই' তাঁর নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তিভূমি। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কেশবচন্দ্রের জীবনের পথও সেই একই হৃদয়চর্চার পথ। স্রষ্টার প্রতি অসংশয় ভক্তি ও বিশ্বাস, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর সহজ প্রত্যয়, আর তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থিত সানুরাগ প্রেমের পথে তিনি জাতিকে আহ্বান করেছিলেন একটা নবতর জীবনধর্মের অনুশীলনের জন্য। কেশবচন্দ্রের আপাতবিক্ষুব্ধ অন্তঃস্তব্ধ জীবনের ইতিহাস এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনেরই ইতিহাস। অতঃপর কেশবচন্দ্রের জীবন, কর্ম ও বাণীর মধ্য দিয়ে তাঁর বিশিষ্ট জীবনোপলব্ধি ও সংস্কৃতি-সাধনা কী সবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পৃথিবীর ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনীষী কারলাইল একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন: 'The history of the world is the biography of the great men.' উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সংস্কৃতি আলোচনায় এ-মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। এ-শতাব্দীতে যখনই কোন সংস্কৃতি-সংকট উপস্থিত হয়েছে, তখনই দেখি সে-সময় এমন সমস্ত মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের মুক্ত জ্ঞান ও প্রেমের আলোকে জাতি দেখতে পেয়েছে সেই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সংকেত। গত শতকের ভাববিক্ষুব্ধ বাঙালীর ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের জীবনচেতনা গভীরতর মুক্তির ইঙ্গিতে অর্থপূর্ণ। কী সে যুগ-সংকট যার থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার-কামনাই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবন-ব্যাপী অতন্দ্র সাধনা?

সে-সংকট দেখা দিয়েছিল সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর একপেশে জীবন-সাধনায়। বস্তুধর্মী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নবালোকে জাতি তখন একটি নবীন জীবনস্বপ্নে বিভোর। ইংরেজ বণিকরাজের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিজীবী বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থাগমের উপায়-সন্ধান পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বাষ্প, বিদ্যুৎ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত বস্তুর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একটা সম্ভাবনাময় নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সেই জগৎ ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস ও বাহ্য আড়ম্বরের জগৎ। সেই ভোগৈশ্বর্যময় স্থূল বস্তুজগতে সার্থকতা লাভ করাই ছিল সে-দেশের লোকজীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সেই আসক্তি ক্রমশঃ আকৃষ্ট করল পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অভিষিক্ত বাঙালী-

মনকে। চিত্ত-প্রকর্ষহীন এই আর্থিক ভোগলোলুপতা সে-যুগের হঠাৎ-বড়লোকদের জীবনকে কিভাবে ক্লেদাক্ত করে তুলেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন গত শতাব্দীর ও এ-শতাব্দীর বহু সংস্কৃতি-সমালোচক।

শুধুমাত্র অর্ধশিক্ষিত লোকের প্রচুর অর্থাগমচিন্তা বা ভোগলোলুপতায় নয়, সে-যুগের শিক্ষিত মনের চিন্তা ও ধ্যানধারণা ছিল প্রায় একই বস্তুধর্মী। যে যুক্তিবাদী, হিতবাদী বা মানবতাবাদী পাশ্চাত্ত্য দর্শন সে-যুগের শিক্ষিত মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই দার্শনিক আদর্শও মূলতঃ ইহজীবনসর্বস্ব। কেশবচন্দ্র নিজে সে-যুগাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে :—

'The politics of the age is Benthamism, its ethics utilitarianism, its religion rationalism, its philosophy positivism.' [১]

কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মার জাগরণ। সেজন্য শুধুমাত্র ঐহিক ভাবনাপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন তাঁর কাছে মনে হল—'dull, mechanical, unspiritual and lifeless.'—(যান্ত্রিক, জড় ও নির্জীব)।

ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে সে-যুগের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে গতানুগতিক বিচারহীন সংস্কারের আনুগত্য, আর নবীনপন্থীদের মধ্যে চিন্তাস্বাধীনতার নামে সংশয়-বাদ। এই উভয়শ্রেণীর বাঙালীর অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের গভীরতার অভাব ছিল সে-কালের যুগ-সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ।

সেই যুগ-সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ভাবপ্রবণ কেশবচন্দ্র সবল কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন সমকালীন মানসিক জড়তাগ্রস্ত জাতিকে :

"The people of India must be roused from their lethargy and apathy and saved from the dangers of smooth but treacherous materialism. The life of spiritual stagnation that we see around us is woeful ; this spreading infection of sceptical fancies is apalling. The enslaved spirit of nation

১ K. C. Sen, Lectures in India, Great men (Sept, 1866), p 31.

must rise and bestir itself freely to the holy activities of the higher life." [১]

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনে পরবর্তীকালে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবেগকম্পিত কণ্ঠে আমরা যে বাণী শুনেছি, তারই পূর্বধ্বনি শুনতে পাই আচার্য কেশবচন্দ্রের কণ্ঠে। সে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কেবশচন্দ্র তখন আটাশ বৎসরের যুবক মাত্র।

আর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে (৪৪ বৎসর বয়সে) মৃত্যুর মাত্র দুবছর আগে ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হতে কেশবচন্দ্র উচ্চারণ করে গেছেন তাঁর পরিণত জীবনো-পলব্ধির কথা সংযত-গম্ভীর ভাষায়—যে সত্য-বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বকালের যুগ-সংকট থেকে জাতির মুক্তির ইঙ্গিত :

'সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ।...আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা...প্রথমেই বেদ-বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।

আমি বিশ্বাসী। বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না।' [২]

প্রার্থনা আর বিচারনির্ভর প্রত্যয়ের পথেই চালনা করতে চেয়েছিলেন তিনি জাতিকে জীবনের শ্রেয়োলাভের জন্য। প্রেয়লাভের পথকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। কিন্তু শ্রেয়োবোধহীন প্রেয়বস্তুলাভের পথ ছিল তাঁর নিকট অবাঞ্ছিত। সেই প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

জাতীয় জীবনের স্খলন দূর করে জাতিকে মহত্তর জীবন-স্বপ্নে উন্মুখ করে তোলবার জন্যে বহু সংস্কারমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে-যুগের কোন কোন সংস্কারক। সে-যুগের ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র কিন্তু শুধু সংস্কারক-মাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘোরতর বিপ্লবী। অন্যায় অধর্ম বা পাপ বলে যা তাঁর মনে হত, তার সঙ্গে আপোস করতে তিনি জানতেন না। সে জন্যে জাতীয়

[১] K. C. Sen, Lectures in India, Great men (1866), p. 39.

[২] কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ (১৮৮২) পৃঃ ১—৩

মনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন তিনি—জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্যে। জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়ে জাতীয়-মানসের জাগরণের জন্যে যেমন জোর দিয়েছিলেন তিনি প্রার্থনা ও প্রত্যয়ের উপর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তেমনি তিনি সচেতন করতে চেয়েছিলেন জাতিকে পাপবোধ সম্পর্কে। এই পাপবোধের উৎসস্থল ব্যক্তিচিন্তা ও হৃদয়োত্থিত বিবেক। এই বিবেকের পথেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন তিনি আত্মভ্রষ্ট স্বদেশবাসীকে :

"জীবনগ্রন্থের দ্বিতীয় কথা কি ? এ বিষয়েও আমার সঙ্গে অপরের অনৈক্য দেখিবে। পাপবোধ আমার অনেক প্রবল, অনেক জীবনে এত প্রবল নয়।··· পাপদর্শনে পাপবোধ হইল ; পলকের মধ্যে সহজে পাপবোধ করিলাম।··· আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি।" [১]

পাপ শুধু মানুষের বাইরের দুষ্কৃতির মধ্যে নয়, মনের মধ্যেও যদি মিথ্যাচার থাকে কেবশচন্দ্র তাকেও বলেছেন পাপ। এই পাপবোধের চেতনা কেশবচন্দ্রের চিত্তে সৃষ্টি করেছিল এক উচ্চ নীতিধর্মের (ethics) প্রেরণা, আর এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক আদর্শ বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি।

এই উচ্চ নীতিবোধের চেতনা ক্রমশঃ সঞ্চারিত হল 'কেশবচক্রে'র' মধ্যে, আর তাঁরা জাগিয়ে তুললেন দেশের মধ্যে একটা নতুন ভাবান্দোলন—নীতি-ধর্মের অনুশীলন ছিল যে ভাবান্দোলনের ভিত্তিমূলে। কেশবচন্দ্রের এই নীতিধর্মের আন্দোলন শুধু বাক্যসীমায় আবদ্ধ হয়ে রইল না, মহৎ নীতিভিত্তিক একটা আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সে-যুগের তরুণ ছাত্রদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'আশালতা দল' (Band of hope)

১ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃঃ ৮

২ কেশবচক্র—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতির মত চিন্তানেতা ও কর্মীদের সম্মেলন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে—সুরাপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা ছিল যে নব-প্রতিষ্ঠিত সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সেই বিদেশী চিন্তা ও ভাবানুকরণের যুগে কেশবচন্দ্রের এই নীতিধর্মীয় আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়েছিল? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে-যুগের বাঙালীর ক্রম-অভ্যুদয়ের কারণ হল পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ ও সেই জীবন-সংস্কারের প্রভাব। কিন্তু একটু সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে, কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত এ উচ্চনীতিধর্মের প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সে-যুগের শিক্ষিত-মানসে প্রবাহিত হয়ে দেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে আর একটা প্রবল ভাবান্দোলন, সর্বযুগের উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা-কামনা যে আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। সমকালীন রসবাদী সাহিত্যিক বঙ্কিমের মানস-প্রবৃত্তির বিবর্তন-রেখা অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে এই রোমান্টিক কথাশিল্পী জীবনের শেষ স্তরে একান্তভাবে আপনাকে নিযুক্ত করেছিলেন নীতিধর্ম ও অনুশীলন-তত্ত্বের আলোচনায়। শুধু জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায়ও বঙ্কিম সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে নীতিধর্মের প্রেরণাকেও সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্র-প্রভাবে তিনি এতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁর সুবিখ্যাত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি আচার্য কেশবচন্দ্রকে 'সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত' ও 'সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র' বলে বর্ণনা করতেও দ্বিধা করেননি। শুধু সমসাময়িক কালে নয়, কেশবচন্দ্রের এই উচ্চ নীতিধর্মের আন্দোলন পরবর্তী কালে জাগিয়ে তুলেছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের মত সাধু মহাত্মার উদার প্রাণকে। নীতিধর্মী জ্ঞান কর্ম এবং ভক্তিপ্রবণ প্রেমের ভিত্তিতে এই মনীষী তাঁর সমকালে পূর্ববঙ্গে যে প্রবল ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করেন জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী—আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই সবল ভাবান্দোলনের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রবল লোকহিতব্রতের উচ্চ আদর্শ যুক্ত হয়ে কেশবচন্দ্রের মহিমান্বিত জীবন হয়ে উঠেছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। কেশব-

চরিত্রের এই উভয় বৈশিষ্ট্য-বিকাশের কারণ অনুসন্ধানে স্বতই মনে আসে প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং সেই মহাত্মার মহান্ জীবনের প্রভাবের কথা। কিন্তু কেশব-জীবনের কর্মধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে—এই দুটি উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল কেশবচন্দ্রের সহজাত। দেবেন্দ্রনাথের প্রখর ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়ত বা তারা বিকাশের সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগেই কেশবচন্দ্র অনুভব করেছিলেন একটা সংযমপূত নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা। এ-ছাড়া 'কলুটোলা ইভনিং স্কুলে' দরিদ্র ও শ্রমিক-শ্রেণীর বালকদের শিক্ষাদান কার্যে এবং সেন-পরিবারের 'গুড্ উইল ফ্র্যাটারনিটি সভা'র কার্যকলাপের মধ্যেই তাঁর লোকহিতব্রত ও আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবেরই আগ্রহাতিশয্যে উক্ত সভায় মহর্ষির আগমনের পর থেকে তাঁর ধর্মজীবনে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আর এই পরিবর্তিত হৃদয়ভাব একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কেশবচন্দ্রের চলমান জাগ্রত জীবনকে প্রসারিত করেছে নিত্যনতুন জীবন-ভাবনা ও দেশোন্নয়নমূলক বিচিত্র কর্মের পথে।

কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা হয়েছে—অগ্নিমন্ত্রের উপাসনাই ছিল সেই মহাজীবনের প্রধানতম সাধনা। এই অগ্নিমন্ত্রকে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় অভিহিত করেছেন 'Enthuciasm' বলে। এই Enthuciasm-এর প্রভাবেই কেশবচন্দ্র সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের। কি মহামারীর সময় সেবাকার্যে (১৮৬১-৬২), কি শিক্ষা সংস্কারে, কি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে, কি জাতীয় জাগরণের জন্যে পত্রিকা-সম্পাদনায়, কি নব-উপলব্ধ ধর্ম-প্রচারে—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই Enthuciasm-এর তাড়নায় কেশবচন্দ্র মেতে উঠেছিলেন একটা সেবাময় ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ-গঠনের স্বপ্নে। এই স্বপ্নই পরবর্তীকালে সার্থকতর রূপলাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় এবং বাঙালী-সংস্কৃতিকে প্রসারিত করেছে মানব-মহিমাবোধের উদারতর প্রাঙ্গণে।

· ধর্মই হোক, কর্মই হোক—কোন কিছুকেই কেশবচন্দ্র অন্ধ অনুরাগের সহিত কোনদিন গ্রহণ করেননি। তাঁর সক্রিয় জীবনের সচলতার প্রেরণা ছিল একটা সুগভীর প্রত্যয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়ের ফলে কেশবচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে-র সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে সবলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের নব-উপলব্ধ ধর্মমত, আর নিজের যুক্তি ও বিবেকের উপর সুদৃঢ় প্রত্যয়ের প্রভাবে তিনি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠন করেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)। স্ব-ধর্ম ও স্ব-মতের প্রতি এই গভীর নিষ্ঠা সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালী-মানসে সৃষ্টি করেছিল সুগভীর আত্মপ্রত্যয়—আর আত্মপ্রত্যয়ই (self-reliance) হল সব রকমের নতুন সৃষ্টির মূল প্রেরণা। বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত-বিস্তারের ক্রম অনুসরণে এই সত্যটি আমাদের অনুধাবন-যোগ্য।

উদার মানসিকতা উচ্চতর সংস্কৃতির একটা অন্যতম প্রধান লক্ষণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে না হোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে আজও ভারতের বিভিন্ন জাতির কাছে শ্রদ্ধেয়, তার কারণ বাঙালী একদিন নিজ জন্মভূমির ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। বৃহত্তর ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাঙালী মনীষী রামমোহন। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'ভারতপথিক' বলে। রামমোহনের পরে ভারতচেতনার পরিচয় দিয়ে বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে যাঁরা সহায়তা করেছেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ও উত্তরভারত পরিক্রমা কেশবচন্দ্রের ভারতচেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই। কেশবচন্দ্রের এই ভারত-পরিক্রমার উদ্দেশ্যও ছিল সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ এবং ধর্মভিত্তিক একটা বৃহৎ ভারতীয় জাতি গঠনের অভিপ্রায়। কেশবচন্দ্রের সমষ্টিগত চেতনা সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন:

"আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষে

বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকে সমষ্টিগত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভারত পরিক্রমায়ও তাঁহারা লিপ্ত হন। বর্তমান কালে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইহার পথ দেখান।"[১]

উত্তরভারত পরিক্রমায় যাবার আগেই ধর্মকেন্দ্রিক একটা অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন কামনায় কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' বা 'The Brahmo Samaj of India.' ধর্মের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমস্ত ভারতীয় জাতির ঐক্য বিধানই ছিল এই 'সমাজে'র উদ্দেশ্য। এই ঐক্যবোধের আদর্শ শুধু যে সমসাময়িক ধর্মবৃত্তের মধ্যে সীমায়িত ছিল তা নয়, সে-যুগের কোন কোন কবির হৃদয়কেও এই উদার আদর্শ জাগ্রত করেছিল। আচার্য মোহিতলাল মনে করেন—সমসাময়িক মহাকবি নবীনচন্দ্র 'এক ধর্ম এক জাতি এক ভগবান'-ভিত্তিক যে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার প্রেক্ষাপটে ছিল কেশবচন্দ্রের ঐক্যবোধের আদর্শ প্রেরণা।[২] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' পরিকল্পনাতেও দেখি এই উদার ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা।

কেশবচন্দ্রের মনে ভারতচেতনা আরও তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান—বিশেষ করে পাঞ্জাব-পরিক্রমার ফলে। সে বছর বেথুন সোসাইটিতে তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি নিজ দেশবাসীকে শিখ-সমাজের গণতান্ত্রিক জীবনপ্রণালী গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান জানান। বেথুন সোসাইটির এই স্মরণীয় বক্তৃতায় তিনি ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমবায়ে একটি সংঘ গঠনের উপরও জোর দেন। সমগ্র ভারতের নবজাগরণের উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতীয় জাতিদের নিয়ে এ মিলনক্ষেত্র রচনার পরিকল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও কুড়ি বছর আগেকার কথা। কেশবচন্দ্রের এই ভারতচেতনা জাতীয়তার ক্ষেত্রে বাঙালীর দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত করতে সহায়তা করল সর্বভারতীয় জীবনের বিস্তৃত পরিবেশে। ক্রমে ক্রমে বাঙালী-সংস্কৃতি নবতর রূপ পরিগ্রহ করল এই উদার ভারতচেতনার স্পর্শে।

১ কেশবচন্দ্র সেন—সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৪৬

২ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলার নবযুগ, পৃঃ ২৯৭

সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির একটা প্রধান লক্ষণ। এই সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম ছিল সারাজীবন অক্লান্ত। এই মনোভাবের ফলে 'মন্থরগতি' ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ছেদ করে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ', আর প্রধান আচার্যের পদ উন্মুক্ত করে দিলেন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতীয় লোকেদের জন্যে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে নতুন ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সে-মন্দিরের দ্বারও উন্মুক্ত হল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট। হিন্দুর বহুযুগ-প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সকল জাতির মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কেশবচন্দ্র বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ-বিষয়ক '৩ আইন'কে ব্রিটিশ রাজদরবারে বিধিবদ্ধ করিয়ে। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এই আমূল সংস্কার-কামনা দেখে সেদিন যে শুধু প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তা নয়, নরমপন্থী ব্রাহ্মরা পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে তীব্র সমালোচনা না করে ছাড়েন নি। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে তাঁর এই বৈপ্লবিক কর্মধারার প্রতিবাদ করেন ব্রাহ্মধর্মের প্রবীণ নেতা রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'-বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত করে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে)। এই প্রবন্ধে সর্ববরেণ্য ব্রাহ্মনেতা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলনের দ্বারা একটা সাম্যময় সমাজ-গঠনের স্বপ্নে রইলেন একনিষ্ঠ।

একটা জাগরণোন্মুখ জাতির সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্যে একমাত্র পুরুষের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য চাই নারীরও সক্রিয় সহযোগিতা। নারীশক্তির জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মিকা সমাজ।' সেই বছরই ভারতহিতৈষী মিস্ মেরী কার্পেন্টারের কলকাতা আসার পর কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সকল রকম নারী-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের ইতিহাসে ধর্মবীর কেশবচন্দ্রের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মহামতি বেথুনের পাশে। এই নারীশিক্ষাই সৃষ্টি করেছে বাঙালী নারীর মনে একটা

প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ; আর এই নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালী সমাজ নতুন রূপ লাভ করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও। বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ-প্রসঙ্গে এ সত্যটি ভোলবার নয়।

'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর য়ুরোপ-যাত্রাকে তুলনা করেছিলেন তীর্থ-যাত্রার সঙ্গে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের য়ুরোপ-যাত্রাকেও বলা চলে সে-যুগের একজন বাঙালী সত্যসন্ধ যাত্রীর সংস্কৃতি-সঙ্গমে তীর্থ-যাত্রা। এই বিদেশযাত্রার ফলে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি হল আরও বহুদূর প্রসারিত, চিত্তে এল নতুন বল, জাতীয় সর্বাঙ্গীণ সংস্কারমূলক কাজে জাগ্রত হল নিত্যনতুন অভীপ্সা—এক কথায় কেশবচন্দ্রের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-সংস্কৃতিও অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে গেল।

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশে ইংরেজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ, এবং ইংরেজ জাতির প্রগতিশীলতার কারণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই অভিজ্ঞতা নিজের দেশোন্নয়ন কার্যে ব্যবহার। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড গমন সম্পর্কে একটা কথা স্মরণযোগ্য। সেই যুগের দেশহিতব্রতী বাঙালী মনীষীরা তখনও এ-দেশ শাসনে ইংরেজের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেননি। পূর্বযুগের মুসলমান-শাসনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরে তাঁরা ভারতে ইংরেজের আগমনকে গ্রহণ করেছিলেন বিধাতার আশীর্বাদ-রূপে ; আর পরমতসহিষ্ণু, জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রচণ্ড শক্তিমান্ সু-সংস্কৃত ইংরেজ জাতির সংস্পর্শ ভারতের জাতীয় জাগরণে কল্যাণপ্রসূ হবে—এই ছিল সে-যুগের বাঙালী মনীষীমাত্রেরই সুচিন্তিত ধারণা। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, সে-যুগের 'জাতীয় জাগরণ-মন্ত্রের ঋষি' বঙ্কিমও ভারতে ইংরেজ আগমনকে মনে করতেন দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা বলে, আর ভারতের নিজস্ব স্বার্থে ইংরেজ অধিকার এ দেশে আরও কিছুকাল স্থায়ী হোক—এই ছিল তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায়।

অতএব বিলাতে কেশবচন্দ্রের তেজোগর্ভ বক্তৃতা সেই দেশবাসীর নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল সহৃদয় ইংরেজের নিকট ভারতের উন্নতি-কামনায় আবেদন-

নিবেদনের সীমায় সীমাবদ্ধ। ইংরেজ যখন বিধাতার রহস্যময় করুণায় ভারত শাসনের জন্যে প্রেরিত হয়েছে, তখন শাসকজাতির কর্তব্য ভারতবাসীকে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; তারপর শিক্ষিত ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকার্যে প্রতিষ্ঠিত করা। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে প্রদত্ত 'England's duty towards India' নামক বিখ্যাত বক্তৃতার (১৮৭০) প্রধান বক্তব্য ছিল এই। 'Female Education in India' নামক বক্তৃতায় তিনি আবেদন জানান সে-দেশীয় সমাজসেবী মহিলাদের নিকট ভারতীয় নারীর অজ্ঞানতা দূর করে তাদের সুপ্ত ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করবার জন্যে।

কোন কোন বক্তৃতায় তিনি তদানীন্তন সরকারের সমালোচনা যে করেননি, এমন কথা বলা যায় না। 'Liquor traffic in India' নামক বক্তৃতা সরকারের রাজস্ব-নীতির তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ভরা। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে এ বক্তৃতায় তিনি বলেন:

"And here I would ask, is not this liquor traffic carried on in India simply, solely, and exclusively for the sake of revenue? (Hear). Is there any other motive that actuates the British Government? (Cries of 'No'). It is simply a question of money......If revenues increase in this way from the sufferings, wickedness, and demoralisation of the people, better that we should have no revenue at all." (*Cheers*)

সুরাপান-রূপ জাতীয় দুর্নীতির মূল কারণ অপসারণের জন্যে কেশবচন্দ্রের এ আবেগধর্মী বক্তৃতা সমকালীন এক শ্রেণীর ইংরেজের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করলেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিলাতী সভ্যতাসৃষ্ট এই পাপ দূর করবার জন্যে ইংরেজ সরকার যে সচেষ্ট হননি, তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। তবে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের আবেগময় বর্ণনা শুনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজদের মন যে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, এবং মিস্ মেরী কার্পেন্টার, মিস্ এনেট একৃরয়েড্ (পরে মিসেস বিভারিজ)-এর মত মহীয়সী কোন কোন সমাজসেবী ইংরেজ মহিলা শিক্ষায় অনগ্রসর ভারতীয় নারীজাতির

সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ-দেশের নারীশিক্ষাবিস্তারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন ঘটাবার জন্যে ভারতের পক্ষ থেকে একটা বড় রকমের দৌত্যকার্য করেছিলেন রামমোহনের পরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন।

জাতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রচারে স্বেচ্ছাবৃত দূতের কর্তব্য গ্রহণ করে কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্যকে সমকালীন বাঙালী-জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুললেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ তীর্থ-যাত্রায় কেশবচন্দ্রের সব চাইতে বড় সঞ্চয় হল—ইংরেজ জাতির জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ। পারিবারিক জীবনে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি ইংরেজ সমাজ-জীবনকে একটা বলিষ্ঠ রূপ দান করেছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে প্রায় সাত মাস পরে তিনি স্বদেশে ফিরলেন নিজের দেশকে নতুন করে গড়বার স্বপ্ন নিয়ে।

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একটা বিরাট গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা নিয়ে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করলেন 'The Indian Reform Association' বা 'ভারত সংস্কার সভা'। এ সংস্থার পঞ্চমুখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে (স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা, সুলভ সাহিত্য প্রচার, সুরাপান ও মাদক নিবারণ, আর দাতব্য) তিনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন একটা বলিষ্ঠ জীবনবোধে। বাঙ্‌লাদেশ তাঁর কর্মের কেন্দ্রস্থল হলেও সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতি কামনায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, আর এ প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বভারতীয়ের জন্যে। যে কেশবচন্দ্রকে আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি আত্মিক সাধনার ভিত্তিতে দেশের অভ্যুদয়-কামনায় তন্ময়, সেই কেশবচন্দ্রকে আমরা এখন দেখি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্যে তৎপর। দেহ ছাড়া আত্মার সাধনা অসম্ভব—এ বোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করলেন একটা সর্বাত্মক উন্নয়ন-পরিকল্পনা। জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় কেশবচন্দ্রের তিনটি কার্যক্রম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে : শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সুলভ

সাহিত্য প্রচার, আর দাতব্য। এ তিনটি কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়েছিল দেশের অগণিত সহায়হীন শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ নৈতিক জীবনের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার জন্যে। কেশবচন্দ্রকে এতদিন যাঁরা বাঙলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের নায়ক বলে ভেবেছিলেন, তাঁরা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জন্যে তাঁর কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, জনসাধারণের জ্ঞানোন্নয়নের জন্যে এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' নামক পত্রিকা প্রকাশ, দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ বধির বিধবা ও দুস্থদের জন্যে অর্থ সাহায্য, ঔষধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি সেবাকার্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হলেন। এই সেবাধর্মের প্রেরণা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভগে এনে দিয়েছিল বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে এক বিরাট জাগরণ এবং সৃষ্টি করেছিল লোকহিতব্রতের ভিত্তিতে এক উদার সংস্কৃতির।

ভারত-সংস্কার-সভার সংস্কারের লক্ষ্য ছিল. 'to promote the social and moral reformation of India.' সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত বাস্তব। স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কোন বাঙালী মনীষী ইতিপূর্বেও আন্দোলন করেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টিরও প্রয়াস ইতিপূর্বে না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু এ সমস্ত সংস্কারকার্যে কেশবচন্দ্রের পরিকল্পনার মৌলিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যাপক ও কার্যকরী ভিত্তিতে স্থাপন করবার অভিপ্রায়ে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়', এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদের নিয়ে স্থাপন করলেন তিনি 'বামাবোধিনী সভা' ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। এই সভা ও পত্রিকা বাংলার নারীজাগরণে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা সে-সভার কার্যবিবরণী পাঠে জানা যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রেরই প্রদীপ্ত উৎসাহে 'ব্রহ্মবন্ধু সভা'র সভ্যেরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বব্যাপক করবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন। এই প্রচেষ্টায় উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মত সমাজ-সচেতন চিন্তানায়ক।

সরকারী সাহায্যের অভাবে 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়' বন্ধ হয়ে গেলে কেশবচন্দ্রের অক্লান্ত উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল 'মেট্রোপলিটান ফিমেল্ স্কুল' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিদ্যালয়েও নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং নারীদের উপযোগী। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টি রূপান্তরিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজে, যার বর্তমান নাম হল ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন। বাঙালী নারীকে ভারতীয় নারীজীবনের ঐতিহ্যে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্রের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হল 'আর্য নারী সমাজ'; আর 'পরিচারিকা' নামক মাসিক পত্রিকাখানি হল সে সমাজের মুখপত্র। এক কথায় বাংলা দেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেথুন, মিস্ মেরী কার্পেন্‌টার, প্যারীচরণ সরকার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পার্শ্বে।

কেশবচন্দ্রের নারী-হিতৈষণা শুধু সামাজিক নারীদের উন্নতি-কল্পেই নিয়োজিত হয়নি, পতিতা নারীদের সৎ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েও নারীজাতির প্রতি তাঁর মানবিক সহানুভূতির গভীরতা স্পষ্ট দেখা যায়। এ দিক দিয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তিনি নারী-হিতৈষী শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে।

দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্যে এত সহজ ভাষায় ও নামমাত্র মূল্যে 'সুলভ সমাচারে'র মত পত্রিকা প্রকাশ ছিল সে-যুগে অকল্পনীয়। পত্রিকাখানি তৎকালীন জনসাধারণের কাছে কিরূপ সমাদৃত হয়েছিল তা বোঝা যায় পত্রিকার ব্যাপক প্রচার দেখে। প্রথম প্রকাশের চৌদ্দ মাসের মধ্যে পত্রিকাখানি প্রচারিত হয় ২,৮১,১৪৯ সংখ্যা। বাংলা সংবাদপত্র-সাহিত্যে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজও সৃষ্টি করে এই স্বল্প-মূল্যের 'সুলভ সমাচার'।

দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে ও সুরাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টির জন্যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'মদ না গরল' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেই কেশবচন্দ্র

ক্ষান্ত হননি, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার যাতে সরকারী আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ হয়, সেজন্যে জনমত সংগ্রহ করে ভারত সরকারের নিকট তিনি আবেদনও করেছিলেন। এ আবেদনের ফলে সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রয় আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল।[১]

এ সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের দ্বারা জাতীয় সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করবার চেষ্টার মধ্যে কেশবচন্দ্রের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে।

জাতিগঠনের অতন্দ্র স্বপ্নে কেশবচন্দ্রের কর্মোদ্যম আরও বেগপ্রাপ্ত হল ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞানসভা ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে। সমাজ-বিজ্ঞানসভার শিক্ষা-শাখার সভাপতি-রূপে এ-সময় 'ভারতের নারীজাতির উন্নতি' ও 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' (Reconstruction of Native Society) নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় ভারতের নারীজাতির শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষাকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেবার জন্যে কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলতা তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের নিকট 'Indo-Philus' (ভারতবন্ধু) ছদ্মনামে লিখিত ও 'Indian Mirror'-এ প্রকাশিত কেশবচন্দ্রের নয়খানি পত্র ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। কেশবচন্দ্রের এ শিক্ষা-আন্দোলন সদ্য সদ্য কোন ফলপ্রসূ না হলেও তা সে-যুগের শিক্ষাব্রতী, সুধী মনীষী এবং সরকারের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করেছিল জাতিগঠনমূলক অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা'র অন্যতম পরিচালক-রূপে ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে এই অধ্যাত্ম-বাদী গৃহী-সন্ন্যাসীর অক্লান্ত কর্মোদ্যমও আমাদের কম বিস্মিত করে না। জাগরণোন্মুখ ভারতীয় দৃষ্টিকে বিজ্ঞানমুখী করার প্রচেষ্টায় কেশবচন্দ্র এখানে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সমকালীন চিন্তানেতা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। বিজ্ঞান-চর্চার ফলে বাঙালী—তথা ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই সৃষ্টি করেছে

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, পৃঃ ৮২—৮৯

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতির আন্তরিক যোগ বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এ সত্যটিও স্মরণযোগ্য।

সংস্কৃতি-রচনায় কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের সাধক। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঙালীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজ শাসনের সদভিপ্রায় সম্পর্কে এক শ্রেণীর রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তির ইংরেজ-প্রীতির ভিত্তি টলে উঠেছে; দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ উঠেছে প্রবল হয়ে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষিত বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির জন্যে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী মতবাদ ও মনোভাব। স্থিতধী কেশবচন্দ্র অনুভব করলেন, সংস্কৃতি-আন্দোলনের দ্বারা জাতীয় চিত্তকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার পূর্বে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে জাতির আত্মহত্যারই সামিল। সে জন্যে সমসাময়িক ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দিয়ে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করলেন ভারতের সর্বজাতির মিলনের ভিত্তিতে একটি উদার সংস্কৃতি-সংস্থার (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে),—যার নাম দিলেন তিনি 'এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট্'। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সংস্কৃতি-সংস্থা পরে সর্বজাতি ও সর্বমতবাদী ভারতীয়ের মিলন-সভারূপে বিখ্যাত হয় 'এলবার্ট হল' নামে। 'হলে'র পরিচালক-সভায় গ্রহণ করেন তিনি—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, দেশীয় খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম—সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোককে। এ 'হল' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন:

"In the midst of jarring and conflicting interests and the numerous growing political and religious divisions in native society, consequent on a state of excitement which a liberal education has produced, it was thought desirable to provide a place for kindling social intercourse, when men of all classes and creeds at least for the time being might forget their differences and enter into social fellowship and friendly communion. The Hall will not belong to any exclusive political or religious party, but will be the common property of all classes of native society.[১]

১ The Indian Daily News, April 28, 1876

সমকালীন রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলন হতে দূরে থেকে এই সংস্কৃতি-আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকা আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের পরিচায়ক বলেই মনে হয়; কিন্তু মতবাদের স্বাতন্ত্র্যে স্পর্ধাশীল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে ঐক্যমতের অভাবে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন বারে বারে কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস তার অভ্রান্ত সাক্ষী। বিস্তৃত জ্ঞানানুশীলন ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা পরস্পরকে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই জাতীয় ঐক্য সম্ভব, এবং জাতীয় ঐক্যবোধহীন মুক্তি-আন্দোলন যে অর্থহীন—রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এ দূরদৃষ্টি সে-যুগের পক্ষে নিঃসন্দেহ প্রগতিশীল। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র বিভিন্ন মত ও ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের আলোচনা ও মতপ্রকাশের কেন্দ্রস্থলরূপে পরবর্তীকালে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত-গঠনে সহায়তা করেছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জনমত গঠন ছাড়া কোন আন্দোলনই কোনদিন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। এ দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনেও কেশবচন্দ্রের দান উপেক্ষণীয় নয়।

কেশব-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই বলা হয়েছে একটা সুগভীর প্রত্যয় ও সক্রিয় ধর্ম-চেতনা ছিল কেশবচন্দ্রের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে। কর্ম-প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রগাঢ় ধর্মবোধের সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। জীবনের প্রতি এই গভীরতর প্রেরণা কখনও করেছে তাঁকে ধ্যানতন্ময়, আবার কখনও ধর্মের ভিত্তিতে কর্মজীবন প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ধর্ম ও কর্ম—এ উভয়ই ছিল তাঁর গতিশীল জীবনের যুগল-অশ্ব। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের শেষ কটি বৎসর নিয়োজিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কর্মময় একটি উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার অক্লান্ত প্রয়াসে।

এই স্তরে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সুরে অনুরণিত। তাঁর এ বক্তৃতাগুলি সমকালীন যুব-মনকে যে শুধু স্পর্শ করেছিল তা নয়, দেশী-বিদেশী বহু জ্ঞানী-গুণীর চিত্তকেও উদ্বোধিত করেছিল একটা

গভীর ধর্মচেতনায়। এ ধর্মোপদেশ জনচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করছে দেখে কেশবচন্দ্র গভীর তৃপ্তি লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-ও উপলব্ধি করলেন, কোন ধর্ম-সংস্থার মাধ্যমে সেই ধর্মাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ না হলে সেই আদর্শ দেশের মধ্যে স্থায়ী মূল্য লাভে সক্ষম হবেনা। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারত আশ্রম' (বেলঘরিয়ায়)—যে আশ্রমে গোষ্ঠীগত জীবনভিত্তিতে তিনি তাঁর পরিকল্পিত সব রকমের সংস্কারমূলক কাজের বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। এর পর প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি সুবিখ্যাত 'সাধন-কানন' (কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী স্থানে), যে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও কর্ম সাধনার পীঠভূমি। এ 'সাধন কাননে'র অন্যতম কর্ম-সূচী ছিল গ্রামোদ্যোগ যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর সেবা-গ্রামকে। গ্রামকে আত্মসম্পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে নবীন ভারত জন্মলাভ করবে, এই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির দিক দিয়ে কেশবচন্দ্র আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁর উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সঙ্গে।

১৮৭৩-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজের পরিকল্পিত 'ভারতধর্ম' প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র অন্ততঃ তিনবার উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। কেশবচন্দ্রের উদার ধর্মমতের কথা শুনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই ঐক্যচেতনা পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেত্রেও এনে দিয়েছিল ভারতের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি—এ সত্যও স্মরণযোগ্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে একটা উল্লেখযোগ্য দিক্-পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ধর্মনেতা হয়ে উঠলেন ভক্তিরহস্য-সচেতন মরমী অধ্যাত্ম সাধক। যে হৃদয়োচ্ছ্বাসের বাহ্য প্রকাশ ও ভগবানের নাম-স্মরণে সাড়ম্বর কীর্তন ছিল ব্রাহ্মসমাজের বিধি-বহির্ভূত, অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ সেই গীতবাদ্যনির্ভর কীর্তনকেই অবলম্বন করলেন তিনি ধর্মসাধনার অন্যতম অঙ্গরূপে। ধর্মানুশীলনে কেশবচন্দ্রের এই সাড়ম্বর হৃদয়োচ্ছ্বাস শুধুমাত্র গৃহসীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল না; তাঁর এই নব-

জাগ্রত ধর্মোন্মাদনা মুখরিত করে তুলল নগরীর রাজপথ পর্যন্ত। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাচরণ-বিধিতে এ যে কত বড় ব্যতিক্রম, সেদিন তা বুঝতে বাকী রইল না কারও। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেশবচন্দ্রের এই রীতিবিগর্হিত ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনার কণ্ঠ আত্মপ্রকাশ করল কখনও মৃদু গুঞ্জনে, কখনও সরবে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের হৃদয়োত্থিত ধর্মবিবেক প্রচণ্ড বেগ ও বলিষ্ঠতা নিয়ে তখন জেগে উঠেছে আত্মপ্রকাশের আন্তরিক অভিপ্রায়ে। এই জাগ্রত বিবেকের প্রভাবে সকল প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে তিনি সবলে প্রবেশ করলেন সহজ ভক্তি ও বিশ্বাসের উন্মুক্ত রাজ্যে।

পরব্রহ্মের নাম স্মরণ ও কীর্তন, স্রষ্টার বিভূতি-অনুভবের প্রয়াস ও ধ্যান-তন্ময়তা ছিল এই সময় কেশবচন্দ্রের ভগবন্মুখিতার অন্যতম নিদর্শন। তাঁর বহির্মুখী কর্মপ্রয়াস ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হল অন্তর্মুখী ভগবৎপ্রেমানুশীলনে। এই ধ্যানতন্ময়তা ভক্ত কেশবের মনে এনে দিল পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে 'মিষ্টিক' চেতনা। দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মরমী কেশবচন্দ্রের ভাবধর্মী জীবন। ধর্মগুরু কেশবচন্দ্র বাস করছেন তখন বেলঘরিয়ায় 'ভারত-আশ্রমে'।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মত (কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের কাল) কেশবচন্দ্রের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরের প্রথম ভাগে তাঁর প্রবল ধর্মানুরক্তির কথা শুনে দক্ষিণেশ্বরের দিব্যোন্মাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন ভক্ত কেশব-সন্দর্শনে। তখন থেকে আরও দশ বৎসর পূর্বে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র যখন তত্ত্বান্বেষী যুবক মাত্র, তখনই আদি ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি দেখে ঠাকুর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই আকর্ষণ তীব্রতর হল. যখন লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন—লোকহিতব্রতী কেশবচন্দ্র সংস্কারকের কর্মতৎপর জীবন অতিক্রম করে প্রবেশ করেছেন ধ্যানতন্ময় জীবনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর উদার ধর্মবোধ, বিশ্ববোধ এবং বিশ্বমৈত্রীর ক্রমবর্ধমান দিগন্ত সীমায় শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাপূত ধ্যানগম্ভীর জীবন যেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এই জ্যোতিষ্কের ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে শতাব্দীশেষে বহু ধর্মনেতার অন্তর ; আর সেই আলোকিত অন্তরের দীপ্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বাত্মা, বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের পরম ঐক্য।

কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনেও এই ধর্মগুরুর প্রবল প্রভাব সর্বপ্রথম অনুভূত হল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এই বছরেই বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণরেখায় অঙ্কিত করেছেন পাশ্চাত্য মনীষী রমঁ্যা রলাঁ তাঁর বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী গ্রন্থে।[১] কেশবচন্দ্র তখন দেশে ও বিদেশে একজন অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্ম ও কর্মনেতা বলে স্বীকৃত, আর দক্ষিণেশ্বরের 'ভগবদ্‌ভাবে উন্মাদ' ('Madman of God') শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে তখনও প্রায় অজ্ঞাত। এই অবস্থায় স্বীয় আশ্রমে এই 'অদ্ভুত উন্মাদে'র সমাধি-অবস্থা এবং সমাধিভঙ্গে তাঁর মুখে এক ও অনন্ত ভগবানের ('One and Infinite God') স্বরূপ-বিশ্লেষণ শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভক্ত ও ব্রহ্মতত্ত্বপিপাসু কেশবচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবোন্মাদ, গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও কেশবচন্দ্রের মনের উপর তাঁর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বর্ণনা-প্রসঙ্গে মঃ রলাঁ লিখছেন:

"Thereupon he (Ramakrishna) began to sing a famous hymn to Kali, and in the midst of it he fell into an ecstasy. Even for Hindus enlightened by reason this was an ordinary sight; and Keshab, who, as we have seen, was sufficiently suspicious of such other morbid manifestations of devotion, would hardly have been struck by it, if, on coming out of Samadhi at the instance of his nephew, Ramakrishna had not forthwith launched into a flood of magnificent words regarding the One and Infinite God. His ironic good sense appeared even in his inspired outpouring, and it struck Keshab very forcibly. He charged his disciples to observe it. After a short time he had no doubt that he was dealing with an exceptional personality, and in his turn went to seek it out. They became friends."

---

[১] Romain Rolland, The Life of Ramakrishna, Ed. by Advaita Asrama, Mayavati, Almora, Himalayas, Pp, 168—169.

অন্তরে তিনি এক গভীর পরিবর্তন অনুভব করলেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্ত কেশব আরও সশ্রদ্ধ ও প্রীতিমান্ হয়ে উঠলেন এই অসাধারণ ব্যক্তিটির প্রতি।

ক্রমশঃ আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হল এই দুই ভগবৎ-প্রেমিকের মধ্যে। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করলেন কেশবচন্দ্র এই আত্মভোলা দিব্যোন্মাদের প্রতি। সেই তীব্র আকর্ষণে ছুটে যেতেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে, আর এই আত্মার আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষে নৌকায়-ষ্টীমারে চলত তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান। শ্রীরামকৃষ্ণও মনে মনে ভক্ত কেশবের প্রতি অনুভব করতেন একটা তীব্র আকর্ষণ। তিনিও তাঁর স্নিগ্ধ উপস্থিতিতে সজীব ও ভাবগম্ভীর করে তুলতেন ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অনুষ্ঠানকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে কেশবচন্দ্রের মনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এবং তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কেশবের সংযোগ তখনও ছিল অব্যাহত। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর ধর্মজীবনের উপর তাঁর তখন অপ্রতিহত প্রভাব। সেই প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করলেন তিনি তাঁর মহান্ অধ্যাত্মসঙ্গীর আলোক-সামান্য ব্যক্তিত্ব-প্রসঙ্গকে শিক্ষিত বাঙালীর গোচরে আনবার জন্যে। এই প্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ লিখছেন :

'...and since his generous soul was obliged to share his discoveries with others, he spoke everywhere of Ramakrishna, in his sermons, and in his writings for journals and reviews, both in English and in his native languages. His own fame was put at Ramakrishna's disposal, and it was through Keshab that his reputation, which until then had, with a few more exceptions, not reached the popular religious masses, came to be known in a short time within the intellectual middle classes of Bengal and beyond.'

ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও এই পুঁথিগত বিদ্যাবিহীন মৌলিক ধর্মদ্রষ্টার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রচারের দায়িত্ব

গ্রহণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ধর্মাদর্শ প্রচারের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে শ্রদ্ধা সূচিত হয়েছিল সেই শ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে গভীরতর হল তাঁর সাহচার্যের ফলে। অচিরেই কেশবচন্দ্রের মনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল ব্যক্তিত্ব-প্রভাব মুদ্রিত হল। শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের যে দিকটি কেশবচন্দ্রের সদাজাগ্রত মনকে অভিভূত করেছিল, সে হল ঐহিক-পারত্রিক সব কিছুর প্রতি এই ভগবৎ-প্রেমিকের অন্তর্ভেদী ও অভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টির সম্মুখে ভক্ত কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শিষ্যের মত শ্রদ্ধাবনত হলেন, যেমন হয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ। কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের অনতিক্রমণীয় প্রভাব-বর্ণনা প্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ বলছেন :

'The modesty shown by noble Keshab, the illustrious chief of the Brahmo Samaj, rich in learning and prestige, in bowing down before this unknown man ignorant of book-learning and Sanskrit, who could hardly read and who wrote with difficulty, is truly admirable. But Ramakrishna's penetration confounded him and he sat at his feet as a disciple.'

কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের দিক্‌পরিবর্তন-আলোচনায় এখানেই প্রশ্ন ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের প্রভাবে এই মহান ধর্মনেতা বাস্তবিকপক্ষে ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা। এই বিতর্কে নতুন করে প্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয় না ; কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাবেন রমঁ্যা রলাঁর সুবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী গ্রন্থের পরিশিষ্টে (Note II, pp. 310-319)। উত্তর-কালে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় প্রভাবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্ত্য বন্ধু মনীষী ম্যাক্স্‌মূলর এবং তাঁর শিষ্য-জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন আর না করুন, অন্ততঃ দুটি বিষয়ে তাঁর পরিণত ধর্মোপলব্ধির

উপর শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ভগবৎ-স্বরূপের ধারণা 'পিতৃভাবকে' অতিক্রম করে কেশব কর্তৃক ভগবানকে 'মাতৃভাবে' অনুভব। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় এই অনুভব অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সাধনার এ-দিকটি আংশিকভাবে স্বীকার করলেও ধর্মানুশীলনে প্রাধান্য অর্পণ করেছিলেন ভগবানের ঐশ্বর্যময় পিতৃভাবের উপর। ভগবানকে সর্বশক্তিমান্ এবং দণ্ডদাতা পিতারূপে ধারণার মধ্যে কল্পনার বলিষ্ঠতা আছে, মাতৃভাবে উপাসনায় মাধুর্য বর্তমান। হিন্দু-সাধনার ঐতিহ্যে মাতৃরূপিণী ঐশীশক্তি শুধু মাধুর্যে কোমলা নন, প্রয়োজনবোধে তিনি শক্তিময়ী, রুদ্রাণী। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপরূপ সম্মেলন ঘটেছে এই মাতৃভাব-সাধনায়। কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত এই ধর্ম-বোধের আবেদন তাই শুধু নীরস তত্ত্বচিন্তায় নয়, সরস প্রেমের জগতেও। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা এই কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত সাধনা। এই সাধনায় অদ্বৈতবাদের যেমন স্থান আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ মাতৃভাবের অনুভূতিতেও এই সাধনা প্রাণবন্ত। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সাধনা সামঞ্জস্যপূর্ণ; শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য সংস্কার-মুক্তিতে নয়, সুগভীর প্রাণধর্মের মুক্তিতেই এর পূর্ণ বিকাশ। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সঙ্গে শুভ মিলনের পর কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন মুখ্যতঃ এই হৃদয়ধর্মী মাতৃভাব-প্রধান ধর্মসাধনার দিকে। ব্রাহ্মসমাজের সাধনাবহির্ভূত এই নবতর ভগবৎ-অনুভূতিকে প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য শুধুমাত্র স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট নয়, স্বীয় অন্তরঙ্গ অনুবর্তীদের নিকটও তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু হৃদয়োত্থিত বিবেক অনুসরণে কেশবচন্দ্র রইলেন অটল।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিধান' (Dew Dispensation) নামক যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন, তার উপরও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মবোধের প্রভাব গভীর বলেই মনে হয়। পৃথিবীর সকল ধর্মমতের ভিতর যে শাশ্বত সত্য আছে, সেই সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ব-জীবনে গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদর্শ অনুপ্রাণিত করল কেশবকে 'নববিধান'-পরিকল্পনায় ও তার প্রচারে। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র এই নতুন ধর্মমত প্রচার করেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৫-খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর

থেকেই এই সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মাদর্শের দিকে কেশবচন্দ্রের চিত্ত প্রসারিত হয়, এটা খুবই সম্ভব। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে উদার ধর্মভাব পূর্ব থেকেই ছিল। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট-সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই তাঁর এই ভাব দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত হয়, এবং 'নববিধানে'র মাধ্যমে তিনি এই ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে ব্রতী হন।

শতাব্দী-শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় দিব্যজীবনের প্রভাবে সংস্কারকামী ধর্মমতগুলি কিভাবে সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত হবার পথ খুঁজছিল, তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'।

কেশবচন্দ্রের উদার ধর্মভাবনা দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হল বিশ্বমানবধর্মের উদার প্রাঙ্গণে। বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এই উদার ধর্মচেতনাও একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রমুখ জগতের যে সমস্ত ধর্মনেতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হয়ে ত্যাগ প্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার সাধনায় মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতির প্রতি কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অপরিমেয়। কেশবচন্দ্র শেষ বয়সে এই সকল মহাপুরুষ-প্রচারিত ধর্মের সার সংকলন করে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যবিধানে সযত্ন হলেন। তাঁর অনুবর্তী কয়েকজন কর্মীর ওপর তিনি ভার দিলেন এই মহৎ কাজ সম্পাদন করবার জন্যে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল যথাক্রমে খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা-গবেষণায় যে গভীর পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন, তা বর্তমান গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা দেশে ধারণা করা অনেকটা দুঃসাধ্য।

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেবশচন্দ্র বৃহত্তর ভারতীয় জাতিগঠনের কাজে একদিকে ব্যস্ত, আর একদিকে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি ব্যক্তিগত কাজকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষোভের তরঙ্গ উত্থিত হল, যাতে কেশবচন্দ্রের এতদিনকার স্বপ্ন ভেঙে যাবার উপক্রম হল। এ বিক্ষোভ উপস্থিত হলেছিল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'কোচবিহার

বিবাহকে' কেন্দ্র করে। তাঁর অনুবর্তীয়েরা অভিযোগ করলেন কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই ; আর কেশবচন্দ্রের কথা হল—তাঁকে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এতবড় একজন যুক্তিবাদী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক নেতার পক্ষে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'কোচবিহার বিবাহে' সম্মতি দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে একটি অন্যায় কাজ বলেই মনে হয়। কোন কোন সহানুভূতিশীল কেশব-সমালোচক বলেন, কেশবচন্দ্রের এই কাজ পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতা-প্রসূত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহযোগী ও চরিতকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'আচার্য কেশবচন্দ্রে' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন দুটি প্রধান কারণে কেশবচন্দ্র কোচবিহার-রাজার সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। প্রথমত, এই বৈবাহিক সম্পর্ক কোচবিহার-বাসীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে,—এ সম্বন্ধে ভগবানের প্রত্যাদেশ ; দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ব্রাহ্ম-প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হবে—এ-বিষয়ে কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার ডল্টনের (Dalton) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য কিছুই নেই, কারণ এরূপ বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ; কিন্তু ব্রাহ্মমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান-ব্যাপারে কেশবচন্দ্র যে প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।[১]

এই মতান্তরের ফলে কেশব-বিরোধীরা তাঁর ভারতধর্ম-প্রতিষ্ঠার আশ্রয়ভূমি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ' (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে) ; আর বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন আদর্শের ভিত্তিতে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজ। এ 'নববিধান'-প্রতিষ্ঠাই হল কেশববন্দ্রের জীবনের শেষ কীর্তি। বস্তুতঃ অসুস্থ শরীরে এই গুরুতর শ্রমসাধ্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলেই তাঁর দেহাবসান ঘটে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ সঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণের মত কেশবচন্দ্রও বিশ্বাস

১ কোচবিহার বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কৃত 'আচার্য কেশবচন্দ্র', দ্বিতীয় খণ্ড

করতেন, জগতের প্রধান ধর্মমতগুলি একটি শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উদার ধর্মোপলব্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তাঁর 'নববিধান'। কেশবচন্দ্র-পরিকল্পিত 'নববিধান' শুধু অধ্যাত্ম-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রমাত্র নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জড়রাজ্যের রহস্যভেদও এই নতুন বিধানের অন্যতম লক্ষ্য। 'নববিধানে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বলেছেন :

" 'নববিধানে' বেদের অন্ত নাই, কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকাল বদ্ধ নহেন, সমুদয় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত।...জড়রাজ্য, মনোরাজ্য সমুদয় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম,—ইহার মধ্যে কোন ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবেন।"

কেশবচন্দ্র আশা করেছিলেন, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনের ভিত্তিতে রচিত এই উদার ধর্ম ভারতবাসীর পক্ষে হবে পরম কল্যাণকর। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী নিজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম করে ব্যাপকভাবে এ উদার ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত মনোভাব বাঙালীর দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত করে পরবর্তীকালে জগৎ-সচেতন এক মহৎ সংস্কৃতি-নির্মাণে সক্ষম হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে সহায়তা করেছে পঞ্চম-দশকোত্তর সজীব প্রাণধর্মী সাহিত্য। সাহিত্য পাঠের প্রতি কেশবচন্দ্রের সহজাত অনুরাগ সত্ত্বেও সচেতনভাবে তিনি কোন সাহিত্য রচনা করেননি। তবে নীতি ও ধর্মব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র জাতিকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধি। এমন জীবনধর্মী আন্তরিক ভঙ্গীতে রচনা সে যুগে ছিল দুর্লভ। স্পষ্ট ঋজুরেখায় অঙ্কিত

হয়েছে সেই সত্য-উপলব্ধি তাঁর গদ্য-রচনায়। ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছতা যদি গদ্য-রচনার অন্যতম প্রধান গুণ হয়, তবে কেশবচন্দ্র সে-যুগের আড়ম্বরপূর্ণ রচনার ক্ষেত্রে একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী। গভীর জীবন-সত্যকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধ-গম্য অথচ প্রত্যয়শীল সবল ভাষার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ছাড়া সে যুগের খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কেশবচন্দ্রের এই শক্তিশালী অথচ সহজ গদ্যরীতি বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পরে আর বেশী অনুসৃত হয়নি। স্বচ্ছ প্রকাশ-ভঙ্গীর স্থলে এসেছে অলংকারপ্রিয়তা। ফলে সে-গদ্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়লেও জনচিত্তে আবেদন সৃষ্টির দিক দিয়ে তার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেশব-চন্দ্রের স্বচ্ছ অথচ অন্তঃস্পর্শী হৃদ্য গদ্য-রচনাভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে আরও বেশী অনুশীলিত হলে বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত যে আরও প্রসারিত হত তাতে সন্দেহ নেই। কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম', 'আচার্যের প্রার্থনা', এবং 'সুলভ সমাচারে'র রচনা ও পত্রাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকের তরঙ্গমুখর বাঙালী জীবনকে বেগ ও বলিষ্ঠতা দান করেছে কেশবচন্দ্রের ক্লান্তিহীন সংস্কৃতি-সাধনা। এই সাধনার আশ্রয়স্থল ছিল ধর্ম ও সমাজসংস্কার। এই দুই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আচার্য কেশব-চন্দ্রের জাগরণের মন্ত্র বাঙালীর দৃষ্টিকে করেছিল মোহমুক্ত, এবং সেই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিই সৃষ্টি করেছিল গত শতাব্দীতে সব চাইতে ফলপ্রসূ নবজাগৃতি আন্দো-লনের। রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ছিল ভূদেব, রাজনারায়ণ এবং বঙ্কিমের মতই গঠনশীল নেতার। সেজন্য উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন জাতির ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠনের উপর। তাঁর জাতীয়তাবোধের গভীরতা সন্দেহাতীত, সে-যুগের পক্ষে পরম লোভণীয় কে. সি. এস. আই. খেতাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি মুহূর্তমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু যুগ-সুলভ ভাবোদ্বেলতা তাঁর প্রশান্ত ও সুগভীর জাতীয় চেতনাকে অতিক্রম করে কখনও তটপ্লাবী হয়ে ওঠেনি। একবার তিনি সমসাময়িক ভারত-বরেণ্য রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন,

সুরেন্দ্রনাথ যেন তার রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের আগে কেশবচন্দ্রকে সুযোগ দেন ভারতীয় জনগণের সমাজবোধ ও নীতিবোধকে উন্নত করবার জন্যে। তা না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না।[১]

বর্তমান স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য কেশব-চন্দ্রের দৃষ্টি কতটা স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী ছিল, তাঁর এই গভীর অর্থপূর্ণ উক্তি থেকে তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

১ A. C. Bannerjee, Studies in the Bengal Renaissance, 'Brahmananda Keshab Chandra Sen', p, 90.

১৪

কথাশিল্পে বাস্তবচেতনা ॥ ভাবীযুগের ইশারা

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পপ্রিয় বর্তমান বাঙালীর নিকট প্রায়-বিস্মৃত একটি নাম—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর কথাশিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে স্বল্প-আলোচিত একখানা উপন্যাস—'স্বর্ণলতা'। সাহিত্যরুচির পরিবর্তনের ফলে আধুনিক গল্প-পাঠক এই উপন্যাসখানি আর পড়েন না বটে, কিন্তু আজ থেকে আরও ছিয়াশী বছর আগে (১২৮১বাং, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)[১] বাঙালী পাঠক যখন বঙ্কিমের কল্পনাপ্রধান রোমান্সধর্মী কাহিনী পড়ে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং রোমাঞ্চিত, জীবনের প্রতি তারকনাথের ঋজুদৃষ্টি তখন তাদের কৌতূহলকে সবলে আকর্ষণ করেছিল সমাজের বাস্তব পরিবেশের দিকে। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে ব্যাপকভাবে কথাসাহিত্য-সৃষ্টির আয়োজন বাংলা সাহিত্যে আরও বহু পরবর্তীকালের ঘটনা সন্দেহ নেই ; কিন্তু অচিন্তপূর্ব জীবনবোধের ক্ষেত্রে সহৃদয় তারকনাথের এই মানস-বিচরণ সে-যুগের কল্পনাপ্রধান উপন্যাস-জগতে যে একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল—এ সত্য আজ তর্কাতীত।

লেখক হিসাবে তারকনাথ যখন প্রায় অখ্যাত, ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন সমস্ত দেশে জনপ্রিয়। বাংলা উপন্যাস তখন রোমান্সের ভাবাতিশায়ী আনন্দ-বেদনার ধারায় প্রবাহিত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনাপ্রধান দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), এবং অর্ধ-ঐতিহাসিক ও সামাজিক মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমের আত্যন্তিক রোমান্টিক ভাবকল্পনার প্রভাবে স্বল্পসংখ্যক মূল্যবান ও বহু সংখ্যক মূল্যহীন উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছে। উপন্যাস-জগতে প্রাচুর্য বাড়ছে, কিন্তু বাস্তব-জীবনকেন্দ্রিক নবসৃষ্টির কোন ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে না। এ-অবস্থায়

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা সা. চরিতমালা, ৫ম খণ্ড, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩

তারকনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন নিজের দেখা পল্লীর মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের বাস্তবচিত্র নিয়ে। বঙ্কিমের রোমান্টিক ভাবপ্রধান উপন্যাসের বিরুদ্ধে এই অখ্যাত লেখকের আদর্শগত বিদ্রোহ সেদিন দুঃসাহসিক ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু এই দুঃসাহসের ফলেই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটা যুগান্তর-সম্ভাবনা দেখা দিল।

সমসাময়িক নিছক কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনা-প্রয়াসের প্রতিবাদে তারকনাথের এই সচেতন বিদ্রোহচেতনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে "স্বর্ণলতার" আখ্যাপত্রে। সেখানে তারকনাথের দুটি উদ্ধৃতি খুবই উল্লেখ্য: প্রথম, 'Ficta voluptatis causa sint proxima veris'.—Horace. (Let fiction meant to please be very near to truth.) দ্বিতীয়, "কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং যত্নসৌ তথ্যবদ্ভবেৎ।" হরিবংশম্।

জীবনসত্যের শিল্পরূপই উপন্যাস—এ-সম্পর্কে কোন দ্বিধা ছিল না তারকনাথের। যে জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ সেই জীবনেরই শিল্পরূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাই এই জীবনশিল্পী অকম্পিত চিত্তে। কিন্তু সেই রোমান্টিক ভাবপ্রবৃত্তির যুগে তারকনাথের বাস্তবধর্মী এই অভিনব শিল্পোদ্যম যে কতখানি অভিনন্দিত হবে সে-সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল নিশ্চয়ই; না হলে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর স্ব-নামে আত্মপ্রকাশ না করবার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বাস্তবধর্মী উপন্যাসের সাফল্য সম্পর্কে তারকনাথ যতই দ্বিধান্বিত হোন না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল উপন্যাসখানি সংবেদনশীল রসিকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

এই লোকচিত্ত জয়ের কারণ কাহিনী রচনায় লেখকের পরিকল্পনার মৌলিকতা। বঙ্কিমের কল্পনাপ্রধান উপন্যাসের তুলনায় তারকনাথের উপন্যাস একান্তভাবে বাস্তবধর্মী—উপন্যাস-ধর্মের দিক দিয়ে এই মৌলিক পার্থক্যটুকু সে-যুগের সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কয়েক বছর পর 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু'র সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাসকে আখ্যায়িত করলেন 'নিছক-কাব্য', আর তারকনাথের উপন্যাসকে 'খাঁটি উপন্যাস' বলে। এ-প্রসঙ্গে 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু'র সমালোচনাটি উদ্ধারযোগ্য:

"This is the only true novel we have read in Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poems, not novels...In describing Bengali domestic life, in delineating real character, in sketching ordinary scenes, the author of *Swarnalata*, ...is without a rival among Bengali writers of fiction. He is a close observer of man and manners, and he has a faculty, which seems to be exclusively his, for working up ordinary life, both in its comic and in its serious and tragic side, Babu Taraknath is unrivalled among Bengali authors." [১]

শুধু সে-যুগের কেন, এ-যুগের চিন্তাশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও বঙ্কিমের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী এবং বঙ্কিমকে বারে বারে 'কবি' বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ বোধ হয় এই যে, জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে বঙ্কিমের ভাবকল্পনা বরাবরই একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা—কি ঐতিহাসিক উপন্যাসে, কি সামাজিক উপন্যাসে। খাঁটি রোমাণ্টিক উপন্যাসে এই ভাবাতিশায়ী কল্পনা স্বাভাবিক হলেও সামাজিক উপন্যাস রচনায় কল্পনার আতিশয্য পাঠকের বাস্তব-বোধকে পীড়িত করে। এই কারণেই বোধ হয় সে-যুগের পাঠক-সমাজ তারকনাথের সীমাবদ্ধ কল্পনায় সাধারণ বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখের বাস্তবচিত্র দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন। অনায়াসলব্ধ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী জমিদার পরিবারের সীমাহীন অবকাশে প্রীতি ও প্রীতিহীনতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রেম, বিরহ, রূপমোহ ও মোহভঙ্গের বৈচিত্র্যময় চমকপ্রদ কাহিনী নয়,—পল্লী ও নগর-পরিবেশের ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের আপাত-বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও যে রসসৃষ্টির প্রচুর উপাদান বিদ্যমান, সহৃদয় হৃদয়-সংবেদনার সাহায্যে তারকনাথ তা প্রমাণ করলেন 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে। একটা নতুন জীবন-বৈচিত্র্যের স্বাদ পেল বাঙালী পাঠক, আর উপন্যাস রচনায় একটা নতুন আদর্শের ইঙ্গিত পেলেন সে-যুগের ঔপন্যাসিক 'স্বর্ণলতা' পাঠ করে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটা নবযুগ-সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠল।

১ Tha Calcutta Review, No. C X LIX, 1882.

ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠল উপন্যাসখানি। এই জনপ্রিয়তার প্রধান পরিচয়, উপন্যাসখানির একের পরে এক সংস্করণ। কিন্তু মজার বিষয় এই, গ্রন্থে লেখকের নাম না থাকায় উপন্যাসের লেখক কে লোকে তা অনেককাল জানতে পারে নি। অনেক সাহিত্যযশোলিপ্সু নিজেকে এই উপন্যাসের লেখক বলে পরিচয় দিতে লাগলেন। আবার অনেকে সে-যুগের খ্যাতিমান লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (তারকনাথের বন্ধু) এই বাস্তবধর্মী উপন্যাসের রচয়িতা বলে ভুল করতে লাগল। ১২৯০ সালে প্রকাশিত 'স্বর্ণলতা'র চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্রে সহৃদয় ইন্দ্রনাথ পাঠকসমাজের নিকট লেখকের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরলেন। তারকনাথ 'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে' প্রতিষ্ঠিত হলেন। উপন্যাসখানির জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে চলল। লেখকের জীবিতাবস্থায় বইখানির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হল। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস জে. বি. নাইট Journal of the National Indian Association-এ 'স্বর্ণলতা'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন রায়ও বইখানির ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন। ফলে বইখানির মর্যাদা আরও বর্ধিত হল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বর্ণলতা'র প্রথমাংশের অনুসরণে অমৃতলাল বসুর নাট্যরূপ 'সরলা' ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রায় এক বৎসর কাল বারবার অভিনীত হল। নাট্যাভিনয়ের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকের খ্যাতিও শতগুণে বেড়ে গেল। প্রথম লেখা উপন্যাস-খানির সাফল্যে খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করার পর তারকনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস রচনার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয়। কর্মোপলক্ষে তারকনাথকে বাঙ্‌লা দেশের পল্লী অঞ্চলের বহু স্থানে ভ্রমণ এবং বহু লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। পল্লী বাঙ্‌লার পারিবারিক জীবন এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে তারকনাথ এ-সময়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। উপন্যাস হিসাবে 'স্বর্ণলতা'র সার্থকতার মূলে আছে তারকনাথের বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন। এ প্রসঙ্গে তারকনাথ নিজেও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের

১৯শে জুলাই তারিখের দৈনন্দিন লিপিতে লিখেছেন: "Some of the characters are from the real life." ভ্রাম্যমাণ জীবনে যে বিচিত্রধর্মী মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, সেই জীবনকে রসরূপ দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তারকনাথের। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানির দিক নিয়ে নয়, সে-জীবনের হাস্যোজ্জ্বল করুণ রূপেরও জীবন্ত চিত্র আঁকার আশ্চর্য নিপুণতা ছিল এই হৃদয়বান শিল্পীর। ছাত্রাবস্থায় ডিকেন্সের একজন অনুরক্ত পাঠক ছিলেন তারকনাথ। সে সময়ে ডিকেন্সের করুণ ও হাস্যরসাত্মক জীবনচিত্র তারকনাথের কৌতুকপ্রিয় কল্পনাপ্রবৃত্তিকে যে উদ্দীপ্ত করেছিল, তা অনুমান করা অহেতুক নয়। রসস্পৃহার ক্ষেত্রে তারকনাথের যুগ থেকে আমাদের যুগের ব্যবধান প্রচুর। তাই স্বর্ণলতার নীলকমল বা গদাধরচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক জীবনচিত্র হয়ত আমাদের রস-পিপাসাকে তৃপ্ত করে না; কিন্তু এই অদ্ভুত জীবনচিত্র সে-যুগের সাধারণ বাঙালী পাঠকের চিত্তে অনাবিল হাস্যরসের প্রস্রবণ সৃষ্টি করত। ঈর্ষাদগ্ধ ক্রূর প্রকৃতির স্ত্রী-চরিত্র প্রমদা এবং চরম আর্থিক দৈন্যের সম্মুখীন অথচ পাতিব্রত্যধর্মে অবিচল সরলার চরিত্র-সৃষ্টিতে তারকনাথ মাত্রাতিরিক্ত ভাবাতিরেকের পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই মনে হয়; কিন্তু এ-কথাও স্মরণযোগ্য, সে-যুগের পল্লীসমাজে ওই ধরণের চরিত্রের একেবারে অভাব ছিল না।

'স্বর্ণলতা' যৌথ জীবনের আদর্শ-শাসিত সমাজের ভাঙন-প্রবৃত্তির একটি জীবন্ত আলেখ্য। মননশীল সমাজচেতনার প্রভাবে তারকনাথ বাঙালী হিন্দুসমাজের সেই ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ্য করেছিলেন, আর সহৃদয় অন্তরের সহানুভূতি-স্পর্শে সেই বেদনার চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন। তারকনাথের জীবনীপাঠে জানা যায়, সে-যুগের বাঙালী সমাজ 'স্বর্ণলতা' পাঠ করে ও 'সরলা'র অভিনয় দেখে শুধু আনন্দই আহরণ করেননি, জীবনের সত্যপথ নির্ণয়ে জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলেন। মহৎ শিল্পের অন্যতম প্রভাব হল চিত্ত-সমুন্নতি। তারকনাথ ছিলেন সেই মহৎ জীবনধর্মী-শিল্পের একনিষ্ঠ সাধক। জাতির কল্যাণ-কামনা ছিল তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা। তাই আধুনিক কলাকৈবল্যবাদী শিল্প-বিচারে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন মনে না হলেও তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস-জগতে যে একটা অনন্য সৃষ্টি তাতে

সন্দেহের অবকাশ নেই। এই একখানি মাত্র উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী শিল্পীর শিল্প-ভাবনা অচিন্তিতপূর্ব বাস্তব রাজ্যের তোরণ-প্রান্তে উপনীত হল।

সৃষ্টি হিসাবে স্বর্ণলতার মূল্যবিচারে একটি কথা সর্বশেষে স্মরণযোগ্য। কোন সৃষ্টিই পাঠক-মনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় না—যদি সেই শিল্পকর্ম স্রষ্টার নির্মাণ-কৌশলে চিত্তাকর্ষক না হয়ে ওঠে। শিল্পসমালোচনায় সেজন্যে form-এর উৎকর্ষ যুগে যুগে স্বীকৃত হয়ে আসছে। শিল্পরচনায় এই form বহিরঙ্গের পরিচয়মাত্র নয়, শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বিকাশেও form-এর নিটোল প্রকাশ অপরিহার্য। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শও বিবর্তিত হয়; কিন্তু শিল্পরচনায় form-এর যদি উৎকর্ষ থাকে তাহলে উত্তর যুগেও সেই শিল্প লোকের মনোহরণ করে। Richardson-এর Clarissa উপন্যাসের ভাববস্তু শুধু সে-যুগের পক্ষে কেন, এ-যুগের পক্ষেও আধুনিক। কিন্তু এ-যুগের পাঠক Clarissa আর পড়ে না। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ইংরাজী উপন্যাসের ভাবাদর্শ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে form-এরও অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। 'স্বর্ণলতা'র তুলনায় বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজচেতনা হয়ত এত ব্যাপক নয়; কিন্তু তাঁর কোন কোন উপন্যাসে form-এর যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তা এখনও সে-সব উপন্যাসকে পাঠকের কাছে প্রিয় করে রেখেছে। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য় বঙ্কিম-উপন্যাসের সেই শিল্পোৎকর্ষ নেই। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ সত্ত্বেও শুধুমাত্র শিল্পকৌশলের দুর্বলতার জন্যই 'স্বর্ণলতা' আজ সাধারণ পাঠকের কাছে আবেদনহীন। বঙ্কিমের উপন্যাসের তুলনায় 'স্বর্ণলতা'কে মনে হবে চিত্রসমষ্টি মাত্র!

উৎকৃষ্ট শিল্পের আর একটি উল্লেখ্য লক্ষণ নবীনতা। এই গুণের জন্যই বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টি এখনও অনুভূতিশীল পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য় নবীনতার পরিচয় নেই।

এই কারণে সে-যুগের পক্ষে চাঞ্চল্যকর এই উপন্যাসখানি আজ সাধারণ বাঙালী পাঠকের চিত্তকে আর আকর্ষণ করে না। প্রচুর মানবিক আবেদন সত্ত্বেও নবীনতার অভাবে উপন্যাস কিরূপে জনপ্রিয়তা হারায় বাংলা উপন্যাসে তার উল্লেখ্য নিদর্শন তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'।

শিল্পসৃষ্টি হিসাবে তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র আরও একটি দুর্বলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। মানবচিত্তের যে মৌলিক প্রবৃত্তির সংঘাতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনধর্মী উপন্যাস পাঠকচিত্তে স্থায়ী আবেদনের সৃষ্টি করে, তারকনাথের উপন্যাসে সেই সংঘাতের পরিচয় নেই। ফলে তারকনাথের তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা সমকালীন পাঠকের সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্তি করলেও সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ-যুগের পাঠকচিত্তে রস-সংবেদনার উদ্রেক করতে পারে না। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের সমাজও ঊনবিংশ শতাব্দীর। বিবর্তনের ধারায় সেই সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যও আজ বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু সেই বিগত জীবনের প্রেক্ষাপটে দরদী শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাব-দুর্বল নরনারীর যে চিরন্তন হৃদয়-রহস্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তা লেখকের শিল্পসৃষ্টিকে চিরযুগের পাঠকচিত্তে অমর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই হিসাবে মনে হয়, বঙ্কিম শাশ্বত জীবনচেতনার অনুসন্ধানী কলাবিদ্, আর তারকনাথ স্ব-যুগের সমাজ-জীবনের দ্রষ্টামাত্র!

এই সমস্ত দোষ-দুর্বলতা সত্ত্বেও এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য, তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' বাঙ্‌লা দেশের একদা-সজীব মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের একটি স্বচ্ছ দর্পণ ;—যে দর্পণে নিজেদের হাস্যোল্লাস, স্নেহ, প্রীতি, শঠতা, ক্রূরতা, ধর্মবোধ ও পাপপ্রবৃত্তিকে একত্র প্রতিবিম্বিত দেখে বাঙালী একদিন হেসেছিল, কেঁদেছিল, ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং একটা আদর্শ-অভিমুখী জীবন-স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল।

১৫

নাটকে বৃহত্তর জীবনস্পর্শ ॥ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ॥ সংস্কৃতির রূপান্তর

গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য আজ ইতিহাসের কঙ্কাল ; গিরিশচন্দ্রের জীবন-স্মৃতি বর্তমান শিক্ষিত বাঙালীর নিকট দূরাগত প্রতিধ্বনি। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অর্ধ শতাব্দীও অতিক্রান্ত হয়নি, ইতিমধ্যেই গিরিশচন্দ্রের সংস্কৃতি-সাধনার কথা বাঙালী আজ ভুলতে বসেছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

কী সে বিশিষ্ট সংস্কৃতি-সাধনা যা গিরিশচন্দ্রকে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে অমরত্ব দান করবে ?

একটি প্রগতিশীল জাতির মার্জিত মানসিকতার পরিচয় বহন করে তার সাহিত্য, এবং রঙ্গমঞ্চ। সংস্কৃতি-সমালোচকদের মতে মনের পরিমার্জনা হল সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। মনের পরিমার্জনা-কার্যে সাহিত্যের আবেদন অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং দ্রুত। জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নের বাহন হিসাবে গিরিশচন্দ্র তাই বেছে নিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চকে— সেই আবেগপ্রবণ, ভাবতন্ময় রেনেসাঁস্-এর যুগে গিরিশচন্দ্রের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিস্মিত করে।

পূর্বসূরী নাট্যকার মধুসূদনের মতই গিরিশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলা নাটকের বিকাশ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা কববার অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা এবং দুঃসাহস শিল্পী মধুসূদনের ছিল না। গিরিশচন্দ্র একাধারে অভিনেতা, নাট্য-পরিচালক ও নাট্যকার। এই ত্রিমুখী কর্মতৎপরতার সাহায্যে গিরিশচন্দ্র বাঙ্‌লা দেশের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করলেন। যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সহায়তা না পেয়ে মধুসূদনের

বিপুল সম্ভাবনাময় নাট্যপ্রতিভা অকালে স্তিমিত হল, সেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনা-শক্তির অসাধারণ স্ফুরণ হল। কোন সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের তাগিদে, আবার কোন সময়ে অন্তরের প্রেরণায় একের পরে এক মূল্যবান ও মূল্যহীন বহু নাটক রচনা করে দীন বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রাচুর্য আনলেন এই অসাধারণ অভিনয়-শিল্পী। যুগ-প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বাস্তব-সচেতন নাট্যকার যদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী না হতেন তা হলে তাঁর উত্তরসূরী অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকারের বহু নাটক অভিনয়-সৌভাগ্য বঞ্চিত হত; আর এটা অনুমান করা মোটেই অহেতুক নয়, পূর্বসূরী নাট্যকার মধুসূদনের মত উৎসাহ ও আনুকূল্যের অভাবে তাঁদের নাট্যপ্রয়াসও হয়ত বা মধ্যপথে সক্রিয়তা হারাত।

অতএব বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ করে স্মরণীয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ—যে বৎসর গিরিশচন্দ্রের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল কলকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ; এবং সেই সঙ্গে স্মরণীয় আর একটি অখ্যাত নাম—প্রতাপচাঁদ জহুরী—যার অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হল এই যুগান্তরকারী প্রতিষ্ঠান। এরই মাধ্যমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নাগরিক বাঙালী খুঁজে পেল তাদের অবসরকালীন আনন্দ ও জ্ঞানের সঞ্চয়। যে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয় একদিন ছিল অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসের সামগ্রী, তা হল এখন থেকে সাধারণ দর্শকের নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও জাতীয় ভাবোদ্দীপনার অফুরন্ত উৎস। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠা শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে এনে দিয়েছিল সংশয় ও বিপ্লব, আর শতাব্দীর শেষার্ধে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিভ্রান্ত বাঙালীর সেই সংশয় ও অনিশ্চয়তা অনেকাংশে দূরীভূত করে সে-স্থলে প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাজাত্যবোধ ও ধর্মবোধ। পূর্ববর্তী সংস্কারযুগের বাঁধন-ভাঙা প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করে বাঙালী এবার প্রবেশ করল সমন্বয়ের উদার প্রাঙ্গণে। জাতীয় ভাবাদর্শের আলোকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মস্থতা লাভই এই সমন্বয়-যুগের প্রধান প্রেরণা।

নাটক-সৃষ্টির প্রেরণা বিশ্লেষণে স্রষ্টার দুটি মৌলিক প্রবৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন একজন ইংরাজ লেখক: তার মধ্যে একটি হল The craving for amusement, অপরটি হল The desire for improvement. বাংলা নাটকের প্রথম যুগের নাট্য-প্রয়াসের মধ্যে এই craving for amusement-টাই মুখ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে-জন্যে প্রথম যুগের অধিকাংশ নাটক যথোপযোগী আঙ্গিক-সম্পূর্ণতা লাভ না করে পর্যবসিত হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক নক্সায়। একমাত্র সচেতনশিল্পী মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর নাটকগুলি ছিল এ-সত্যের ব্যতিক্রম। ব্যঙ্গাত্মক নক্সা রচনার মোহ থেকে একেবারে মুক্ত হতে না পারলেও মধুসূদনই বোধ হয় সর্বপ্রথম নাট্যশিল্পী—যিনি য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের অনুসরণে বাংলা নাটককে একটি সুনির্দিষ্ট রূপে গড়ে তোলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। A desire for improvement-ই ছিল মধুসূদনের নাট্যপ্রয়াসের মূল লক্ষ্য। বাংলা নাট্যকলাকে শিল্পসৃষ্টির একটা উন্নততর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এত সচেতন প্রয়াস সে-যুগের আর কোন নাট্যকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু সেই স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে মধুসূদনের সামনে যে পর্বতপ্রমাণ বাধা এসে উপস্থিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। নিছক amusement-এর পর্যায় থেকে বাংলা নাটককে improvment-এর স্তরে উন্নীত করতে গিরিশচন্দ্রও যে নানা বাধার সম্মুখীন না হয়েছিলেন তা নয়; কিন্তু সমসাময়িক নাট্যান্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় গিরিশচন্দ্র সকল রকমের বাধা সবলে অতিক্রম করে একটা সমৃদ্ধ নাট্যযুগের প্রবর্তন করলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে নাটকের ক্রমাভিব্যক্তির দিকে পথের বাধা অপসারিত হলে গিরিশচন্দ্র মনোযোগী হলেন নাটককে জনপ্রিয় করে তুলতে। নাটক শুধু পাঠ্য নয়, দৃশ্যও বটে। নাট্যকলার বিকাশের জন্যে স্বাভাবিক ও নিপুণ অভিনয় তাই অনেকাংশে নির্ভরশীল। উৎকৃষ্ট নাটক রচনার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র তাই গড়ে তুললেন একদল সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী—যাদের অভিনয়কুশলতায় বাংলা নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগের ফলে স্বভাবানুকরণে এল স্বতঃস্ফূর্তি। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে

একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। মধুসূদনের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হল। উপযুক্ত দৃশ্যাদির পটভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে জীবনের স্বাভাবিক অনুকৃতি দেখে সে-যুগের বাঙালী দর্শক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চ পরিণত হল মার্জিত-মানস শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতি-কেন্দ্রে। বিদ্যাসাগরের মত মনীষী, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত অবতারকল্প মহাপুরুষ সেই সংস্কৃতি-কেন্দ্রে জীবনের অনুকৃতি দেখে মুগ্ধ হলেন, আর উৎসাহিত করলেন গিরিশচন্দ্রকে তাঁর অভিনব নাট্য-প্রচেষ্টায়। জনসাধারণের নিকট থেকেও আসতে লাগল রঙ্গমঞ্চে নিত্য নতুন নাটক দেখবার দাবি। এই দাবি পূরণ করতে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে সৃষ্টি করতে হল নিত্য নতুন নাটক—ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক এবং অবতার-মহাপুরুষদের জীবনকে অবলম্বন করে। ইংরাজী Morality play-র লক্ষণাক্রান্ত নাট্যরচনার ফাঁকে ফাঁকে গিরিশচন্দ্র আবার রচনা ও মঞ্চস্থ করলেন Interlude-এর মত হাস্যরসাত্মক নাটক। জীবনের serious দিক নিয়ে রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে comic দিক নিয়েও অনাবিল হাসির অজস্র আয়োজন! বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে জীবন-ভাবনা ও আনন্দের আসর একসঙ্গে জমে উঠল। বাংলা নাটকের দিগন্ত প্রসারিত হল।

শুধু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নয়, সংলাপ রচনার অভিনব কৌশলও গিরিশচন্দ্রের নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে। এদিক দিয়েও গিরিশচন্দ্রের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। উচ্চ কোটির গদ্যরীতিতে সংলাপ রচনা কত হাস্যকর, আবেদনহীন ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে দীনবন্ধুর নাটকের ভদ্রশ্রেণীর সংলাপ তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই এ শ্রেণীর সংলাপের কৃত্রিমতা লক্ষ্য করে থাকবেন। তাই তিনি সেই অস্বাভাবিক সংলাপের উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা না করে নাট্যরস সৃষ্টির উপায় হিসাবে নতুন পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। মুখ্যতঃ গদ্য সংলাপরীতিকে বর্জন করে তিনি অবলম্বন করলেন ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নতুন সংলাপ-রীতির। এই রীতির প্রধান উপযোগিতা হল ভাবের উত্থান-পতন ছন্দোস্রোতের মধ্য দিয়ে শ্রোতার অন্তরে অনিবার্যবেগে অতি দ্রুত আলোড়নের সৃষ্টি করে। বস্তুতঃপক্ষে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াসের লক্ষ্যও ছিল তাই। নাট্যরস সৃষ্টিতে Action থেকে Emotion-এর উপরই

তিনি জোর দিয়েছিলেন বেশী। সেজন্য গিরিশচন্দ্রের নাটক ভাবাবেগময় সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

জাতীয় জীবনের সেই ভাবাতিশায়ী পুনরভ্যুত্থানের যুগে গিরিশচন্দ্রের আবেগপ্রধান নাটক জনচিত্তকে মাতিয়ে তুললেও বর্তমানের আবেগহীন শুষ্ক জীবনবোধের দিনে সেই নাটক আজ আবেদনহীন হয়ে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কৌতূহলের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সার্থকতা ও ব্যর্থতার মূলেই হল নাট্যকারের এই যুগোচিত আবেগবিহ্বলতা; আর তাঁর এই আবেগসৃষ্টিকে তীব্রতর করেছিল গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ অমিত্রচ্ছন্দের সার্থক ব্যবহার—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "গৈরিশছন্দ" নামে যা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্বেও ব্রজমোহন রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যরস সৃষ্টির বাহন হিসাবে এই ভাঙা অমিত্রাক্ষরছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত এত সার্থক ও ব্যাপকভাবে সেই নতুন ছন্দের ব্যবহার তাঁরা করতে পারেননি। সেজন্যে প্রথম উদ্ভাবনের গৌরব-ভাগী না হলেও সার্থক প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্যে নাট্যকলা সৃষ্টির এই শক্তিশালী বহনটি আজো গিরিশচন্দ্রের নামের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা বর্ষার সজল মেঘ, তাঁর অক্লান্ত নাটক-রচনা অশ্রান্ত বর্ষণ। সেই অজস্র বর্ষণে বাংলা নাটকের উষর ক্ষেত্র উর্বর হয়েছে, রিক্ততার যায়গায় এসেছে প্রাচুর্য—সন্দেহ নেই; কিন্তু সে-প্রতিভায় ছিল না বর্ষার ফুল ফুটানোর আনন্দানুভূতি—যে অনুভূতির স্পর্শে মানুষের জীবনের বিচিত্র কাহিনী রূপান্তরিত হয় চিরদিনের উপভোগ্য সূক্ষ্ম ও সুন্দর শিল্পকর্মে। সেজন্যে যুগ-প্রয়োজনের দাবী মিটালেও প্রখর শিল্পচেতনার অভাবে গিরিশ-চন্দ্রের নাটক আজ পাঠক ও রঙ্গমঞ্চজগতে অনাদৃত। ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন,—"গীতিনাট্যের কথা বাদ দিলে তাঁহার পয়তাল্লিশখানি নাটকের স্থানে পাঁচখানি মাত্র নাটক লিখিলে যশঃ বাড়িত বই কমিত না।"[১]

[১] ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা আলোচনায় সব চেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল তাঁর যুগ-সচেতনতা। এ যুগ-চেতনা প্রবল আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর দেশাত্মবোধ ও ধর্মবোধকে আশ্রয় করে। গত শতাব্দীর ছয়, সাত, আট, নয় দশকের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রেরণাও এই দেশাত্মবোধ ও ধর্মবোধ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিভিন্ন ভাব-সংঘাতে বিভ্রান্ত বাঙালীকে জাতীয় আদর্শের স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এত সচেতন ও বিপুল প্রয়াস আধুনিক বাঙালী জাতির ইতিহাসে বিরল। এ-জাতীয় আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭); 'ভারত সভা' (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠার মূলেও সেই প্রবল দেশাত্মবোধ। এই জাতীয়তাবোধের বহির্মুখী প্রকাশ হল সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের জাতীয় আন্দোলন ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু একটা নবজাগ্রত জাতির কর্মান্দোলনে উত্তাপ ও বেগসঞ্চার করতে হলে আগে চাই দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবান্দোলন। এই আন্দোলনের উৎস চিন্তাশীল মনীষীর জ্ঞানানুশীলনে, সাধকের ধ্যানে এবং শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে। এই ভাবপ্রেরণার উৎস দুর্নিরীক্ষ্য হলেও জাতীয় চিত্তের উপর তার প্রভাব অনিবার্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় চিত্তে সে ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আবেগপূর্ণ এবং চিন্তাশীল রচনার মাধ্যমে, মনোমোহন-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক সৃষ্টি করে, আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধ্যানতন্ময়তা ও জীবনধর্মী ধর্মানুশীলনের সহায়তায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে গিরিশ-চন্দ্রের প্রতিষ্ঠাভূমি হল এখানে। বঙ্কিম-শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতই তিনি সে-যুগের জাতীয় ভাবান্দোলনের অন্যতম নায়ক,—নাটক তাঁর আন্দোলনের মাধ্যম। বঙ্কিমচন্দ্রের মত গিরিশচন্দ্রও লোকশিক্ষক, কিন্তু বঙ্কিমের শিল্প-প্রতিভা গিরিশচন্দ্রের ছিল না। লোকশিক্ষার আবেদন সত্ত্বেও শিল্পসৃষ্টিনৈপুণ্যে বঙ্কিমের উপন্যাস আজো পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়, আর শিল্পীর সংযমের অভাবে সাময়িক প্রয়োজনের দাবি মিটালেও গিরিশচন্দ্রের নাটক আজ গ্রন্থাগারের সযত্নরক্ষিত ঐতিহাসিক নিদর্শন!

শিল্পকৃতির দিক থেকে যত মূল্যহীনই হোক না কেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকের

সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সে-যুগের বাঙালী জীবন ও বাঙালী মনের একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে মন কৌতূহলী, আদর্শসন্ধানী এবং জীবনের বন্ধনমুক্তি-প্রয়াস-তৎপর। কৌতূহলী বাঙালী চিত্তে সাময়িক আনন্দের আয়োজন করবার জন্যে নট-জীবনের প্রথম স্তরে গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' এবং নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য। দীনবন্ধুর কৌতুকপূর্ণ কাহিনী 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এর নাট্যরূপও যোগাল সে-যুগের দর্শকদের আনন্দের খোরাক। যুগ-প্রবৃত্তির ধারা অনুসরণে কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনার পর গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াসের প্রথম পর্ব হল সমাপ্ত।

তারপর প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের (আনন্দ রহো, ১২৮৮) ব্যর্থতার বেদনা অন্তরে নিয়ে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করলেন তাঁর নাট্যপ্রয়াসের সব চাইতে স্মরণীয় যুগ পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে। এ-যুগে রচিত অবতার-মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত নাটকগুলিও পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, আর বুদ্ধিপ্রধান জীবনবোধের স্থলে ভাবাবেগপূর্ণ ভক্তিরসপ্রধান জীবনচেতনার প্রবর্তনা গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান প্রেরণা।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াসের এই স্তরে এসে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিত্যের দ্রুত প্রগতিশীল ধারায় বুঝি একটি পশ্চাদাবর্তনের স্তর এসে উপস্থিত হয়েছে। পূর্বসূরী নাট্যকার ও সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের বাস্তব জীবনবোধকে এড়িয়ে গিয়ে গিরিশচন্দ্রের আদর্শসন্ধানী চিত্ত পরিক্রমণ করেছে অলৌকিক রহস্যময় পৌরাণিক জীবনের রাজ্যে। কিন্তু এ-কথা আমাদের ভোলা উচিত নয় বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী জীবনে গিরিশচন্দ্রের যুগ হল নাস্তিক্যবুদ্ধি হতে আস্তিক্যবুদ্ধিতে, অনিশ্চয়তা হতে নিশ্চয়তায়, খণ্ড জীবনের আদর্শ থেকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শে উত্তরণের যুগ। এই যুগপ্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা আবর্তিত হয়েছিল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। সুদূর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মহৎ ও বৃহৎ জীবনের আদর্শ তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন নবজাগ্রত জাতির সামনে। শুধু ইতিহাস কেন, পুরাণের সত্য-মিথ্যা

মিশ্রিত কল্পিত কাহিনীর রাজ্যে প্রবেশ করে মননশীল বঙ্কিম অখণ্ড মানব আদর্শ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে"। সেই উচ্চ মানব-জীবনাদর্শ অনুসন্ধান-প্রচেষ্টাই আত্মপ্রকাশ করেছে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে। সামসাময়িক জীবন-তরঙ্গের মধ্যে সেই আদর্শসন্ধান সহজসাধ্য কাজ নয়, কারণ সমসাময়িক জীবনের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী কালের সান্নিধ্যের দ্বারা হয় খণ্ডিত। জীবনকে detached ভাবে দেখতে গেলে প্রয়োজন কালের দূরত্ব; জীবনের আদর্শ অনুসন্ধানে এই detached দৃষ্টিলাভের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্রয় করেছিলেন ইতিহাসের চরিত্রকে, আর সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে detachment আনবার জন্যে গিরিশচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বিস্মৃত অতীত যুগে—পুরাণের কুহেলিকাচ্ছন্ন রাজ্যে।

ভারতের সেই গৌরবময় অতীত যুগ গিরিশচন্দ্রের মুগ্ধ বিস্মিত ও শ্রদ্ধাশীল চিত্তের সামনে তুলে ধরেছিল জ্ঞানের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, বীর্য ও ত্যাগের আদর্শ—এক কথায় মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম আদর্শ। নবজাগ্রত জাতিকে সেই আদর্শ লাভে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন মুখ্যতঃ যুক্তির পথ, আর সহজিয়া সাধকদের মত গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন প্রেম ও ভক্তির সহজ পথরেখা। জাতিকে আদর্শলোকে উত্তরণ প্রচেষ্টায় এই সহজিয়া প্রেম ও ভক্তিমার্গের অনুসরণ যে সেযুগে অভ্রান্ত ছিল মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ বিশ্বাস ও ভক্তির পথে গিরিশচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ানুভূতি সে-যুগের পাশ্চাত্ত্য জীবনালোক-প্রভাবিত নব্যশিক্ষিত বাঙালীর চিত্তকে স্বদেশের আদর্শাভিমুখী করে তুলেছিল,—গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তাই তার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

গতিশীল মনের অন্যতম লক্ষণ হল সর্বত্রগামিতা। গিরিশচন্দ্রের মন সেক্স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের মত জীবনের প্রায় সকল স্তরকে স্পর্শ না করলেও যে বহু স্তরকে স্পর্শ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরিশীলিত মনের লক্ষণ হল সচলতা। এই গতিশীল মন সমসাময়িক ভাবধারা ও পারি-পার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে নতুন নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যায়। সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীকে জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

করে তুলবার উদ্দেশ্যে পৌরাণিক ও অবতার-মহাপুরুষ-কেন্দ্রিক নাটক রচনার পরে গিরিশচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করলেন ইতিহাসের বাস্তব ভূমিতে।

দেশাত্মবোধের চেতনা জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখন দেশের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে। এই প্রবল দেশাত্মবোধ একদিকে আত্মপ্রকাশ করেছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত জাতির পুঞ্জীভূত আক্রোশের মধ্য দিয়ে; আর একদিকে দেশের গৌরবময় অতীতকে আত্মবিস্মৃত জাতির সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-মনোমোহন-জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ প্রভৃতির কাব্য-নাটকে এই দেশাত্মবোধের প্রকাশ আবেগময়, আর বঙ্কিম-চন্দ্র-রমেশচন্দ্র-রাজকৃষ্ণ প্রভৃতির ইতিহাসচর্চায় গভীর জাতীয় চেতনার মননশীল রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্রের আবেগপ্রবণ চিত্তেও লেগেছিল সমকালীন জাতীয়তা-বোধের এই প্রবল স্পর্শ। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম চরিত্রের কল্পিত-কালিমা অস্বীকার করে তিনি এ-দুটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে নাটকের মধ্যে উপস্থিত করলেন স্বদেশপ্রেমের প্রতীক হিসাবে। আর 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে (সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজী' অবলম্বনে লিখিত) তিনি শিবাজীকে সৃষ্টি করলেন হিন্দু-জাতীয়-অভীপ্সার নায়ক রূপে। মীরকাসিম ও ছত্রপতিতে অনেক অবাস্তব ঘটনা ও চরিত্র নাট্যরসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটালেও সিরাজদ্দৌলা নাটকে নাট্যকারের ইতিহাস-অনুগত্য চমৎকার নাট্যরসসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। জাতীয় জীবনের আদর্শ অনুসন্ধানে গিরিশচন্দ্রের ভাবকল্পনা মুখ্যতঃ ভারতের পৌরাণিক যুগে বিচরণ করলেও, সমকালীন জীবনচেতনার বিক্ষুব্ধ স্পন্দন তাঁর আবেগাতুর চিত্তকেও যে আন্দোলিত করেছিল,—এই ঐতিহাসিক নাটকগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটক সে-যুগের জাগ্রত জাতীয় চিন্তা ও আবেগ-বিহ্বলতার যেন জীবন্ত রূপ! সে-যুগের মনীষী গবেষকের ইতিহাস-চর্চা দেশবাসীর চিত্তে যে স্বদেশচেতনা উদ্দীপ্ত করতে পারেনি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের এ-শ্রেণীর নাটক সেই চেতনাকে তীব্রতর করে তুলল।

বাংলা নাটকের সর্বাত্মক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় (Improvement) গিরিশচন্দ্র

যে সর্বদা সচেতন ছিলেন তার অন্যতম নিদর্শন তাঁর বিষাদ, নসীরাম, প্রফুল্ল, বলিদান প্রভৃতি ট্র্যাজেডিগুলি। ট্র্যাজেডির আদর্শের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর তরল ভাবালুতা ট্র্যাজেডির রস-সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ট্র্যাজেডি রচনায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন অনেকাংশে দীনবন্ধুর অনুগামী। দীনবন্ধুর ট্র্যাজেডির মতই মৃত্যুর ঘনঘটা গিরিশচন্দ্রের বিয়োগান্ত নাটককে মেলো-ড্রামায় (melo-drama) পরিণত করেছে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময় চরিত্রের মহৎ পতনের মধ্য দিয়ে ট্রাজেডি-রস ঘনীভূত হয়ে উঠে। সেই ভাবগভীর মানবিক আবেদন গিরিশচন্দ্রের ট্র্যাজেডিতে নেই। তাই গিরিশচন্দ্রের বিয়োগান্ত নাটকের সজীব অভিনয় সে-যুগের অজস্র দর্শকের মনকে বিষাদে দ্রবীভূত করলেও আধুনিক পাঠকের চিত্তকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে না।

দীনবন্ধু-প্রদর্শিত বিয়োগান্ত নাটক-রচনার পথে অগ্রসর হয়ে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাট্যকার হিসাবে। এমন কি সমকালীন দেশপ্রীতির ভাবোদ্বেল পরিচয় হিসাবেও তাঁর ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি হয়ত বা জাতীয় সংস্কৃতি-অনুসন্ধানীর সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবি রাখবে; কিন্তু তাঁর সামাজিক নাটকগুলি বিস্তৃত সহানুভূতি ও আর্টের সংযমের অভাবে বর্তমান কালের মত ভবিষ্যতেও শুধুমাত্র ইতিহাসের স্মৃতি হয়ে থাকবে। তাঁর সামাজিক নক্‌সা ও প্রহসনগুলি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত বলে গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাট্যপ্রচেষ্টা যুগ-রুচিকে তৃপ্ত করলেও যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে আবেদনহীন হয়ে পড়েছে।

আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে গিরিশচন্দ্রের স্মরণীয় দান হল সে-যুগের জাগরণোন্মুখ জাতির সামনে কালাতিশায়ী আদর্শের প্রতিষ্ঠা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গিরিশচন্দ্রের এই পৌরাণিক জীবনপ্রীতি বুঝি বা তাঁর কালের সীমায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু

একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষকোটিতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর সাহিত্য এবং চিত্রশিল্পে যে মহিমান্বিত আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তাও সেই পৌরাণিক ও ঔপনিষদিক যুগের জীবনবৈচিত্র্য ও শাশ্বত মানবতাবোধকে কেন্দ্র করে।

শিল্পী হিসাবে না হোক, যুগচেতনার অন্যতম নায়ক হিসাবে গিরিশচন্দ্র বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরবরেণ্য।

১৩

প্রত্যয় ও সিদ্ধি ॥ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোদ্ঘাটন ॥

সংস্কৃতি সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ

আধুনিক বাঙালী তথা ভারত-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কী সে বিশিষ্ট জীবন-সাধনা যার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী-সংস্কৃতি দেশকালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজীবন ও বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হল—আধুনিক সমাজতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় সে-প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রগতিবাদী সংস্কার-প্রচেষ্টা এবং রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সংস্কৃতি-পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের অবতারবাদে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতাপ্রীতি বাঙালীর সম্প্রসারিত ধর্মচেতনা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌মুখী গতির একটি অভ্রান্ত পরিচয় মাত্র। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-পূর্ব 'সংস্কার-যুগ'-এর বিভ্রান্ত বাঙালী-চিত্তে স্থিতিস্থাপকতা এনে দিয়েছিল সনাতন হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুর চিরপূজ্য দেবদেবীর প্রতি এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং আত্মিক উপলব্ধিজাত দ্বিধাহীন বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ববিচার প্রসঙ্গে সমকালীন পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রভাবিত শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মচেতনা-বিবর্তনের দিকেই সংস্কৃতি-সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সব থেকে বেশী। কিন্তু স্বামীজির জীবন-সাধনার একমাত্র পরিচয় হিন্দুর সনাতন ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই নিহিত মনে করবার মত ভ্রান্তি বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। বস্তুতঃপক্ষে এই বীরাচারী সন্ন্যাসীর জীবন-সাধনার অন্যতম পরিচয় দেখা যায় স্ব-দেশ, স্ব-জাতি

ও স্ব-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, পরানুকারী এবং আত্মবিস্মৃত একটা জাতিকে স্ব-ধর্ম ও স্বাজাত্যবোধের স্থির প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর পুনঃস্থাপিত করবার ক্লান্তিহীন প্রয়াসের মধ্যে। যে বিজাতীয় জীবনাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালী-চিত্তে সৃষ্টি করেছিল একটা তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেই সঙ্কীর্ণ মুক্তিচেতনার উপর উড়িয়ে দিলেন সমষ্টিচেতনার গৌরব-পতাকা। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী সংস্কার-প্রচেষ্টায় যে অবিমিশ্র পাশ্চাত্ত্য মানবতাবোধের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি, সেই মানবতার আদর্শকে অধ্যাত্ম-চেতনার ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করে দিলেন স্বামীজি দেশবাসীর অন্তরে। সর্বোপরি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণীর বাঙালী তথা ভারতবাসী যখন বিজাতীয় জীবনচিন্তার অনুসরণে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করবার আত্মশ্লাঘায় স্ফীত, সেই সংস্কৃতি-সংকটের যুগে সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য ভাব ও চিন্তার উন্মত্ত গতিকে প্রতিহত করলেন ভারতবর্ষের সনাতন অগ্নিগর্ভ বাণীর সাহায্যে। বিশ্বসংস্কৃতির সুবিপুল ভাণ্ডারে ভারতীয় সুপ্রাচীন সংস্কৃতিরও যে দান করবার অনেক সম্পদ আছে, সেই আত্মভ্রষ্টতার যুগে এই অচিন্ত-প্রায় সত্যের প্রকাশই হল স্বামীজির সংস্কৃতি-সাধনার বিশিষ্টতম পরিচয়।

আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত ভূমিকা কি, এবার তার বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক্। কিন্তু এই পরিচয় সম্পূর্ণ হবেনা, যদি আমরা ‘সংস্কৃতি’র স্বরূপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত না হই।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ‘সংস্কৃতি’ অর্থে বিশেষ করে বোঝায় ‘মার্জিত মানসিকতা’—একথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। মানুষের এই পরিশীলিত মানসপ্রবৃত্তি অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অধ্যাত্মবোধ বলতে কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির কথা অবশ্য বলা হচ্ছেনা; এ অধ্যাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের আত্মশক্তির জাগরণে। এই আত্মচেতনা রূপ লাভ করে

কখনও ধর্মানুভূতিতে, কখনও সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কখনও শিল্পরচনায়। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে এই জাগরণের ধর্ম হল তিনটি: প্রথমতঃ, মনের স্বাধীনতা (freedom of mind); দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বমানবতা (universalism), আর তৃতীয়তঃ, শালীনতা (urbanity)।

আধুনিক কোন কোন সংস্কৃতি-সমালোচক মনের স্বাধীনতাকে বলেন বুদ্ধির মুক্তি, বিশ্বমানবতাকে অভিহিত করেন 'হিউম্যানিজম', আর urbanityকে বিশেষিত করেন 'decencies of life' বলে।[১]

বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় আমরা দেখতে পাব, স্বামীজি বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন বাঙালী তথা ভারতবাসীর আত্মশক্তির জাগরণের উপর। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন, যতদিন না মানুষ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হবে, ততদিন তার দ্বারা কোন মহৎ বা বৃহৎ কাজ করা সম্ভব হবেনা। আত্মনির্ভরহীন মানুষকে স্বামীজি অভিহিত করেছেন 'নাস্তিক' বলে: "He who does not believe in himself is an atheist." আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না এলে 'মনের স্বাধীনতা' আসে না, আর মনের স্বাধীনতা না এলে কোন প্রকার সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশও সম্ভব নয়। জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণায়ত বিকাশ সাধনের জন্য বিদেশী প্রগতিশীল আদর্শের অনুসরণ প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়,—তার জন্যে চাই "growth from within"। স্বামীজির সমগ্র জীবনবোধ ও জীবনচিন্তা আবর্তিত হয়েছে এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের উপর। এই আত্মশক্তির উৎস হল জাগ্রত হৃদয়। স্বামীজি তাই নিছক বুদ্ধিচর্চা হতে হৃদয়চর্চার উপর জোর দিয়েছিলেন বেশী। বুদ্ধি ও হৃদয়ের নির্দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে স্বামীজি স্পষ্টভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন হৃদয়ের নির্দেশ অনুসরণ করবার জন্যে: "If your brain and your heart come into conflict, follow your heart." গভীর আত্মবিশ্বাস ও প্রবল ধর্মবোধ স্বামীজির জীবনোপলব্ধির মূলে। এই বিশ্বাসের পথেই আসবে মনের স্বাধীনতা, আর এই স্বাধীনতাই এনে দেবে জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী-সংস্কৃতির ক্রান্তিযুগে এই হল বিবেকানন্দের বিশিষ্ট বাণী। সাম্প্রতিক বাঙালী-জীবনের আদর্শচ্যুতি ও বিভ্রান্তির মধ্যে স্বামীজির সেই বলিষ্ঠ জীবনবাণী স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়:

---

১ গোপাল হালদার, বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩

"The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in God."

স্বামীজি-কথিত এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বা মনের স্বাধীনতাই গত শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানানুশীলনে, জাতীয়তাবোধে এবং স্ব-ধর্মপ্রীতিতে এনে দিয়েছিল একটা উদার মুক্তির ইঙ্গিত। এই মানসমুক্তির ফলে আধুনিক সংস্কৃতির একটি নতুন রূপ উঠল প্রত্যক্ষ হয়ে—এই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বাঙালী-সংস্কৃতি-অনুরাগী মাত্রেরই সুবিদিত।

জাতীয়তাবোধকে অতিক্রম না করেও বিশ্বমানবতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি আধুনিক সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় এই লক্ষণটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র একটা প্রবল ভাবাবেগ নয়, গভীর মননশীলতা ও আত্মিক সহমর্মিতা মানবতার মূল্য-উপলব্ধির মূল প্রেরণা। সংস্কার-যুগের মনীষীদের মত নির্বিশেষের সাধনা তিনি করেননি, রূপাতীতের স্বপ্ন তাঁর মুক্তিপ্রয়াসী চিত্তকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি—তাঁর সুবিস্তৃত বিশ্বচেতনা রূপ পেরেছিল বস্তুর মধ্যে, 'বিশেষ'-এর মধ্যে। নির্যাতিত মানবতার সার্বিক কল্যাণ-কামনায় স্বীয় ভাবধর্মী জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। লাঞ্ছিত বঞ্চিত জীবনের প্রতি, সহজ ও মঙ্গল-পথভ্রষ্ট মানুষের প্রতি সীমাহীন প্রীতিই এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল,—যে সর্বাত্মক সহানুভূতির প্রেরণায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন :

"The only God in whom I believe, is the sum total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."

পরিশীলিত হৃদয়বৃত্তির এই ব্যাপকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী-

সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করেছে, এবং উন্মোচিত করেছে বাঙালী শিল্পী ও জীবন-সাধকদের সাম্‌নে এক অনাবিষ্কৃত ও বিচিত্র মানবমাহাত্ম্যের জগৎ। স্বামী বিবেকানন্দের এই গভীরতম মানবমাহাত্ম্য-উপলব্ধি বাঙালী শিল্পীর শিল্প-সাধনাকে এখনও হয়ত চরম মূল্যে মূল্যবান করে তোলেনি; কিন্তু উদার, সমুন্নত ও বিশ্বমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি বাঙালী শিল্পীর সামনে যে বিরাট সম্ভাবনাময় ভাবপ্রেরণার আদর্শ স্থাপন করেছেন, বর্তমান বিভ্রান্তিকর আদর্শ-বোধহীন যুগের অবসানে, সেই মহান প্রেরণা বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনাকে যে একটা পরম গৌরবে তাৎপর্যময় করে তুলবে—এ অনুমান অহেতুক নয়।

বিচিত্রধর্মী মানবপ্রকৃতির দিকে অপরিসীম বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বীয় অন্তরের অপরিমেয় ঐশ্বর্যবোধও মানুষের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল তাঁর অনুভবক্ষম আত্মাকে। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অন্তহীন বিশ্বতরঙ্গের মধ্যে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের মত তিনিও একজন। মানবজীবনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে স্বামীজির বলিষ্ঠ বাণী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"Never forget the glory of human nature! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Bhudhas are but the waves on the boundless ocean which I am."

এই গভীর আত্মোপলব্ধি তাঁকে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল অন্তহীন দেশ ও কালের বিশ্বমানবের প্রতি। আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতিকেও বেগবান করেছে বিশ্বজীবনের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। বৈদান্তিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েও তিনি যে শুধুমাত্র শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে বিশ্বজীবনের তরঙ্গধ্বনি সাগ্রহে শুনেছিলেন তা নয়, জীবনের আদর্শ সম্পর্কে স্বদেশাত্মার চিরন্তন সত্যবাণীকেও পরম আত্মীয়ের মত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন জড়বাদী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবনের মর্মদ্বারে। অন্ধের মত নির্বিচারে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা গ্রহণ করা নয়, নিজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাও বিশ্ববাসীকে পরম আত্মীয়-জ্ঞানে দান করা—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতি-সাধনার মূলমন্ত্র। বিশ্বজনসেবার ও বিশ্ব-মৈত্রীর পীঠস্থান স্থাপন করেছিলেন তিনি এই বাঙ্‌লা দেশেরই গঙ্গাতীরে; তাঁর

মহান সেবাদর্শের অনুগামী ভক্তরা তাঁর সুউচ্চ জীবনাদর্শের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন আশ্রমিক সংঘের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে। বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় দেশকালের সীমায় কেন্দ্রায়িত বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি সার্থক-ভাবে সর্বপ্রথমে বিশ্বসংস্কৃতি সভায় নিজ সুনির্দিষ্ট আসন লাভ করল।

প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল পরানুকরণস্পৃহ বাঙালী-জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে গ্লানি সঞ্চিত হয়েছিল, সে গ্লানিময় জীবনকে সংযমব্রতের নিয়মনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঐকান্তিক চেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনার অন্যতম দিক। সংস্কৃতির স্বরূপলক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার যাকে বলেছেন, 'urbanity,' আর কোন কোন সংস্কৃতি-সমালোচক যাকে অভিহিত করেছেন 'decencies of life' বলে, বাঙালীর সমষ্টিগত জীবনে সেই 'urbanity' বা 'decencies of life'-এর প্রবর্তনার জন্য একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনায়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকারীদের প্রতি এ সংযমব্রতী সন্ন্যাসীর সাবধানবাক্য—"বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।" "মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপন হয় না"—সেই ভাববিভ্রান্তির যুগে বিপরীত জীবনাদর্শের প্রভাবে দোদুল্যমান বাঙালীর চিত্তে যে শ্রেয়োবোধের আদর্শ জাগ্রত করে তুলেছিল, তার সাক্ষী বাঙালীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস। স্বামীজির সংযমব্রতী জীবনের এই প্রচণ্ড আদর্শনিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর জীবনচর্চায় শালীনতাবোধ এনে দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতিকে উত্তীর্ণ করেছে আধুনিকতার স্তরে—বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনায় এ-কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কেও স্বামী বিবেকানন্দের মতামত তাঁর জীবনবাণীর মতই দৃঢ় এবং স্পষ্ট। উচ্চতর সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য স্বামীজি যেমন ব্যক্তিত্বের ঋজুতা ও চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে সবার উপর স্থান দিতেন, তেমনি শ্রেষ্ঠ কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি সরলতা ও স্পষ্টতার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সঙ্গীতকে মর্মস্পর্শী করে

তোলবার জন্যে তিনি সমর্থন করতেন সহজ ও সরল সুরের, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বভাবের অনুকরণকেই তিনি দিতেন সর্বাগ্রগণ্য স্থান ; আর সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে স্বামীজি যে আদর্শের কথা বলেছেন আধুনিক ভঙ্গীপ্রধান সাহিত্য-সৃষ্টির যুগে তা সাহিত্যশিল্পী-মাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে তার উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয় :

"ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুকরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।"

"বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আদর্শে না গড়িয়া বরং পালির আদর্শে গড়িলে ভাল হয়। কেননা পালির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।...নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করাও আবশ্যক। যদি সংস্কৃত অভিধান হইতে এজন্য শব্দ সংগ্রহ করা যায় তবে তদ্দ্বারা বাংলা ভাষার বিশেষ পুষ্টিলাভ হইতে পারে।"

সাহিত্যের ভাষা হিসাবে লোকপ্রচলিত চল্‌তি ভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে স্বামীজি ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ। চল্‌তি ভাষার স্বপক্ষে স্বামীজি বলেন :
"বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন।... চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয়না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরী করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য-গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষার নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর, সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ওসকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?..."

ভাষা সহজ সরল হলেও ভাবব্যঞ্জনা যে বলিষ্ঠ হতে পারে তার প্রমাণ স্বামীজির নিজের রচনা। বিবেকানন্দের রচনা ওজগুণসম্পন্ন বলিষ্ঠ গদ্যের নিদর্শন। গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গার তরঙ্গবেগ সে-রচনার প্রতি ছত্রে। সে-ভাষা

গভীর আবেগময়, অথচ সে আবেগধর্ম যুক্তি, তর্ক ও মননের সীমাকে অতিক্রম করে বৃথা বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়নি কোথাও। আবেগ ও মননের অপূর্ব সমন্বয় বিবেকানন্দের গদ্য—বাংলা সাহিত্যে অনন্য, তুলনারহিত। স্বামীজি-লিখিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', এবং 'পরিব্রাজক'—এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

প্রচলিত অর্থে বিবেকানন্দকে হয়ত ঠিক সাহিত্যশিল্পী বলা চলেনা, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যেমন সমন্বয়ের ভিত্তিতে বাঙ্‌লার নবযুগের উদার ও শক্তিমান সংস্কৃতির স্রষ্টা, তেমনি বাংলা গদ্যের বেগ ও বলিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানপূত জীবনাদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীকে নবতর সংস্কৃতি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করলেও, তাঁর ঋজু ও বলিষ্ঠ গদ্যরীতির আদর্শ পরবর্তী যুগে তেমন অনুকৃত হয়নি—বিপুল সম্ভাবনার পরিচয়বাহী হলেও সে-গদ্য বাংলা-সাহিত্যে নিঃসঙ্গ!

১৭

আত্মকেন্দ্রিক ভাবকল্পনা ॥ কাব্যে নবযুগের আবাহন

বিহারীলাল

আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে তিনটি নাম আমাদের বিশ্লেষণী মনের তারে আঘাত করে: ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন ও বিহারীলাল। ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের মুখ্যতঃ পল্লীকেন্দ্রিক কবিতাকে নগরমুখী করে আধুনিকতার ভিৎ-পত্তন করলেন, মধুসূদন বাঙালী কবির প্রাচ্য দৃষ্টিকে বিশ্বাভিমুখী করে সেই আধুনিক চেতনায় বেগ সঞ্চার করলেন; আর শতাব্দীশেষে বিহারীলাল সেই বিশ্বমুখী কবিদৃষ্টিকে আত্মমুখী করে আধুনিক কবির হৃদয়-গবাক্ষকে উন্মুক্ত করে দিলেন। সেই অনাবৃত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালী কবি দেখলেন মানব হৃদয়ের রহস্যময় বহু কক্ষ। সেই কুহেলি-ঘেরা কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন-প্রচেষ্টাই আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস।

অতএব ভাবতন্ময় কবি-হৃদয়ের অস্পষ্ট প্রকাশের জন্যে, আর সেই সচেতন কবি-ভাষা সৃষ্টির যুগে নিরাভরণ ও অকৃত্রিম ভাষা প্রয়োগের জন্যে বিহারী-লালের কবিতা আধুনিক কাব্যামোদী মহলে অনাদৃত হলেও কবিদৃষ্টি ও ভাবানুভূতির স্বাতন্ত্র্যের জন্যে বাংলা কাব্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কবির স্থান সুচিহ্নিত।

একটা নতুন যুগসম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল বিহারীলালের অস্ফুট কাব্যকাকলির মধ্যে। সে-যুগের ত্রিভুবনচারিণী কবি-কল্পনাকে সংহত করে একান্তভাবে এই আত্মবিস্মৃত কবি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন নিজ অন্তরের অতলান্ত রহস্যের মধ্যে, আর সেই রহস্যচেতনাকে প্রকাশ করলেন গীতোচ্ছ্বাসময় নতুন ছন্দে। মধুসূদনের ছন্দ-আবিষ্কারে ছিল ভগীরথের সাধনা, আর বিহারী-লালের অভিনব ছন্দ প্রবর্তনে ছিল বাল্মীকির বেদনা। একজনের ছন্দো-প্রবাহে ছিল গম্ভীর মেঘগর্জন, আর একজনের ছন্দোল্লাসে শোনা গেল বীণা-

যন্ত্রের মৃদু-মধুর ধ্বনি—সুরের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক তফাৎ দেখা দিল একই শতাব্দীতে দুজন কবির কাব্যবীণায়। একজনের কাব্যে বিশ্বমনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, আর একজনের কাব্যে আত্মহৃদয়ের কলু-কুলু ধ্বনি। একজন প্রচণ্ডভাবে রূপ-সচেতন, আর একজন ভাবকে রূপের মধ্যে মূর্তি দিতে নির্মমভাবে উদাসীন। আর একটু রূপ-সচেতন হলে বিহারীলাল হয়ত কবি হিসাবে এতটা উপেক্ষিত হতেন না; কিন্তু রং, তুলি নিয়ে বসে সৌন্দর্য-মূর্তি নির্মাণ-প্রয়াস ছিল ভাবতন্ময় কবি বিহারীলালের প্রকৃতিবিরোধী। সুতরাং এই ভাববিহ্বল কবির কবিকর্ম বিচারের আশ্রয়স্থল হল কবি-অন্তরের অকৃত্রিমতা, আর ভাবপ্রকাশে সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাস। এই দুদিক থেকেই বিহারীলাল আধুনিক বাংলা কাব্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়—একটা নতুন যুগের স্রষ্টা।

Imagination (কল্পনা), Emotion (আবেগ) আর Intellect (মনন) যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করে প্রধানতঃ তন্ময় বা বস্তুলীন (objective) কবিতায়। এই তিনটি প্রবৃত্তির একত্র সমাবেশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাকাব্যগুলি। প্রাণ ও মনোধর্মের প্রবল প্রেরণায় একটা আদর্শ জগতের স্বপ্ন দেখছিলেন বাঙালী মহাকবিরা। সেই মহাকাব্য রচনার যুগে আবির্ভূত হলেও বিহারীলালের কবি-মানসে দেখি মহাকবিদের দূরযানী কল্পনা হয়েছে সংকুচিত, intellect প্রায় অনুপস্থিত, কাব্যরচনায় সক্রিয় হয়েছে শুধুমাত্র কবির অন্তরাবেগ (emotion)। কাব্যসৃষ্টিতে শুধুমাত্র হৃদয়ধর্মের অনুসরণ বিহারীলালের কাব্যকে আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাভূমির উপর স্থাপন করল।

আরো একটা দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করল আত্মভোলা কবি বিহারী-লালের নতুন কবিতা। Intellect-এর প্রেরণায় ইতিপূর্বে মহাকবিরা করেছিলেন মানব জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান, আর emotion-এর তাড়নায় বিহারীলালের ভাববিহ্বল চিত্ত বিচরণ করেছে একটা সূক্ষ্ম অনুভবক্ষম সৌন্দর্যজগতে। রোমান্টিক কল্পনার অন্যতম ধর্মও হল "a subtle sense of mystery"—

অর্থাৎ একটা সূক্ষ্ম রহস্যবোধের চেতনা। এই রহস্যবোধ প্রধানতঃ কবির চিত্তাশ্রয়ী। কবিচিত্তের উপর প্রতিবিম্বিত হয় বিশ্বের ছায়া, তার ফলে সেই স্পর্শকতার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে হয় রোমাঞ্চিত, মুগ্ধ, বিস্মিত, আনন্দিত ও বেদনার্ত। এই যে বিশ্ব, সেও কবির কল্পনার সৃষ্টি। সেই জগতে বস্তু থেকে ভাবেরই প্রাধান্য। কবির কল্পনাসৃষ্ট সেই ভাবময় জগতে বিচরণ করেছে কবি-অন্তর, আর সেই কারণে কবির কল্পনা-জগৎ ছায়াময়, বক্তব্য অস্পষ্ট। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গলে' (১৮৭৯) কবির রহস্য-সচেতন চিত্তের তীব্র ব্যাকুলতা স্বতোৎসারিত।

বিহারীলালের কাব্য সৌন্দর্যসচেতন আধুনিক চিত্তকে যে আকর্ষণ করেনা তার প্রধান কারণ কবি-কল্পনার abstraction কোন একটা স্থির রূপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। Theodore Watts-Dunton যাকে বলেছেন "Renassance of wonder"—সেই বিস্ময়বোধের উদ্দীপ্তিই কবির সৌন্দর্যচেতনার মূলে। সেজন্যে এই সৌন্দর্যবোধ শুধু কবির 'অন্তরব্যাপিনী'ই হয়ে রইল, সেই সৌন্দর্যকে বিশ্বের রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ছিল অপেক্ষিত। ভারতীয় mysticism বা অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের চেতনায় যেন কবির সৌন্দর্যসন্ধানী চিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে 'সারদামঙ্গলে'। এর ফলে এই কাব্যখানির আবেদন শুধু এ-যুগে কেন, সে-যুগেও সৌন্দর্য ও রহস্যসচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বেশী পাঠকের অন্তরকে আলোড়িত করেনি।

আধুনিক বাংলা কাব্যে 'সারদামঙ্গলে'র অভিনবত্ব হল কাব্যরচনায় কবির উদ্দেশ্যহীনতা। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর একখানি পত্রে কবি নিজেই তাঁর বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে লিখেছিলেন; —'আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।' নিজের অভিনব কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে কবির এই সামান্য কথাটুকু খুবই মূল্যবান। আধুনিক বাংলা কাব্য যে সচেতন আদর্শ-অনুসন্ধানের স্তর অতিক্রম করে ক্রমশঃ কবির হৃদয়ধর্ম অনুসারী সৌন্দর্য-সৃষ্টির জগতে কুন্ঠিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির এই বক্তব্যটি তারই পরিচয়বাহী।

এ-ধারণা খুব অসঙ্গত নয় যে বিহারীলালের কাব্যপ্রয়াসের মধ্যে যেন পূর্বযুগের দূরযানী কবিকল্পনার বিরুদ্ধে একটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। যে কল্পনা শুধু ঐশ্বর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, যে কাব্যচেতনা সংস্কারহীন সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম জীবনবোধকে উপেক্ষা করে একটি কল্পিত আদর্শ অনুসন্ধানে উন্মত্ত হয়, সে কল্পনা-মরীচিকাকে স্বভাবকবি বিহারীলাল কখনও প্রীতির চোখে দেখতে পারেন নি। দেখতে পারেন নি তার প্রধান প্রমাণ, বিহারীলালের কবি-কল্পনা শুধুমাত্র অনুভবক্ষম সৌন্দর্য-জগতে বিচরণ করেনি—নগরকেন্দ্রিক সভ্যসমাজের বাইরে পল্লী-প্রকৃতির মধ্যেও যে অকৃত্রিম জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, কবি-অন্তর ব্যাকুল হয়েছিল সেই সরল জীবনের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করতে। এখানেও বিহারীলালের স্বাভাবিক রোমান্টিক মনোবৃত্তি প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'An instinct for the elemental simplicities of life' যদি রোমান্টিক প্রবৃত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে স্বভাবকবি বিহারীলাল তাঁর 'প্রেমপ্রবাহিনী' 'বঙ্গসুন্দরী' 'সাধের আসন' প্রভৃতি কাব্যে নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। জীবনের মৌলিক সরলতার প্রতি একটা সহজ মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে এ-সমস্ত কাব্যে। ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎ, প্রত্যক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ, আর বাস্তবের মধ্যে অনুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করা রোমান্টিক প্রবৃত্তির একটা অন্যতম লক্ষণ। সে-লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে এ-সমস্ত কাব্যে অকৃত্রিম সরল জীবনের প্রতি বিহারীলালের সহজ ও স্বতঃ-স্ফূর্ত সহমর্মিতা দেখে।

অন্তরের গভীরতম প্রকাশ কি শুধু বৃহৎ জীবনের বিচিত্র রহস্য অনু-সন্ধানে, না সামান্য জীবনের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে? জগতের মহৎ শিল্পীমাত্রই সামান্যের মধ্যে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রকাশ দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছেন। বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য দেখে কবির সৌন্দর্যসন্ধানী অন্তর যখন তৃপ্তিলাভ করতে পারেনি, তখন একটি 'ঘাসের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'র সৌন্দর্য বিশ্বকবির সৌন্দর্যসন্ধান-প্রয়াসের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। এ-সম্পর্কে Boudlaireএর মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন শিল্পীর আত্মায় যখন

অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ লাগে তখন তিনি জগতের যে কোন সামান্য বস্তুর মধ্যেও জীবন-চেতনার গভীরতম প্রকাশ দেখতে পান :

" In certain almost supernatural state of the soul, the depths of life reveal themselves completely in anything that may happen to meet the eye, no matter how commonplace such a sight might be. It becomes the symbol."

বিহারীলালের অনুভূতিশীল কবি-চিত্তে লেগেছিল সেই অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ ; তাই তিনি তুচ্ছ পল্লীজীবনের মধ্যেও দেখেছেন সৌন্দর্যের পরম প্রকাশ, আর ব্যক্তিমন ও মানবজীবনের সহজ প্রীতিবোধের মধ্যে খুঁজেছেন অন্তরাত্মার দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতি।

শুধু প্রাকৃত জীবন নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও একটা সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন বিহারীলাল Romantic Revival-এর কবি Wordsworth-এর মত। সেক্স্‌পীয়রের মত শুধু প্রকৃতির অমোঘ শক্তিরূপ প্রত্যক্ষ করেই কবি ক্ষান্ত হননি ; Wordsworth এবং Shelly-র মত মানব চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যময় সম্পর্ক আবিষ্কারে কবি যে ভাবতন্ময়তার পরিচয় দিয়েছিলেন সে সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভব সে যুগে ছিল বাংলা কাব্যে একান্তভাবে দুর্লভ। প্রকৃতি ও জীবনকে নিয়ে রহস্যতন্ময়তার অনিবার্য ফল বিহারীলালের কবি-ভাষার অমসৃনতা। এ আভরণহীন ভাষারূপ মধুসূদনের অতি-প্রসাধিত কবি-ভাষার বিরুদ্ধে যেন একটা তীব্র প্রতিবাদ। কাব্য যেখানে প্রকৃতি ও প্রাকৃত জীবনানুসারী সেখানে কবিভাষার উপরেও যে প্রাকৃতজনের ভাষার প্রভাব পড়বে তাতে সন্দেহ কি? শুধু বিহারীলাল কেন, রোমান্টিক কবি Wordsworth-ও এই প্রাকৃতভাষাকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন কাব্যসৃষ্টির বাহন হিসাবে। Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় (২য় সংস্করণ) Wordsworth বলেছেন :

"The language too, of these men (that is those in humble and rustic life) has been adopted······because such men hourly communicate with the best objects from which the best part of the language is originally derived, and beca-

use from their rank in society, and the sameness and narrow cirle of their intercourse, being less under the influence of social vanity, they convey their feelings and notions in simple unelaborated expression."

মানবমাহাত্ম্যের প্রতি রোমান্টিক কবির এই বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ ইংরাজী সাহিত্যকে যেমন করে তুলেছিল মানবচিত্তাশ্রয়ী, তেমনি পল্লীর তুচ্ছ জীবনপ্রবাহের প্রতি এই সপ্রেম হৃদয়ানুভূতি ক্রমশঃ আধুনিক কাব্যকেও করে তুলল সাধারণ জীবনচেতনা-নির্ভর। বিহারীলালের এই ক্লাসিক আদর্শ বিরোধিতার মধ্যে নিহিত আছে কাব্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভ্রান্ত সংকেত। আধুনিক সাহিত্যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন সম্পর্কে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত যা বলেন, বিহারীলালের কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও সে-মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য :

"From the stories of the Gods and Goddesses, kings and queens, prince and princesses, we have learnt to descend to the humble walks of life to sympathise with a common citizen, or even a common peasant".[১]

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে বিহারীলালের স্বাতন্ত্র্য শুধু আত্মমুখী ভাববিকাশ বা প্রকৃতি ও মানব-জীবনের প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই নয়, সে স্বাতন্ত্র্যের প্রধান অভিব্যক্তি কাব্যে কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসে। আত্মমুখী ভাবকল্পনার কাব্যময় প্রকাশ ইতিপূর্বে মধুসূদন-হেম-নবীনের কোন কোন খণ্ড কবিতায়ও দেখা গেছে। মাইকেল ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে তো এই লিরিক গীতোচ্ছ্বাস কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল আবেগে আত্ম-প্রকাশ করেছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাথাকাব্যেও গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বাসের অভাব নেই। বিশেষ করে রাজকৃষ্ণ রায়ের গাথাকাব্য ও স্তবকবন্ধ কাব্য এবং "পদ্যপংক্তি'গদ্যে" গীতি-

১ R. C. Dutt, Bengali Literature, 'The Period of European influence'.

কাব্যের সুস্পষ্ট আগমনী সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। সহস্রতন্ত্রী কাব্যবীণার তার বহুদিন থেকে বাঁধা হচ্ছিল। এবার এলো বিহারীলালের সঙ্গীত-সাধনার পালা।

বাংলা কাব্যের আসর জমে উঠল নতুন সুরের ঝংকারে। এ-সুর বিহারী-লালের নিজস্ব। ছন্দোবদ্ধ কবিতায় গীতিমূর্চ্ছনা সৃষ্টির জন্যে কবির আবেগ-বিহ্বল অন্তরই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে প্রয়োজন তাঁর স্বতন্ত্র সাধনা। বিহারী-লালের জীবনী পাঠে জানা যায় সেই স্বতন্ত্র সাধনা ছিল এই সঙ্গীতপ্রিয় কবির। স্বতোৎসারিত হৃদয়-ভাবকে শুধু বাণীবদ্ধ করে তৃপ্ত থাকতে পারতেন না বিহারীলাল, একান্তে বসে সেই কবি-ভাষাকে সঙ্গীতের ধারায় মুক্তি দিতে পারলে তবেই শান্তি হত তাঁর। ফলে বিহারীলালের কাব্যের নতুন ছন্দ শুধুমাত্র পাঠকের শ্রবনেন্দ্রিয়ে এনে দিলনা একটা মৃদুমধুর তরঙ্গধ্বনি—তাঁর অন্তরকেও জাগিয়ে তুলল অন্তরতম সুরের স্পর্শে। বিহারীলালের কাব্য-কবিতার ভাবকেন্দ্রিক রহস্যময়তা সে-যুগের কবি ও সমালোকের সমা-লোচনার সামগ্রী হলেও সে-কাব্যের সাঙ্গীতিক পরিবেশ মুগ্ধ করল বিদগ্ধ কাব্যরসিকের মনকে। সবার চাইতে সম্মোহিত হলেন তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের কবিতার সুরমাধুর্যের ভিতর শুনতে পেলেন এই প্রতিভাবান কবি নতুন যুগের কবিতার দূরাগত প্রতিধ্বনি। এই উপলব্ধিকে নিজের মনের ভিতরে গোপন না রেখে এই তরুণ কবি সে সুর-স্বাতন্ত্র্যের কথা শুনিয়ে দিলেন সে-যুগের কাব্যপাঠক-সমাজকে। নিজেও কাব্য রচনায় সচেতনভাবে অনুসরণ করলেন তিনি এই ভাবভোলা কবির নতুন সুর, এমন কি ভাবসৃষ্টিতেও প্রভাবান্বিত হলেন তিনি এই আত্মবিস্মৃত কবির হৃদয়-রহস্যকেন্দ্রিক জীবন-বোধের দ্বারা। বিহারীলালের অন্তরগুহানিবাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপিনী হয়ে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। সৌন্দর্যপূজার আরতিতে রবীন্দ্রনাথের সহস্রতন্ত্রী বীণা বেজে উঠল—বাংলা গীতিকাব্য বিশিষ্ট স্থান পেল বিশ্বের কবিতারাজ্যে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন—সে যুগের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত শক্তিমান কবিও কাব্যরচনায় বলিষ্ঠ প্রেরণা পেলেন বিহারীলালের কাব্যের নতুন সুর ও অকৃত্রিম ভাবানুভূতি থেকে। বিহারীলালের রহস্যময় সৌন্দর্যচেতনা এই সমস্ত কবির কাব্যে স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়ে সে-যুগের কবি-ভাবনাকে পৌঁছিয়ে দিল বিংশ শতাব্দীর তোরণপ্রান্তে।

———

আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায়
স্মরণীয় তারিখ

১৬৯০—জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতায় কুঠি স্থাপন

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ

১৭৬৫—ক্লাইভের বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ

১৭৭১—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১৭৭৪—রামমোহন রায়ের জন্ম

১৭৭৮—স্যার চার্লস্ উইলকিন্স কর্তৃক বাংলা হরফ তৈরী ॥
হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত

১৭৮৪—এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

১৭৯৩—কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৮০০—ফোর্ট উইলিঅম কলেজের প্রতিষ্ঠা ॥ শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন

১৮০১—কেরী ফোর্ট উইলিঅম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত

১৮১২—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম

১৮১৪—রামমোহনের স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস

১৮১৫—শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ স্থাপন ॥
রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ ॥ আত্মীয় সভা স্থাপন

১৮১৭—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ॥ স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ॥
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম

১৮১৮—সমাচার দর্পণ প্রকাশ (২৩শে মে) ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম

১৮২০—অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম ॥ ডেভিড হেয়ারের জনসেবা শুরু

১৮২২—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম

১৮২৩—ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট রাম-মোহনের পত্র ॥
সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য রামমোহনের আন্দোলন ॥
জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাক্শনের প্রতিষ্ঠা

১৮২৪—মধুসূদন দত্তের জন্ম ॥ সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা

১৮২৫—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম

১৮২৬—হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদে ডিরোজিও ।। রাজনারায়ণ বসুর জন্ম

১৮২৮—রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ।।
অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা

১৮২৯—সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ করণ

১৮৩০—ধর্মসভা স্থাপন ।। রামমোহনের ইংলণ্ডে গমন

১৮৩১—ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ ।।
ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে পদচ্যুত (মৃত্যু, ২৬শে ডিসেম্বর)

১৮৩৩—ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু ।।
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম (২০শে ফেব্রুয়ারী)

১৮৩৪—দেশীয় শিক্ষাসংক্রান্ত এডামের রিপোর্ট

১৮৩৫—ফারসীর স্থলে ইংরাজী সরকারী ভাষারূপে গৃহীত ।।
লর্ড মেকলের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্য (Minute ।।
মেকলের সুপারিশে শিক্ষাখাতে কোম্পানীর মঞ্জুরীকৃত অর্থ ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয়ের সিদ্ধান্ত (৭ই মার্চ) ।।
কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কার্যারম্ভ (১লা জুন) ।।
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্ম

১৮৩৬—চারজন বাঙালী ছাত্র কর্তৃক মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ

১৮৩৮—সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ।।
কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম (১৯শে নবেম্বর) ।।
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম (২৬শে জুন) ।। হেমচন্দ্রের জন্ম

১৮৩৯—'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন ।। কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ।।
'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিকে রূপান্তরিত

১৮৪০—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন

১৮৪২—'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রকাশ ।। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু

১৮৪৩—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ ।।
জর্জ টমসনের কলিকাতায় আগমন ও রাজনৈতিক বক্তৃতা ।।
'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা

১৮৪৩-১৮৫৫—অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন

১৮৪৭—নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম

১৮৪৮—রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম

১৮৪৯—বীটন স্কুল স্থাপন (৭ই মে) ॥ Black Acts-এর খসড়া

১৮৫০—সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক
বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট

১৮৫১—'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ ॥ বীটন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ॥
'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবমনের সম্বন্ধবিচার', ১ম ভাগ

১৮৫২—ভারতে প্রথম রেলওয়ের প্রবর্তন

১৮৫৩—ডঃ ব্যালেন্টাইনের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টের
সমালোচনায় বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট

১৮৫৪—'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক ॥ 'মাসিক পত্রিকা'র প্রকাশ ॥
সকল বর্ণের হিন্দুর নিকট সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা উন্মুক্ত

১৮৫৫—হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত

১৮৫৬—বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ॥
'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

১৮৫৭-১৮৫৮—বিদ্যাসাগর কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

১৮৫৮—'পদ্মিনী উপাখ্যান' ॥ 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত

১৮৫৯—ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ॥ 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রকাশ

১৮৫৯-৬০—নীল বিদ্রোহ

১৮৬০—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ॥ 'পদ্মাবতী নাটক'
'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ॥ 'নীলদর্পণ'

১৮৬১—'মেঘনাদবধ কাব্য' ॥ 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'
রবীন্দ্রনাথের জন্ম

১৮৬৩—বিবেকানন্দের জন্ম

১৮৬৪—'Rajmohan's Wife'

১৮৬৫—'দুর্গেশনন্দিনী' ॥ 'চতুর্দশপদী কবিতা'

১৮৬৬—'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা

১৮৬৭—হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান

১৮৭০—'ভারতসংস্কার সভা' ।। 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'

১৮৭১—'Indo-Philus' ছদ্মনামে লর্ড নর্থব্রুকের নিকট কেশবচন্দ্রের শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত নয়খানি পত্র

১৮৭২—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ।। ন্যাশনাল থিয়েটার ।। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বিবাহ বিষয়ক '৩ আইন' বিধিবদ্ধ

১৮৭৩—মধুসূদনের মৃত্যু ।। মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন

১৮৭৪—তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' প্রকাশিত

১৮৭৫—বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন ।। 'বৃত্রসংহার' ।। 'পলাশীর যুদ্ধ'

১৮৭৬—'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপন ।। 'এলবার্ট ইনস্টিউটে'র প্রতিষ্ঠা ।। 'ভারত সভা' স্থাপিত

১৮৭৮—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা

১৮৭৯—বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' প্রকাশিত

১৮৮০—কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'-এর প্রতিষ্ঠা

১৮৮২—'আনন্দমঠ'

১৮৮৩-১৮৮৪—ইলবার্ট বিল

১৮৮৪—কেশবচন্দ্রের মৃত্যু

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৬—'কৃষ্ণচরিত্রের' প্রকাশ ।। অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু ।। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান (১২ই আগষ্ট)

১৮৯১—বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ।। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু

১৮৯৪—বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ।। বিহারীলালের মৃত্যু

১৮৯৯—রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু

নির্দেশিকা

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১	১৮	অধুনিকতা	আধুনিকতা
২১	৮	পক্ষে'ও	পক্ষে
২৬	১	পরিষদ	পরিষৎ
৭০	১০	সঙ্গে সঙ্গে	ফলে
৭৫	ফুটনোট্	বিরাজিম	বিরাজিতম্
৯৬	৫	ফলশ্রুতি	ফল
১৩৮	৬	কৃষ্ণকুমারী	কৃষ্ণকুমারী নাটক
১৫১	২৮	এইনাতি বিস্তৃত	এই নাতিবিস্তৃত
১৬৫	৮	ধূলিস্মাৎ	ধূলিসাৎ
১৬৯	২৪	আলৌকিক	অলৌকিক
১৭৫	হেডিং	হৃদয়মুক্তি ও মনন	কাব্যে হৃদয়মুক্তি
১৭৬	২৩	দীর্ঘসূত্রিতা	দীর্ঘসূত্রতা
১৮১	১৭	উদাহারণ	উদাহরণ
১৮৮	২৩	বৈদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
২০১	১৭	গাতিরেখায়	গতিরেখায়
২০২	১২	কৃষ্ণকান্তের	কৃষ্ণকান্তের উইলের
২১৭	২৫	বান	বাণ
২২৫	৯	Latters	Letters
২৬৭, ২৬৮	১৫, ৫	আলোকসামান্য	অলোকসামান্য

যে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, যুগপ্রভাব, ব্যক্তিস্পর্শ, এবং চিন্তাসমন্বয় আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য-বিকাশের ভিত্তিমূলে,—তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ বর্তমান গ্রন্থে। বাংলা ভাষা সাহিত্যে গদ্য পদ্য ও নাটকে, সমাজ ও সংস্কৃতি-চিন্তায় রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, তারকনাথ, গিরিশচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং বিহারীলাল যে নবযুগের প্রবর্তন করেন, তারও বিস্তৃত পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। সংস্কৃতির পটভূমিকায় আধুনিক সাহিত্য-উন্মেষের এরূপ চিন্তাপূর্ণ বিবরণ সাম্প্রতিক আলোচনামূলক সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ডক্টর সুকুমার সেনের ভূমিকা সম্বলিত 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য' শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য।

॥ মূল্য আট টাকা ॥